উনিশ শতকের বাংলা
গদ্য সাহিত্য : ইংরেজি প্রভাব

অপূর্বকুমার রায়

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-২৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ২৯
১এ ও ৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীরাখাল চ্যাটার্জী
নিউ প্রিণ্ট হাউস
২১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

৺পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

ভূমিকা

গদ্য যে ভাষাশিল্পের অন্যতম অঙ্গসজ্জা, সে কথা ইউরোপের সতেরো শতকী লেখকগণ প্রখরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন বলে ইংরেজ লেখক ড্রাইডেনের ঈপ্সিত ছিল the other harmony of prose। তিনি বুঝেছিলেন যে ভাষার পদ্যরূপ তার একমেবাদ্বিতীয়ম্ রূপকারু নয়, গদ্য-রূপেও ভাষার সৌন্দর্যপ্রকাশ পূর্ণ বিকশিত হতে পারে। ড্রাইডেন অবশ্য এজরা পাউণ্ডের মতো এমন কথা বলেননি যে Poetry must be as well written as prose; পাউণ্ড উচ্চতর আসন দিয়েছিলেন গদ্যকে, পক্ষান্তরে ড্রাইডেন গদ্যের ও পদ্যের অঘটনঘটনপটীয়সী সৃজনী শক্তির সমত্ব জেনে শুধু other harmony বলেই ক্ষান্ত থেকেছিলেন। কিন্তু গদ্যের অনবশেষ সম্ভাবনা উপলব্ধি কেবল পাউণ্ডই করেননি, তাঁর পূর্বে অনেকেই করেছিলেন। ওয়র্ডস্বোয়র্থ করেছিলেন, তারও পূর্বে করেছিলেন ফরাসী কমেডি লেখক মলিয়ের যাঁর একটি নাটকে—Le Bourgeois Gentilhomme—জনৈক চরিত্র বলছে, কী আশ্চর্য! আমি তো দেখছি সারা জীবনই গদ্য বলে চলেছি!

গদ্যের এই বিস্ময়কর রসসঞ্চারিণী ক্ষমতা যখন কোন ভাষাতে জন্মায়, তখনই সে-ভাষায় সত্যিকারের সাহিত্য-সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। নিছক কবিতা দিয়ে কোনো ভাষা আপন শক্তির সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। যে-সাহিত্যে একমাত্র পদ্যসজ্জা প্রবল ও প্রধান, এমনকি বহুলাংশে প্রবল ও প্রধান, সে-সাহিত্যের চরিত্র কিছু আদিম, সে-সাহিত্যের মূল্যও একাংশী। আমাদের বাংলা সাহিত্যে শতাব্দীর পরে শতাব্দী পদ্যের প্রভাবই ছিল একচেটিয়া। সে-পদ্য মহৎ ও সুন্দর, কখনো কখনো অতুলনীয় সৌন্দর্যে ও মহত্ত্বে মণ্ডিত, কিন্তু ব্যাপক দৃষ্টিতে ভাষার শিল্পশক্তির কথা চিন্তা করলে এই সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব সীমাবদ্ধ ও খণ্ডিত বলে মনে হয়। প্রাগাধুনিক যুগের বাংলা গদ্যের নমুনা এতই কম যে তার উপরে নির্ভর করে কোন প্রশস্ত ও সর্বগ্রাহ্য বিচার সম্ভব নয়। তবুও তিনটি জিনিষ লক্ষ্য করি এই আদি গদ্যে: (১) এই গদ্য নিতান্তই প্রয়োজন-সর্বস্ব, যাকে ইংরাজিতে বলা যায় utility-slanted; কোনো ধর্মীয় অথবা আদালতী অথবা সাংসারিক-সামাজিক কর্মের উপলক্ষে এই গদ্য রচিত হয়েছে, কোনো

কল্পনামণ্ডিত অপার্থিব জগতের দিশারী নয় এই গদ্য। (২) ফার্সী শব্দের, শব্দ-সমাহারের, বাক্যবন্ধের ও রচনার সব-জড়ানো ফার্সী ঢংয়ের প্রবল প্রভাব। বাক্যরচনা ও বাক্‌সজ্জা-প্রণালীর অপরিচ্ছন্নতা, অস্পষ্টতা, স্থূলতা।

সেই চারিত্রিক ন্যূনতা থেকে বাংলা গদ্য আজ পৌঁছেছে এক অতুলনীয় দার্ঢ্যে ও সাবলীলতায়। বিদ্যাসাগরের, বঙ্কিমচন্দ্রের, স্বামী বিবেকানন্দের, রবীন্দ্রনাথের, অবনীন্দ্রনাথের, বিভূতিভূষণের (আমি আদৌ সম্পূর্ণ তালিকা দেবার চেষ্টা করছি না) গদ্যের পরে আজ বাংলা গদ্য বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং (তার চেয়েও বেশী) অঙ্গসজ্জার বৈচিত্র্যে পৃথিবীর যে কোনো ভাষার গদ্যশৈলীর সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। সাহিত্যক্ষেত্রের প্রতিটি বর্গভূমিতেই আজ আমাদের বাংলাভাষা বিচরণ করছে স্বচ্ছন্দে, সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরতায়। সাহিত্যক্ষেত্রের বাইরেও, জীবনের অসংখ্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে (ধরুন ব্যবসা-বাণিজ্য, আদালত, ফলিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ইত্যাদি) বাংলা গদ্য এগিয়েছে, এগোচ্ছে, আরো এগোবে। প্রয়োজনী রচনায় বাংলা গদ্য কোন্ কোন্ উপায়ে আরো অগ্রসর হতে পারে সে বিষয়ে কিছু সুচিন্তিত উক্তি পাই রাজশেখর বসু-র 'বাংলা পরিভাষা' প্রবন্ধে (পরশুরাম গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, ৩৪৬-৩৬২)।

বর্তমান বাংলা গদ্যের এই অসাধারণ রূপায়ন শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে এবং এই রূপায়ণের মূলে বহুল পরিমাণেই ছিল বাঙালীর ইংরেজি-সাহিত্য-প্রীতি। ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে কথাটা আদৌ নূতন বা মৌলিক নয়, কোনো শিক্ষিত বাঙালীরই অজানা নয়। ভাসা-ভাসা ভাবে প্রায় সবাই জানেন যে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়েছিলেন সযত্নে। এই অধ্যয়ন অবিলম্বে সমাজের পক্ষে ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল। এই অধ্যয়নের একটি ঝটিতি ফল পাই অনুবাদে, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদে। দৃষ্টান্তস্বরূপে নাম করতে পারি তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'রাসেলাস', রামকমল ভট্টাচার্যের 'বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ', হারাণচন্দ্র রক্ষিত-কৃত শেক্‌সপিয়র-অনুবাদগুলি। এসব অনুবাদের মূল্য শুধু ঐটুকু নয় যে আমরা মাতৃভাষাতেই পড়তে পারলাম, জানতে পারলাম কিছু ইউরোপীয় মহাগ্রন্থের (লাটিন magnum opus-এর অনুবাদে বলছি) বিষয়বস্তু সম্বন্ধে। বিষয়বস্তুর চেয়েও যে মহার্ঘতর বস্তু এসে গেল বাংলা গদ্যে তা হচ্ছে বহু তথ্য, চিন্তা, ভাবনা,

ক্রিয়ার ধারণা-প্রকাশক সুষ্ঠু বাংলা শব্দ, শব্দচয়; বাক্যরচনার ও বাক্যন্যাস-প্রণালীর পরিচ্ছন্ন, সূক্ষ্ম রূপরীতির উদ্ভাবন ও প্রচলন। এসব নবত্বের ফলে বাংলা গদ্য অচিরেই অভাবিতপূর্ব ঔজ্জ্বল্যে ও ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠল, যে-কোনো চিন্তার ও যে-কোনো অভিজ্ঞতার কুশলী বাহন হয়ে দাঁড়াল। উনিশ শতকের শেষে পৌঁছে আমাদের মনে হল যে বাংলা গদ্যের অসাধ্য নয় কোনো ধ্যান, ধারণা, তথ্য, বিচিত্র আধুনিক জীবনের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে দেখি ষোল শতকের শুরুতে তার গদ্য ছিল সীমিত, সংকীর্ণ, দুর্বল। ঐ শতকে অজস্র অনুবাদ হতে থাকল ইংরেজি ভাষায়: ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, দার্শনিক গ্রন্থ, জীবনী ইত্যাদি। শতকের শেষভাগে ইংরেজি গদ্য হয়ে উঠল যাবতীয় ইওরোপীয় ভাষার মধ্যে (ফরাসী ছাড়া) সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবাহন, যে কালে পূর্ব ও উত্তর ইউরোপের ভাষাগুলির (এমনকি জার্মান ভাষারও) গদ্য ছিল স্থূল, 'অস্থিতচরণ'।

উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু বলিষ্ঠ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে, সুকুমার সেন প্রভৃতি প্রবীণ পণ্ডিত, এবং মেধাবী বয়োকনিষ্ঠ গবেষক শিশিরকুমার দাস অনেক তথ্য ও ব্যাখ্যা আমাদের দিয়েছেন। তবুও অপূর্বকুমার রায়ের নিরলস গবেষণা ও নিয়তচিন্তার ফলে উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সম্বন্ধে একদিকে যেমন আমাদের তথ্যসম্ভার সমৃদ্ধতর হয়েছে, অন্যদিকে আমাদের সাহিত্য-বিচার বিস্তৃততর ও গভীরতর হয়েছে। তাঁর গবেষণার সূত্রে অপূর্বকুমার অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তাছাড়া, তাঁর পূর্বসূরিগণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেরা যাচাই না করে কিম্বদন্তী বা তাঁদেরও কোনো পূর্বসূরীর তথ্য গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অপূর্বকুমার গবেষণার অলঙ্ঘ্য প্রথম নীতি—Go to the source yourself, স্বয়ং উৎসে পৌঁছাও—নিষ্ঠার সহিত পালন করে কতগুলি ছোট বা বড়ো তথ্যের প্রকৃত সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সব ছাড়া আরো দুটি বিষয়ে আমি বিচক্ষণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।—

(ক) উনিশ শতকের বাংলা গদ্যগ্রন্থগুলিকে অপূর্বকুমার মূলতঃ দুই ধারায় ফেলেছেন: ভাবধর্মী সাহিত্য এবং জ্ঞানধর্মী সাহিত্য। এই ধারাতত্ত্বের পিছনে আছে জনৈক ইংরেজ মনীষীর বিখ্যাত নামকরণ, Literature of Knowledge and Literature of Power। অপূর্বকুমারের এই বিভাজন সর্বতোভাবে সঙ্গত হয়েছে এবং উনিশ শতকী বাংলা গদ্যের দ্বিস্রোতা শক্তি সম্বন্ধে

আমাদের সচেতন করেছে। দুটি স্রোতের প্রতিটি এই গ্রন্থে বিশদ-ভাবে আলোচিত হয়ে এ যুগের গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের চিত্তে মূল্যবান নূতন সংবেদনার সৃষ্টি করেছে। (খ) ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব শুধু বিষয়বস্তুতেই নিবদ্ধ থাকেনি। বাক্‌বিধির অনেক ছোট এবং বড়ো রীতি বাংলা গদ্যে প্রবেশ করেছিল ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে। অপূর্বকুমার সমগ্র শতাব্দীর গদ্য রচনা ভাগ করেছেন কালানুক্রমিক তিন অংশে : ১৮০০-১৮৪৩ ; ১৮৪৩-১৮৭২ ; ১৮৭২-১৯০০ ; এবং প্রতিটি কালানুক্রমে যে-সব বাক্‌রীতি আমাদের ভাষায় প্রবেশ করেছে, যার ফলে আজ আমাদের গদ্যে বিচিত্র চিন্তা প্রকাশের ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে সেগুলি তিনি আলোচনা করেছেন এবং প্রয়োজন মতো সেগুলিকে খাঁচার খোপে খোপে সন্নিবিষ্ট করেছেন যাতে করে আমরা এক নজরে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারি।

অপূর্বকুমারের পক্ষে এই গ্রন্থ লেখা সম্ভব হয়েছে কেননা তিনি যুগপৎ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত। আমার বিশ্বাস, যাঁরা বাংলা গদ্য সম্বন্ধে চিন্তার গভীরে যেতে চান তাঁদের পক্ষে এই সুলিখিত, তথ্য ও চিন্তায় সমৃদ্ধ, মৌলিক গ্রন্থটি অপরিহার্য বলে গণিত হবে।

অমলেন্দু বসু

নিবেদন

বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও বিষয়-পরিধি প্রসংগে 'প্রস্তাবনা' অংশে আলোচনা করেছি, এখানে সে-আলোচনার অবতারণা আমার অভিপ্রেত নয়। গ্রন্থটি রচনা ও প্রকাশনার ব্যাপারে যাঁদের কাছে নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছি তাঁদের কথা এখানে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। এই গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার কাজে সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছি আমার শিক্ষক শ্রদ্ধেয় ড. অমলেন্দু বসুর কাছে। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্য আমার গবেষণা-কার্যের নানা সুকঠিন গ্রন্থিমোচনে নিরন্তর সক্রিয় থেকেছে। শেষ অবধি তাঁর মূল্যবান নানা কাজের ভিড়ের মধ্যেও তিনি এই গ্রন্থের জন্য একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত ভূমিকা রচনা করে দিয়েছেন। গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বমুহূর্তেও তাঁর কাছে আমার ঋণের বোঝা সানন্দে বাড়িয়ে তুলেছি। এই গবেষণাকার্যে আর যাঁরা মূল্যবান পরামর্শ দান করেছেন তাঁদের মধ্যে ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য এবং ড. শিশিরকুমার দাসের নাম সকৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

আমার জীবনের রৌদ্রে-জলে নিত্যসহচর যে-সমস্ত বন্ধু গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে প্রতিনিয়ত আমাকে উৎসাহ দান করেছেন তাঁদের নামও গ্রন্থ প্রকাশনার মুহূর্তে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি—শ্রীশংকর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক যাদবপুর বিদ্যাপীঠ কলেজ অব এডুকেশন, শ্রীপ্রবাল দত্ত, অধ্যাপক, ফকিরচাঁদ কলেজ; শ্রীদিলীপ সিংহ রায়, অধ্যাপক, আনন্দমোহন কলেজ, শ্রীভবতোষ সিংহ রায়, শিক্ষক, সেণ্ট পল্‌স্ স্কুল এবং অগ্রজপ্রতিম নাট্যকার গিরিশংকর।

গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে বন্ধুবর অধ্যাপক অরবিন্দ ভট্টাচার্য এবং 'জিজ্ঞাসা'র স্বত্বাধিকারী শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয়ের অকুণ্ঠ পরিশ্রম ও পরামর্শ সবিশেষ স্মরণীয়। এঁদের প্রচেষ্টা বিনা এত দ্রুত গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যবস্থা সম্ভব হত না। মুদ্রণ কার্যে নিউ প্রিণ্ট হাউসের স্বত্বাধিকারী শ্রীরাখাল চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতাও কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করছি। গ্রন্থের জন্য প্রেসকপি রচনার মতো একঘেয়ে কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য শ্রীমতী শান্তা রায়কে এবং নির্দেশিকা রচনার ক্ষেত্রে সহায়ক-হস্ত প্রসারণের জন্য শ্রীমান শমীককুমার ও শ্রীমান অভীককুমার এবং শ্রীমতী আরতি রায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ফটোস্টাট গ্রহণে সাহায্যের জন্য ড. দেবাদিদেব ভট্টাচার্য ও

কেরি মিউজিয়মের শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায় এবং ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্মচারীদের আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি প্রভাব বিষয়ক গবেষণার জন্য উনিশশো পঁচাত্তর সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে পি-এইচ. ডি উপাধি দানে সম্মানিত করেছেন। বর্তমান গ্রন্থ প্রধানতঃ উক্ত গবেষণা-কার্যের ভিত্তিতে লিখিত।

সর্বশেষে তথ্যগত ভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে এমন কতিপয় মুদ্রণ-প্রমাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

ফিলিকস্ কেরি-র 'কিমিয়াবিদ্যাসার'-এর স্থলে হবে জন ম্যাক-এর 'কিমিয়াবিদ্যাসার' ও ফিলিক্স্ কেরির 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' (২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য); ছক (গ)-এর রচনার প্রকাশকাল ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পরিবর্তে হবে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ (৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ; ৫২ পৃষ্ঠার শেষে প্রদর্শিত ছকের তৃতীয় সারির শিরোনামায় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের স্থলে হবে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ এবং ৬১ ও ৮৩ পৃষ্ঠায় কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্থলে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৮১ পৃষ্ঠায় বিহারীলাল মিত্রের পরিবর্তে বিহারীলাল সরকার হবে।

অপূর্বকুমার রায়

It is out of this conflict of the eastern with the western ideals that our modern literature has grown

S. K De

প্রতিলিপি পরিচয়

ফিলিক্স্ কেরি বিরচিত 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' (প্রথম ভাগ : ১৮২১) এবং 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' (দ্বিতীয় ভাগ : ১৮২২) গ্রন্থদ্বয়ের শিরোনামা-পত্রের আলোকচিত্র। গ্রন্থদ্বয় জন বানিযনের "The Pilgrim's Progress" গ্রন্থের প্রথম বংগানুবাদ, এই গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠা—২৭ পৃষ্ঠার মধ্যে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

জে. ডি. পীয়ার্সন বিরচিত 'বাক্যাবলী' (১৮২০) গ্রন্থের ১২৯ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। এই গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত গ্রন্থটি থেকে ইংরেজি অনুসরণে কমা, ফুলস্টপ এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহারের কতিপয় বিচ্ছিন্ন উদাহরণ উৎকলিত হয়েছে। ৫০ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ প্রকাশনার তারিখ ভুলভাবে মুদ্রিত হয়েছে, ঐ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পরিবর্তে হবে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ।

'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকার চার পৃষ্ঠার (১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যার দুই পৃষ্ঠা এবং ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী সংখ্যার দুই পৃষ্ঠার) প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে। 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকার বাম পৃষ্ঠায় ইংরেজি এবং ডান পৃষ্ঠায় তারই বংগানুবাদ প্রকাশিত হত। বংগানুবাদের ক্ষেত্রে লেখকরা যে কতটা পরিমাণে মূল ইংরেজি অংশের যতিচিহ্নাদির অবিকল অনুসরণ করতেন তার নমুনাস্বরূপ এই প্রতিলিপিগুলি মুদ্রিত হল। এ সম্বন্ধে বর্তমান গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠা—৫৩ পৃষ্ঠার মধ্যে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

প্রথম প্রতিলিপিদ্বয় শ্রীরামপুরের কেরি মিউজিয়মের সৌজন্যে এবং শেষের পাঁচটি প্রতিলিপি ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর (কলিকাতা) সৌজন্যে প্রাপ্ত।

যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ।

অর্থাৎ

ইহলোকহইতে পরলোকে গমনবিবরণ।

বিশেষতঃ

॥ ১। পাপির নাশ বিষয়বার্তা প্রথম যেমত তাহাকে সাবধান করিয়াছিল
। ২। পথে যে ব্যবহার কিরূপে আশ্রম পাইয়াছিল। এবং
॥ ৩। বাটী গমন কিরূপে অতি আশ্চর্য্য সুখে হইয়াছিল এতদ্বিবরণ।

জোহন্ বনিয়ানকর্তৃক স্বপ্নসদৃশ্য একৈ গ্রন্থবিবরণরচিত হইয়াছে।

॥ আমি দৃষ্টান্তের ব্যবহার করিয়াছি॥ হোশেয়া বাক্য ১২ পা। ১০ পদ॥

এতৎগ্রন্থের দুই ভাগ।

প্রথম ভাগে যাত্রির স্বীয় অগ্রেসরণ বিবরণ।
দ্বিতীয় ভাগে তাহার পরিবারের অগ্রেসরণ বিবরণ।

এবং গ্রন্থান্তে গ্রন্থকর্তার সংক্ষেপতো বিবরণ।

ফিলিক্স কেরিকর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অর্থসংগৃহীত।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।
ইংগ্রেজীয় সন ১৮২১ সাল। বাঙ্গালা সন ১২২৮ সাল।

যাত্রিরদের অগ্রসরণবিবরণ।

অর্থাৎ

ইহলোক হইতে পরলোকে গমনবিবরণ।

তদ্দ্বিতীয় ভাগ।

বিশেষতঃ

। ১ ।। খ্রীষ্টীয়ানের ভার্য্যার এবং সন্তানেরদের উদ্যোগ।
। ২ । তাহারদের নষ্টদেশ হইতে পথে গমন বিবরণ। এবং
।। ৩ ।। বাঞ্ছিত দেশেতে তাহারদের আনন্দপুরে পহুঁছনবিবরণ।

[illegible] কর্তৃক স্বপ্নচ্ছলে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

[illegible] সাহেব কর্তৃক বাঙ্গালাভাষাতে অর্থসংগৃহীত।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

ইংরাজীয় সন ১৮২২ সাল। বাং সন ১২২৯ সাল।

Shall I *introduce* you to that gentleman?	সে সাহেবের সঙ্গে কি তোমার পরিচয় করিয়া দিব?
Who *introduced* this mode of expression?	এমত কথা কহিবার ধারা এখানে কে আনিল?
They were *intrusted* with the whole management of the business.	সে কর্ম্ম তদারি তদন্ত করিতে তাহাদিগকে দেওয়া গেল.
Who *invented* this instrument?	এ যন্ত্রটা প্রথমে কে সৃষ্টি করিল?
We must *investigate* this matter.	এ বিষয় তলাইয়া বুঝিতে হইবে.
He has *invited* me to his house.	তাহার ঘরে যাইতে তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন.
The whole country has been *inundated.*	তাবৎ দেশ জলে ভাসিয়া গিয়াছে.
His affairs are much *involved.*	তাঁহার বিষয় সকল মহা পেঁচে পড়িয়াছে.
Join these two boards together.	এই তক্তা খানা জোড়া লাগাইয়া দেও.
How can I *judge* of his character? I don't know him.	তাহাকে মূলে চিনি না, কেমন করিয়া ভাল মন্দ বিবেচনা করিব?
How far can you *jump?*	কয় হাত ডিঙ্গাইতে পার?
I cannot *justify* her conduct.	সে যে আচরণ করিয়াছে, তাহাকে আমি ভাল বলিতে পারি না.
Keep this money for me till I shall want it.	যত ক্ষণ আমার প্রয়োজন না হয় তত ক্ষণ আমার এই টাকা তোমার ঠাঁই রাখ.

drawn out into a wire, of the eighteen thousandth part of an inch in diameter. It is moreover uncommonly heavy, being nineteen times the weight of an equal quantity of water. It is the least fusible of all metals, and is generally found in conjunction with some other metal It remains unaltered in the air or when exposed to high heats. It is used for the finest work in which metal is employed, such as the wheels of watches, &c. Mirrors made of glass give a double image, but those made of platina never do. The largest piece of platina which has yet been discovered is not much larger than the egg of a pigeon.

Of Gold.

Gold has several remarkable properties; it is the heaviest of all metals, being half as heavy again as lead, and nineteen or twenty times heavier than a quantity of water equal to its bulk. Its great weight affords an easy method for discovering counterfeit coin from genuine, for gold must be adulterated with some metal lighter than itself; a false coin therefore if of the same weight with the true, will be sensibly larger. One of the sovereigns of Sicily having ordered a golden crown to be prepared, was anxious to ascertain whether the metal was genuine, and applied to one of the philosophers of the city, who discovered its true value from an experiment on its quality of weight as compared with water.

অতিশয় ভারী যেহেতুক সে সমানপরিমিত জলহইতে উনিশগুণ ভারী. সকল ধাতুহইতে সে অতিদুর্গলনীয়, যখন সে ধাতু পাওয়া যায় তখন অন্য ধাতুর সহিত সংলগ্ন থাকে. আকাশ ও অতিশয় উত্তাপ তাহাতে লাগিলেও তাহার কিছু অন্যথা হয় না. ঘড়ীর মধ্যবর্ত্তি যেং সূক্ষ্ম কর্ম্ম তাহা ঐ প্লাতীনার দ্বারা করে. কাঁচের আদর্শে মুখাদির যে প্রতিবিম্ব পড়ে সে দুই দেখা যায়, কিন্তু প্লাতীনার আদর্শে তাহা হয় না. অদ্যপর্য্যন্ত পৃথিবীতে প্লাতীনার যে অতিবড় খণ্ড পাওয়া গিয়াছে, সে কপোতের ডিম্ব হইতে কিঞ্চিৎ বড়;

স্বর্ণ.

অন্যং ধাতুহইতে স্বর্ণের স্বতন্ত্র গুণ আছে: সকল ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ ভারী, সীসার পরিমাণহইতে তাহার পরিমাণ দেড় গুণ অধিক, এবং সমান পরিমিতজলের সহিত স্বর্ণ তৌল করিলে জল হইতে স্বর্ণ বিশগুণ ভারী হয়. স্বর্ণের গুরুত্বরূপ গুণদ্বারা স্বর্ণ মোহর প্রকৃত কিম্বা অন্য ধাতুমিশ্রিত জানা যায়, যেহেতুক স্বর্ণ অন্য ধাতুমিশ্রিত হইলে প্রকৃত মোহরের সহিত তৌল করিলে সমান যদি হয়, তবে সে অপ্রকৃত স্বর্ণ পরিমাণে অবশ্য অধিক বড় হইবেক. সিসিলি দেশের এক রাজা স্বর্ণের এক মুকুট করিয়া জানিতে ইচ্ছা করিলেন, যে সে স্বর্ণ প্রকৃত কি অন্য ধাতুমিশ্রিত; তাহাতে সে নগরের এক জন জ্ঞানবান ঐ মুকুট না ভাঙ্গিয়া, কেবল জলপরিমাণানুসারে তৌলের দ্বারা, সে মুকুটের স্বর্ণ ভাল মন্দ নিশ্চয় করিল.

the vacant throne and began to expend his father's treasures upon dancing women, comedians, and musicians leaving the affairs of Government to the management of his mother. This woman, who had been a Turkish slave, now became a monster of cruelty, and murdered all the women of Altomush's Haram. This step filled the people with horror, and Mahommed, the younger brother of the king, and governor of Oude intercepted the revenues from Bengal, and began to assert independence. At the same time, the different rajas of superior eminence entered into a confederacy against the emperor, and openly commenced war against him, in which they were successful, and advanced Sultana Rizia, the eldest daughter of Altomush to the throne, and imprisoned the emperor's mother. Feroze himself was delivered up to her, and died some time after in confinement; having reigned only six months and twenty-eight days.

Sultana Rizia.

Sultana Rizia was adorned with every qualification necessary for the imperial throne; and those who strictly examined her actions could find in her no fault, but that she was a woman. The year in which her father took Gualior, he appointed her regent in his absence, and when asked the reason by one of

তিনি সেই সময়ে সিংহাসন শূন্য দেখিয়া আপনি আরোহণ করিলেন। এবং স্বপিত্রুপার্জ্জিত প্রচুর ধন নর্ত্তকী ও নট ও গায়ক প্রভৃতিবদের কারণ ব্যয় করিতে লাগিলেন, এবং রাজকীয় যাবৎ কর্ম্ম সকল আপন মাতার হস্তে সমর্পিত করিলেন. ঐস্ত্রী পূর্ব্বে তুরুক দেশে এক বাঁন্দী ছিল, পরে রাক্ষসীর মত নিদয়া হইয়া আলতমসের অন্তঃপুরে যত স্ত্রীলোক ছিল তাহারদের সকলকে বধ করিল. এই নির্দয় ক্রিয়াতে সকলের মনে উদ্বেগ জন্মিল, ও বাঙ্গালাহইতে যে রাজকর দিল্লী যাইতেছিল তাহা সুবে অযোধ্যার অধ্যক্ষ বাদশাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহমূদ লইয়া আপনি স্বাধীন হইলেন. সে কালে যে প্রধান রাজারা ছিলেন তাহারা ফীরোজের প্রতিকূলে সকলে একবাক্য হইলেন, তাহাতে তাহারা জয়ী হইয়া আলতমসের কন্যা রজিয়াকে সিংহাসনে বসাইলেন, এবং ফীরোজ শাহের মাতাকে কারাবদ্ধা করিলেন. কতক কাল পরে ফীরোজ সুলতানা রজিয়ার হস্তে পড়িলেন ও কারাবদ্ধ হইলেন, ও ছয় মাস আটাইশ দিন রাজ্য করিয়া কারাগারেই মরিলেন.

সুলতানা রজিয়া.

দিল্লীর সিংহাসনোপরি আরোহণের যেং গুণ অপেক্ষিত সে সকলেতে সুলতানা রজিয়া বিখ্যাতা ছিলেন, এবং যেং লোক তাহার দোষ গুণ সুক্ষ্ম বিবেচনা করিত তাহারা কেবল তাহার এক দোষ পাইত, যে তিনি স্ত্রী. তাহার পিতা যে বৎসরে গড় গোয়ালিয়র লইলেন সেই বৎসরে তিনি আপন কন্যাকে রাজ্যের অধ্য

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার'

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে পশ্চিমের দ্বার বাঙালীর কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল। পশ্চিমের হাওয়া বাঙালীকে আন্দোলিত করেছিল—আকৃষ্ট করেছিল নতুন পথের দিকে, নতুন জ্ঞান রাজ্যের দিকে। বাঙালী, ইংরেজির মাধ্যমে, গ্রহণ করেছিলেন প্রতীচ্যের আধুনিক ঐশ্বর্য আর সেই ঐশ্বর্যে সুসজ্জিত করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের কন্ঠ।[১]

এক দেশের সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অপর দেশের সাহিত্যের প্রভাব কম কার্যকরী নয়:

> 'দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। যেখান হইতে যেমন করিয়াই হউক জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানব চিত্ততত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।'
>
> —সবুজ পত্র: প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

সুতরাং এক দেশের সাহিত্যের ওপর অপর দেশের সাহিত্যের প্রভাব নিরূপণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ লেখকরা সমৃদ্ধশালী ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবের স্বরূপ সন্ধানে অনেক সময় উৎসাহ বোধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে লরি ম্যাগ্‌নাস্‌ বিরচিত, বর্তমান শতাব্দীতে প্রকাশিত, 'English in its foreign Relations' (1927) শীর্ষক গ্রন্থটি স্মরণীয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংগে ইংরেজি সাহিত্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইংরেজি সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রাপ্তির পরিমাণ ও পরিণাম নির্ধারণের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। এই আবশ্যকতার দিকে লক্ষ্য রেখে বিদগ্ধ

১. প্রসংগক্রমে স্মরণীয় যে পাশ্চাত্যের মানুষ ক্রমশঃ বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে গ্রহণ করেছিলেন প্রাচ্য ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য। 'পশ্চিমের সেবার সাধনায় বিষয়টিও গবেষণার একটি মূল্যবান বিষয়। সম্প্রতি ডঃ অমলেন্দু বসু প্রতীচ্যের ওপর "গীতার প্রভাব সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন:

বাঙালী সমাজ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টি অনুধাবনে প্রযত্ন নিয়েছেন। এই অনুধাবনের ইতিহাস অন্বেষণ করে সর্বপ্রথম বরদাচরণ মিত্রের ইংরেজিতে লেখা একটি প্রবন্ধের পরিচয় পাই।২ পনের পৃষ্ঠার একটি ক্ষীণকায় প্রবন্ধে এই ধরনের আলোচনা অবশ্যই সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু, প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে এই প্রবন্ধটি মূল্যবান।

উল্লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থে ও প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের ওপর ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসংগে প্রমথনাথ বসু-র 'Hindu Civilisation under British Rule' (১৮৯৬), আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 'New Essays in Criticism' (১৯০৩) যদুনাথ সরকারের 'India through the Ages' (১৯২৮), শ্রীঅরবিন্দ লিখিত 'The Awakening of Bengal' (বাংলা অনুবাদ 'ভারতের নবজন্ম'), শশাঙ্কমোহন সেনের 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী—রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র এবং আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য'৩ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য'৪ ইত্যাদি —স্মরণীয়। কিন্তু, এই সমস্ত গ্রন্থে—প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের ওপর ইংরেজি অথবা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে পূর্ণাংগ আলোচনা করা হয় নি।

পূর্ণাংগ আলোচনায় পরবর্তীকালে যাঁরা ব্রতী হলেন তাঁদের মধ্যে প্রিয়রঞ্জন সেন নিঃসন্দেহে একজন শক্তিশালী পথিকৃৎ। তাঁর গ্রন্থ৫ বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান তথ্য সর্বপ্রথম আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করলেও, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা (কাব্য-নাটক-গদ্য) নিয়ে একটি গ্রন্থে আলোচনার ফলে কোন ধারার আলোচনা পরিপুষ্টি লাভ করে নি। তবে, বাংলা সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা হিসাবে এই গ্রন্থটি আজও অনন্য। এই প্রসংগে স্মরণীয় যে প্রিয়রঞ্জন সেনের গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার কিছুকাল পূর্বে উর্দু সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের

প্রভাব সম্পর্কিত একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ৬ রচনা করেছিলেন সৈয়দ আবদুল লতিফ।

যাই হোক, প্রিয়রঞ্জন সেনের গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পরও বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে এবং বিস্তৃত আকারে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেল। এই প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলা কাব্য সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনায় অগ্রসর হলেন হরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত।৭ বর্তমানকালে, এই রকম ধারাভিত্তিক আলোচনার ক্ষেত্রে ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য,৮ ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার৯ এবং ডঃ অর্চনা মজুমদারের নাম স্মরণীয়।১০

এই সমস্ত গ্রন্থ ছাড়াও, সাম্প্রতিক কালে, বাংলা সাহিত্যের ওপর ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে ক'তিপয় প্রবন্ধ রচিত হয়েছে: ডঃ অমলেন্দু বসু-র 'Brajendranath Seal as a literary critic'১১ ও 'The Palm groves by the Indian Sea'১২ এবং ডঃ রবি দাশগুপ্তের 'Indian Response to western Literature.'।১৩ তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের ওপর পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু; তারকনাথ সেন, ডঃ সৌরীন মিত্র, সুনীলচন্দ্র সরকার প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যে শেক্সপীয়রের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ডঃ অমলেন্দু বসু, বিষ্ণু দে, ডঃ সিতাংশু মৈত্র প্রভৃতি।

বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের এই বিস্তৃত তালিকা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাংলা সাহিত্যে ইংরেজির প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনার পরিমাণ স্বল্প নয়। কিন্তু

এই সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরও একটি ধারার ওপর ইংরেজি অথবা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন গবেষণা কার্য হয় নি। সুতরাং, বর্তমান গ্রন্থে, উপেক্ষিত এই ধারার ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব অন্বেষণে সচেষ্ট হয়েছি।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব নিরূপণের একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি লগ্ন থেকেই কাব্য সাহিত্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বাংলা কাব্য সম্পূর্ণ দেশীয় পরিবেশে পরিপুষ্ট হয়ে মধ্যযুগেই ডানা বিস্তার করেছিল মঙ্গল কাব্যে, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীতে এবং লোকগীতিতে। অপরপক্ষে, লিখিত গদ্যের যে দৃষ্টান্ত উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় তার সবটাই রাজকার্য ও বৈষয়িক কার্য সম্পর্কিত চিঠিপত্র ও দলিল প্রভৃতি এবং কড়চা জাতীয় দুই-একটি পুস্তিকার ক্ষীণ ধারায় আবদ্ধ ছিল। সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে গদ্য তখন স্বীকৃতি পায় নি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা গদ্য যখন সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল তখন থেকেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং ভাষারীতি, ইংরেজি সাহিত্যের ওপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, গড়ে উঠতে লাগল।

অপরপক্ষে, উনবিংশ শতাব্দীতে, বাংলা কাব্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫২) প্রকাশিত হবার পূর্বে তেমন প্রকট নয়। গুপ্ত-কবির নাম স্মরণ রেখেও একথা বলা যায়; কারণ, অনেকাংশে তিনি ছিলেন কবিওয়ালাদেরই উন্নত উত্তর সাধক।

যে কোন ভাষা ও সাহিত্যের মেরুদণ্ড হল গদ্য। সাহিত্যে কল্পনার উজ্জীবন যেমন প্রধানতঃ কাব্যের মাধ্যমে ঘটে, তেমনি চিন্তার উজ্জীবন ঘটে মূলতঃ গদ্যের মাধ্যমে। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের চিন্তাজগতে যে বিস্ময়কর আলোড়ন গত শতাব্দীতে দেখা গিয়েছিল সেই আলোড়নের পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে সেদিনের বাংলা গদ্য রচনায়।

এই চিন্তাধারার সূত্রেই আমি উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্যে ইংরেজি প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনায় বর্তমান গ্রন্থে ব্রতী হয়েছি। এ ধরনের আলোচনার ক্ষেত্রে আমার পূর্বসূরী ডঃ শিশিরকুমার দাসের গ্রন্থ১৪

থেকে ভাষারীতির উপর প্রভাব সম্বন্ধে মূল্যবান সূত্র পেয়েছি। তিনি কেরি থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ভাষারীতির বিবর্তনের আলোচনা প্রসংগে ইংরেজি প্রভাব সম্বন্ধে তথ্যাদির উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন।

এই গবেষণামূলক গ্রন্থে, আমি বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং ভাষারীতির ক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব প্রদর্শনে প্রযত্ন নিয়েছি। গ্রন্থের শিরোনামায় প্রযুক্ত দুটি শব্দের ('প্রভাব' এবং 'সাহিত্য') তাৎপর্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। প্রভাব (প্র — ভূ + ঘঞ্) শব্দটির অর্থবিশ্লেষণে বিভিন্ন অভিধানকারের বক্তব্য অনুসরণ করলে দেখা যায় :

প্রভাব—প্রকৃষ্টভাব।১৫

প্রভাব—প্রভুশক্তি, যে শক্তি অপরকে পরিচালিত করে, influence।১৬

ইংরেজ আমাদের শাসনকার্যে তার প্রভুশক্তি সক্রিয় রাখলেও বাংলা সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভুশক্তির অস্তিত্ব ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা গদ্য সাহিত্য সর্বক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভুশক্তি বা প্রভুত্ব অন্ধভাবে মেনে নিয়েছে এমন মনে করা চলে না। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইংরেজি সাহিত্যের প্রকৃষ্ট ভাবসমূহ, আমাদের সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রয়োজনে, আমরা গ্রহণ করেছিলাম। সুতরাং, বাংলা গদ্য সাহিত্যে ইংরেজি সাহিত্যের প্রকৃষ্ট ভাবসমূহ কোন পর্যায়ে কিভাবে প্রবেশ করে আমাদের সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছিল সেই দিকটিই লক্ষণীয়।

তবে, এই 'প্রকৃষ্ট ভাব' বা প্রভাবের অনুসন্ধান দুরূহ কাজ। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রভাব কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ প্রভাবের চেহারা যেমন সহজে ধরা পড়ে, পরোক্ষ প্রভাবের চেহারা তেমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। অনেক সময়ই পরোক্ষ প্রভাব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনুমানের ওপর অধিক নির্ভর করতে হয় এবং সে ক্ষেত্রে ভ্রান্ত অনুমানের সম্ভাবনাও থেকে যায়। বর্তমান গ্রন্থে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের প্রভাব অনুসন্ধানেই সচেষ্ট থেকেছি।

শিরোনামায় ব্যবহৃত 'সাহিত্য' শব্দটি সম্বন্ধেও একটু বক্তব্য রাখা প্রয়োজন। সাধারণতঃ এই প্রশ্ন জাগে, ফিলিক্স্ কেরি-র 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' অথবা পাদরি ইয়েট্স্-এর 'পদার্থবিদ্যাসার' কিংবা অক্ষয়কুমারের 'চারু পাঠ'

১৫. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ, ২য় খণ্ড।

১৬. রাজশেখর বসু : চলন্তিকা।

এবং বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থ সাহিত্যের অন্তর্গত করা চলে কি? অথবা, বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শন প্রভৃতির আলোচনাও সাহিত্য পদবাচ্য কি? সাহিত্যের রাজ্যের বিস্তৃতি কতটা এ সম্বন্ধে সঠিক সীমারেখা নির্ধারণ অসম্ভব বলেই অনেকে মনে করেন১৭। কিন্তু, এর পরও প্রশ্ন থেকে যায়: কৃষ্ণকমলের 'পৌলবর্জ্জিনী' বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র সংগে উপরি উল্লিখিত গ্রন্থগুলি এক পংক্তিতে স্থান লাভের যোগ্য কিনা। বর্তমান গ্রন্থে, 'সাহিত্য' শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করে এই সমস্যার সমাধানে ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য সাহিত্যকে, ইংরেজ সাহিত্যিক ডিকুয়েন্সী প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণে, দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি: জ্ঞানের সাহিত্য (Literature of Knowledge) এবং ভাবের সাহিত্য (Literature of Power / Creative Literature)।

এই প্রসংগে আরও একটি কথা স্মরণ করছি। সাহিত্যের আলোচনা হলেও বিষয়বস্তুর সংগে সংগে ভাষারীতির প্রভাব সম্বন্ধেও তথ্যাদি উদ্‌ঘাটন করেছি; কারণ, একটি অপরটির সংগে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। যে বিষয়বস্তু নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্য গত শতাব্দীতে গড়ে উঠেছিল সেই বিষয়-বস্তুর রূপদানের জন্য বাংলা গদ্যে ইংরেজি প্রভাবিত যে ভাষারীতি গড়ে উঠেছিল তার পরিচয় গ্রহণ আবশ্যক। তাছাড়া, কোন কোন গ্রন্থের সঠিক প্রকাশ কাল এবং সঠিক শিরোনামা নির্দেশের চেষ্টা প্রয়োজনবোধে করেছি।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের পরিমাণ ও প্রবণতার বিভিন্নতা অনুসারে আমার আলোচনা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছি। ইংরেজি প্রভাবের পরিমাণ ও প্রবণতার বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮০০) পর থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ (১৮৪৩) তথা অক্ষয়কুমার দত্তের বাংলা সাহিত্যের আসরে আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব যে ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল তার পরিবর্তন ঘটে। এই সময় অক্ষয়কুমার এবং বিদ্যাসাগরের প্রতিভা-স্পর্শে

১৭. 'It is difficult to determine the boundary beyond which the historian of literature need not or may not pass into various fields of specialised and technical writing'

—Baugh, A. C., Literary History of England, Vol. IV, p. 1322.

ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল। আবার, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত ইংরেজি প্রভাবের প্রবণতা ও পরিমাণ পরিবর্তিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-স্পর্শে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রেও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ (ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা), ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ) এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ (বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব) বাংলা গদ্যের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। সুতরাং, তিনটি পর্যায়ে বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা বিভক্ত করেছি : প্রথম পর্যায় (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ), দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তৃতীয় পর্যায় (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ)।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'অবতরণিকা'য় ইংরেজি প্রভাবের পশ্চাদভূমি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। প্রথম পর্যায়ের অন্তর্গত তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও ভাষারীতির ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যথাক্রমে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও ভাষারীতিতে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের ক্ষেত্রেও একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুত্ব বিবেচনায় নবম অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছি। দশম অধ্যায়ে আমার গবেষণা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছি।

রবীন্দ্রনাথকে আমার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করি নি। উনিশ শতকের শেষ বিশ বছর ধরে তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় সতত সচেষ্ট থেকেছেন; কিন্তু, তিনি যথার্থ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন বিংশ শতাব্দীতে। সুতরাং, বিংশ শতকের রবীন্দ্র-রচনা বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আমার এই গ্রন্থ বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস নয়। তাই, উনিশ শতকে বিরচিত অনেক গদ্য গ্রন্থই আমার আলোচনার বাইরে রেখেছি। উনিশ শতকের সেই সমস্ত গদ্য গ্রন্থই উল্লিখিত এবং আলোচিত হয়েছে যে সমস্ত গ্রন্থ ইংরেজি সাহিত্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত।

এই গ্রন্থে ইংরেজি প্রভাবের আলোচনা হয়েছে; কিন্তু, আলোচনায় সময় অনেক ক্ষেত্রে 'ইংরেজি' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রতীচ্য' অথবা 'পাশ্চাত্য' শব্দগুলির

ব্যবহার করা হয়েছে। আমার লক্ষ্য ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব; কিন্তু প্রসংগতঃ দুই-একজন, ইংরেজ নন এমন, পাশ্চাত্য গ্রন্থকার বা দুই-একটি পাশ্চাত্য গ্রন্থের উল্লেখ করেছি। এই প্রসংগে স্মরণীয়, ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য প্রতীচ্য অথবা পাশ্চাত্য গ্রন্থের প্রভাবও মূলতঃ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই আমাদের দেশে উপস্থিত হয়েছিল। আর, এই কারণেই 'ইংরেজি' 'প্রতীচ্য' 'পাশ্চাত্য' প্রভৃতি শব্দ সমার্থক হিসাবে গ্রহণ করেছি।

এই গবেষণার ক্ষেত্রে মুখ্য উপকরণ এবং গৌণ উপকরণ উভয়ই প্রয়োজন মতো কাজে লাগিয়েছি। উনিশ শতকের বিভিন্ন বাংলা গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা থেকে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব অন্বেষণের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের সরাসরি সাহায্য নিয়েছি। এগুলোই আমার মুখ্য উপাদান। এই ক্ষেত্রে, উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে প্রকাশিত গ্রন্থনিচয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে আমাকে বিশেষ পরিশ্রম এবং সময় ব্যয় করতে হয়েছে; কারণ, এই সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। মূলতঃ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ন্যাশানাল লাইব্রেরী এবং শ্রীরামপুরের কেরি মিউজিয়াম থেকে এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করবার সুযোগ পেয়েছি।

বাংলা সাহিত্যে ইংরেজি প্রভাব সম্বন্ধে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ আমার গবেষণার গৌণ উপাদান। এই গবেষণার ক্ষেত্রে টি. এস. এলিয়টের অনুশাসন অনুসারে তথ্য ও বিশ্লেষণপন্থী থাকবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি।১৮ গৌণ উপাদান নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আমি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেছি এবং সে-সমস্ত গ্রন্থ এবং আলোচনার ওপরই নির্ভর করেছি যেগুলো অত্যন্ত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ। গৌণ উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগার (Bengali Manuscript Library) এবং British Council Library-র সাহায্য পেয়েছি সর্বাধিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব কিভাবে সক্রিয় ছিল তার পরিচয় গ্রহণ করতে গিয়ে একই সংগে আনন্দ

১৮. 'Any book, any essay, any note in Notes and Queries, which produces a fact even of the lowest order about a work of art is a better piece of work than nine-tenths of the most critical journalism, in journals or in books.

—Eliot, T. S., The Function of Criticism, Selected Essays, 1951, p. 33.

এবং নৈরাশ্য বোধ করেছি। আনন্দ এইখানে যে এ ধরনের একটি স্বল্প আলোচিত বিষয়ের ওপর ধারাবাহিক গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু বিস্তৃত সময় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রায়শঃই নৈরাশ্য বোধ করেছি, কবি ব্রাউনিং-এর একটি পংক্তি ঘুরে-ফিরে স্মরণে এসেছে :

'Look at the end of work. contrast
The petty Done, the Undone vast...'১৯

১৯. Young, W. T., Robert Browning : A Selection of Poems, First edition, p. 62.

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবতরণিকা

বাংলা লিখিত গদ্যের যথার্থ সূত্রপাত হয়েছিল গত শতাব্দীর প্রারম্ভে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার কাল থেকে (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ)। বিষয়বস্তু (content) এবং ভাষারীতি (style)-র ক্ষেত্রে, এই সময় থেকেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সে যুগে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী এবং খ্রীষ্টান মিশনারিগণ ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ সম্মুখে রেখে বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্‌বোধনে ও উজ্জীবনে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলা গদ্য সাহিত্য নানা সূত্র থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের আদর্শ গ্রহণ করেছিল। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের পশ্চাদ্‌ভূমি হিসাবে ইংরেজি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সভা-সমিতি সবিশেষ সক্রিয় ছিল।

ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—হিন্দু কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, ওরিয়েন্টাল সেমিনরি, হুগলী কলেজ, শ্রীরামপুর কলেজ প্রভৃতি—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই সমস্ত শিক্ষায়তনের পাঠ্যক্রম বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং ভাষারীতি নির্মাণে পরোক্ষভাবে কার্যকরী ছিল। এই প্রসংগে কতিপয় শিক্ষায়তনের পাঠ্যক্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করছি :

পাঠ্যক্রম

শিক্ষায়তন	ইংরেজি সাহিত্য	বিজ্ঞান	ইতিহাস	বিবিধ
হিন্দু কলেজ ১	সেক্সপীয়র; গ্রে, মিলটন, পোপ, এ্যাডিসন, জনসন্ ইয়ং, কুপার এবং বেকন-এর রচনা ও ইংরেজি রেটারিক	মেকানিক্স্, হাই-ড্রোষ্ট্যাটিক্স্, অপটিক্স্, নিউ-ম্যাটিক্স্, বিদ্যুৎ, জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়ন	রোম ও ভারতবর্ষের ইতিহাস	—

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৮৪ সংখ্যা, ১৭৭২ শকাব্দ।
Report of the examination questions and answers of the students of Hindu College and Free Church Institution, Calcutta Review, vol-V. 1846.
Sen P. R., Western Influence in Bengali Literature pp. 61, 62, 104.
যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার উচ্চশিক্ষা পৃ ১১-১২।

পাঠ্যক্রম

শিক্ষায়তন	ইংরেজি সাহিত্য	বিজ্ঞান	ইতিহাস	বিবিধ
ওরিয়েন্টাল সেমিনরি[২]	সেক্সপীয়র, মিলটন, বেকন-এর রচনা	—	—	—
শ্রীরামপুর কলেজ[৩]	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	ভূগোল বিদ্যা ও খগোল বিদ্যা	পূর্ববৃত্তান্ত বিদ্যা বা ইতিহাস	—
হুগলী কলেজ : সিনিয়র ক্লাস[৪]	সেক্সপীয়র, মিল্‌টন্‌ বেকন-এর রচনা	—	-	—
হুগলী কলেজ : জুনিয়র ক্লাস[৫]	এ্যাডিসন এবং গোল্ডস্মিথ-এর প্রবন্ধাবলী এবং রিচার্ডসন-এর 'কাব্য সঞ্চয়ন'।	—	—	—
কৃষ্ণনগর কলেজ : সিনিয়র ক্লাস[৬]	রিচার্ডসন-এর 'কাব্য সঞ্চয়ন' [পোপ, ড্রাইডেন প্রভৃতির কবিতা]	—	ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস	মিল-এর তর্ক বিদ্যা।
কৃষ্ণনগর কলেজ : জুনিয়র ক্লাস[৭]	রিচার্ডসন-এর ইংরেজি গদ্যের রীডার	অঙ্ক ও ভূগোল	রোমের ইতিহাস	ঈশপের গল্প এবং গে-এর গল্প
বিশপ্‌স্‌ কলেজ[৮]	বিভিন্ন ভাষা : গ্রীক, হিব্রু, লাটিন, ইংরেজি এবং ভারতীয় ভাষাসমূহ	—	ইতিহাস	দর্শন শাস্ত্র

২. সংবাদ প্রভাকর, ২২শে চৈত্র, ১২৫৪।
৩. সমাচার দর্পণ জুলাই, ১৮২২।
৪. কালিদাস নাগ, সম্পাদিত, অক্ষয় রচনা সম্ভার, 'পিতাপুত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃ ১৩৫।
৫. তদেব।
৬. বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়, ১ম সংস্করণ পৃ ১৯-২০।
৭. তদেব।
৮. Ed., Basu, Anathnath, Adam's Report (Calcutta University), p 24.

বিভিন্ন শিক্ষায়তনের পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত ছকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে হিন্দু কলেজ, ওরিয়েন্টাল সেমিনরি এবং হুগলী কলেজের সিনিয়র ক্লাসে সেক্সপীয়র, মিলটন এবং বেকন-এর রচনা পড়ানো হ'ত। সেক্সপীয়র এবং মিলটন-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বাংলা ভাবের সাহিত্যে—বিশেষতঃ নাটকে ও কাব্যে। অপরদিকে, বেকন-এর রচনাবলী উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নব্য বাঙালীর চিন্তাজগৎ বিশেষভাবে আন্দোলিত করেছিল। রামমোহন একসময় বেকন-এর 'Novum Organum'-এর বংগানুবাদে স্কুল বুক সোসাইটিকে বিশেষ উৎসাহিত করেছিলেন।৯ পরবর্তী কালে রামকমল ভট্টাচার্য বেকন-এর 'Essays' এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'Advancement of Learning'-এর বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

এ্যাডিসন-এর রচনাবলী পড়ানো হ'ত হিন্দু কলেজে এবং হুগলী কলেজের জুনিয়র ক্লাসে। এ্যাডিসন সে যুগের বাঙালীর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। হিন্দু কলেজে পাঠকালে, ভূদেব 'স্পেকটেটর' পত্রিকার অনুকরণে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতেন।১০ হিন্দু কলেজের অপর একজন ছাত্র রামগোপাল ঘোষ তাঁর সাময়িক পত্রের নাম দিয়েছিলেন 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—সম্পাদিত 'বিচারক' পত্রিকাটি এ্যাডিসন-এর 'স্পেকটেটর' পত্রিকার আদর্শ অনুসরণ করে একটি মাত্র সন্দর্ভে পূর্ণ করা হ'ত।১১ হুগলী কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের ওপরও এ্যাডিসন-এর প্রভাব অল্প ছিল না। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা জন্‌সন্—এর রচনাবলীর সংগেও পরিচিত হয়েছিলেন। জন্‌সন্-এর 'রাসেলাস' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন যথাক্রমে কালীকৃষ্ণ দেব এবং তারাশঙ্কর তর্করত্ন।

বিশপ্‌স্ কলেজে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কবি শ্রীমধুসূদন কিছুকাল এই কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন। অনুমান করা চলে, এই কলেজে পাঠকালেই, তিনি বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় শিক্ষিত হবার প্রাথমিক উৎসাহ পেয়েছিলেন।

সাহিত্য ছাড়া ইতিহাস এবং বিজ্ঞান পাঠের ওপরও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে

৯. Mazumder, J. K., Raja Rammohan Roy and Progressive Movements in India, Introduction. first edition, p XIVI.

১০. কুমারদেব মুখোপাধ্যায়, ভূদেব চরিত, ১ম সংস্করণ, পৃ ৬৫।

১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২), ৩য় সংস্করণ, পৃ ১৩।

অন্নবিস্তর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন বিভাগয়ে ইতিহাস এবং বিজ্ঞান চর্চার ফলে বাঙালী এই সমস্ত বিষয়ের প্রতিও আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। আর, বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজনে সে যুগের অনেক গদ্যকারই বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণের পথ ধরে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

শিক্ষায়তনে ইংরেজি সাহিত্যের সংগে সুপরিচিত হয়ে বাঙালী গদ্যকারেরা যেমন ভাবের সাহিত্য (Literature of Power) গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি ইংরেজি ইতিহাস ও বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের অনুসরণে বাংলা গদ্যে জ্ঞানের সাহিত্য (Literature of Knowledge) সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং, ইংরেজির প্রভাবে, বাংলা গদ্যে বিষয়বস্তু (Content)-র ক্ষেত্রে জ্ঞানের সাহিত্য (Literature of Knowledge) এবং ভাবের সাহিত্য (Literature of Power), এই উভয় ধারাই, বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল।

ইংরেজি সাহিত্যের সংগে সুপরিচিত হবার ফলে, বাঙালী গদ্যকারেরা ইংরেজি বাক্যগঠন রীতির দ্বারাও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে ইংরেজি অলংকারের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। প্রসংগক্রমে স্মরণীয়, হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ইংরেজি অলঙ্কার শাস্ত্র (Rhetoric) পাঠ করেছিলেন (পূর্বে উদ্ধৃত ছক দ্রষ্টব্য)।

হিন্দু কলেজ সে যুগে ইংরেজি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য বাঙালী সম্প্রদায়ের প্রতীচ্য মানসিকতা গঠনে দুইজন শিক্ষকের অবদান ছিল অপরিসীম। একজন ডিরোজিও, অপরজন রিচার্ডসন। ডিরোজিও-র প্রভাবে হিন্দু কলেজের বিদ্যার্থীরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন ভল্‌তেয়ার, লক্‌, বেকন এবং টম পেইন-এর গ্রন্থরাজি থেকে। বিশেষতঃ টম পেইন-এর 'Age of Reason' গ্রন্থটির প্রতি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এক সময় গ্রন্থটির চাহিদা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে এক টাকা মূল্যের গ্রন্থ পাঁচ টাকায় বিক্রীত হয়েছিল।১২

যাই হোক, হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যুক্তিবাদের বীজ বপন করেছিলেন। এই যুক্তিবাদের পথ অনুসরণ করেই শুরু হয়েছিল সংস্কার মুক্তির আন্দোলন। এবং সংস্কার মুক্তির আন্দোলন তীব্র করবার জন্য

১২. Mazumder, R. C., British Paramountcy & Indian Renaissance, Vol. II, Part. II. first edition, p 39.

ডিরোজিও-র শিষ্যেরা যুক্তিবাদ সম্বল করে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেছিলেন—'হেস্‌পেরাস্', 'এনকোয়ারার', এবং 'কুইল্'। তাছাড়া, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রেরা কতিপয় সাময়িক পত্র পরিচালনা করেছিলেন : 'পার্থেনন্', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'হিন্দু পাইওনীয়র', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'।

ডিরোজিও-র পর হিন্দু কলেজের আর একজন প্রতিভাবান শিক্ষক ডি. এল. রিচার্ডসন ছাত্রদের মনে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডিরোজিও ছিলেন কবি—কিন্তু, কাব্য অপেক্ষা প্রতীচ্যের যুক্তিবাদ ও মানবিকতার আদর্শ ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে অধিক যত্ন নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব বিদ্যালয় গৃহের বন্ধন থেকে বিমুক্ত করে বিস্তৃত করেছিলেন তরুণ সমাজে। আর, রিচার্ডসন বিদ্যালয়-গৃহে, চার দেয়ালের মধ্যে, ইংরেজি সাহিত্যের মায়া জগৎ সৃষ্টি করে ছাত্রদের আকৃষ্ট করেছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি। একজন যুক্তির স্বচ্ছ কঠিন রাজ্যের দিকে তরুণ সমাজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; অপরজন ভাবের অন্তর্লীন জগতের রহস্যময়তার আস্বাদনে তরুণ সমাজকে উৎসাহিত করেছেন।

সুতরাং, ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি যথার্থ প্রীতি সঞ্চারে রিচার্ডসন-এর ভূমিকা ডিরোজিও অপেক্ষা অধিক কার্যকরী ছিল। তাঁর অনুপম অধ্যাপনা ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি ছাত্রদের ঐকান্তিক অনুরাগ সৃষ্টি করেছিল। আর, হিন্দু কলেজ ছাড়াও তিনি সে যুগের আরো কয়েকটি শিক্ষায়তনে (হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, মেট্রোপলিটন কলেজ) তাঁর অনুপম অধ্যাপনার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। মধুসূদনের ওপর সেক্সপীয়র তথা ইংরেজি কাব্য সাহিত্যের প্রভাবের ভিত্তিভূমি নিঃসন্দেহে রচিত হয়েছিল হিন্দু কলেজের পাঠকক্ষে, রিচার্ডসন-এর অতুলনীয় অধ্যাপনায়। সেক্সপীয়র অধ্যাপনায় রিচার্ডসন-এর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ।[১৩] রিচার্ডসন একটি সাহিত্যধর্মী

১৩. **Presidency College Centenary Volume, Part II, Appendix II, Shakespeare Teaching by Richardson : 1837-1843 p 293.**

'লর্ড মেকলে রিচার্ডসনের মুখে সেক্সপীয়রের কিয়দংশের আবৃত্তি শুনিয়া এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন।' (বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, বিদ্যাভারতী সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৯)।

ইংরেজি সাময়িক পত্রিকার (The Calcutta Literary Gazette) সম্পাদনা করতেন।১৪ এই পত্রিকাটি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহ সঞ্চার করে থাকবে।

ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন লেখকের সংগে তিনি তাঁর ছাত্রদের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন। বিদায় সম্ভাষণ উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন :

'I behold my own pupils, old and young, in every direction and I am led to make a rough calculation of the thousands of oriental intellectuals that I have contributed to influence......... them with the thoughts and feelings of the West.........It is a triumph to me to have introduced them to such writers as Bacon and Shakespeare and Milton and Addison and Johnson and Young and Cowper and Hallam and Macaulay.'১৫

সুতরাং, বিভিন্ন শিক্ষায়তনের পাঠ্যগ্রন্থ এবং বিশিষ্ট শিক্ষকগণ বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের পটভূমিকা রচনা করেছিল।

বিভিন্ন ইংরেজি শিক্ষায়তন যেমন ইংরেজি প্রভাবের পটভূমি নির্মাণ করেছিল, তেমনই ইংরেজি আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সভা-সমিতি ইংরেজি প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় ছিল। প্রতীচ্যের যুক্তিবাদ এবং মানবিকতার আদর্শ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করবার অভিলাষে হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও একাডেমিক এসোসিয়েশন (১৮২৮) স্থাপন করেছিলেন। এই সভাকে কেন্দ্র করে সে যুগে নব্য বাঙালী সমাজ পাশ্চাত্যের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন।

এই ধরনের কয়েকটি সভা-সমিতি, প্রতীচ্য জ্ঞান ও সাহিত্যের আলোচনা ও বিস্তারের অভিলাষে, আলোচ্য যুগে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমস্ত সভা-সমিতিতে আলোচিত বিভিন্ন বিষয় বাংলা গদ্যের ইংরেজি প্রভাবিত বিষয়বস্তু (Content) নির্মাণে পরোক্ষভাবে কার্যকরী ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, দুইটি

১৪. 'The Calcutta Literary Gazette, under the editorial management of captain D. L. Richardson, appeared in 1825.'

Carey, W. H.. The Good Old Days of Honorable John Company, 1906 edition, P 290.

১৫. Sen P. R., Western Influence in Bengali Literature, third edition, P 62.

বিশিষ্ট সমিতির (সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা এবং বেথুন সোসাইটি) বিজ্ঞান বিষয়ক এবং সাহিত্য বিষয়ক দু' একটি আলোচনার উল্লেখ করছি :

সভার নাম	সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা	বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা
সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা[১৬]		১. জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পদার্থ বিষয়ক প্রবন্ধ। ২. সাতকড়ি দত্তের 'চক্ষুর গড়ন'। ৩. প্রসন্নকুমার মিত্রের 'কর্ণের গড়ন' ইত্যাদি।
বেথুন সোসাইটি[১৭]	1. McLewis : On the Tragedy of Macbeth. 2. Koylash Ch. Bose : On a Comparative view of the European & Hindu Drama. 3. James Hume : Reading from Shakespeare.	1. Hayes : On the Origin & Development of Modern Science. 2. Dr. Evans : On Chemistry Applied to Agriculture. 3. Dr. Hallcur : Terrestrial Megnetism & Connected Phenomena.

বেথুন সোসাইটিতে পঠিত এই ধরনের সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ পরোক্ষভাবে বাংলা সমালোচনা সাহিত্য সৃজনে উৎসাহ দান করেছিল এবং সাধারণ জ্ঞানো-

১৬. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউএজ—দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ ১৪৪।

১৭. Bethune Society Proceedings, 1862, Lists of Lectures & Subjects of Lectures from 8th January, 1858 to 12th May, 1869, p 35. (সাহিত্য পরিষৎ-এ রক্ষিত আছে)।

পার্জিকা সভা ও বেথুন সোসাইটিতে পঠিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি বাংলা গদ্যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান চর্চা উৎসাহিত করেছিল।

আরো দুইটি অন্য জাতীয় সমিতির বিষয় প্রসংগক্রমে উল্লেখ করছি। স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৮) এবং বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ (১৮৫০), স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনে, বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের বিষয়বস্তু (Content)-তে ইংরেজি প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চারিত করেছিল।

বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু মূলতঃ প্রতীচ্যের জ্ঞান সম্ভারে পূর্ণ করেছিল। ইংরেজি পেনি ম্যাগাজিনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই সমাজ কর্তৃক 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

এই দুই প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে যে সমস্ত গদ্যগ্রন্থ বিবচিত হয়েছিল সেগুলি মূলতঃ ছিল জ্ঞানের সাহিত্যের অন্তর্গত।

শ্রীরামপুরের মিশনারি প্রতিষ্ঠানও বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যেব প্রভাব আনয়নে মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ধর্মপ্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ ধর্মপ্রচারের প্রস্তুতি (Evengelico preparaetio) হিসেবে প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সংগে এই দেশের অধিবাসীদের পরিচয় ঘটাবার উদ্দেশ্যে একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং প্রতীচ্যের ধারা অনুসরণে বাংলা গদ্যে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁদের রচিত গ্রন্থনিচয় বাংলা গদ্যে জ্ঞানের সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করেছিল। ভাষারীতির ক্ষেত্রেও, এই সমস্ত ইংরেজ মিশনারিগণ বাংলা গদ্য রচনায় তাঁদের মাতৃভাষা ইংরেজির আদর্শ দ্বারাই অনেকাংশে পরিচালিত হয়েছিলেন।

উল্লিখিত পটভূমিকায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে যে বাংলা গদ্য সাহিত্য গড়ে উঠল সে বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রথমদিকে দেখা গেল জ্ঞানের সাহিত্যের প্রাধান্য। বাংলা গদ্য সাহিত্যের অগ্রগতির সংগে সংগে ক্রমশঃ জ্ঞানের সাহিত্যের পাশাপাশি ভাবের সাহিত্যের উদ্‌বোধন ও উজ্জীবন শুরু হল।

প্রথম পর্যায়ে (১৮০০—১৮৪৩) ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা গদ্য সাহিত্যে স্বকীয় চিন্তার অভাব, তন্ময়তা (Objectivity)-র আধিক্য এবং তথ্য ও তত্ত্বনিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। রচনার মুখ্য বিষয় ছিল নীতিকথা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান। এই পর্যায়ে কল্পনা ও অনুভূতির অতি বিস্তার (an

extraordinary development of imaginative sensibility)[১৮] অনুপস্থিত। তাই, আত্মগত ভাবনা-বিহীন এ যুগের বাংলা গদ্য সাহিত্য জ্ঞান ও যুক্তির শুষ্ক-কঠিন ভূমির ওপর আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় প্রযত্ন নিয়েছিল। এই পর্যায়ের বাংলা গদ্য সাহিত্য মূলতঃ জ্ঞানের সাহিত্য।

এই পর্যায়ে বিষয়বস্তু (Content)-র দিক থেকে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব মূলতঃ অনুবাদ ও তথ্যানুসরণের মধ্যে সীমিত ছিল। যে দুই-একটি মৌলিক এবং ভাবধর্মী রচনা এ যুগে লিখিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে দু'একটি গ্রন্থ দিগন্তে জলদর্চি রেখার মতো ভাবের সাহিত্যের (Literature of Power বা Creative Literature) আগমন সম্ভাবনা আভাসিত করেছিল। ইংরেজি সাহিত্যের বাস্তবতা (realism) এবং সামাজিক ব্যঙ্গ (social satire) অনুসরণ করে বাংলা গদ্যে ভাবের সাহিত্যের প্রথম চরণধ্বনি শোনা গিয়েছিল ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস' এবং 'কলিকাতা কমলালয়'-এর মধ্যে।

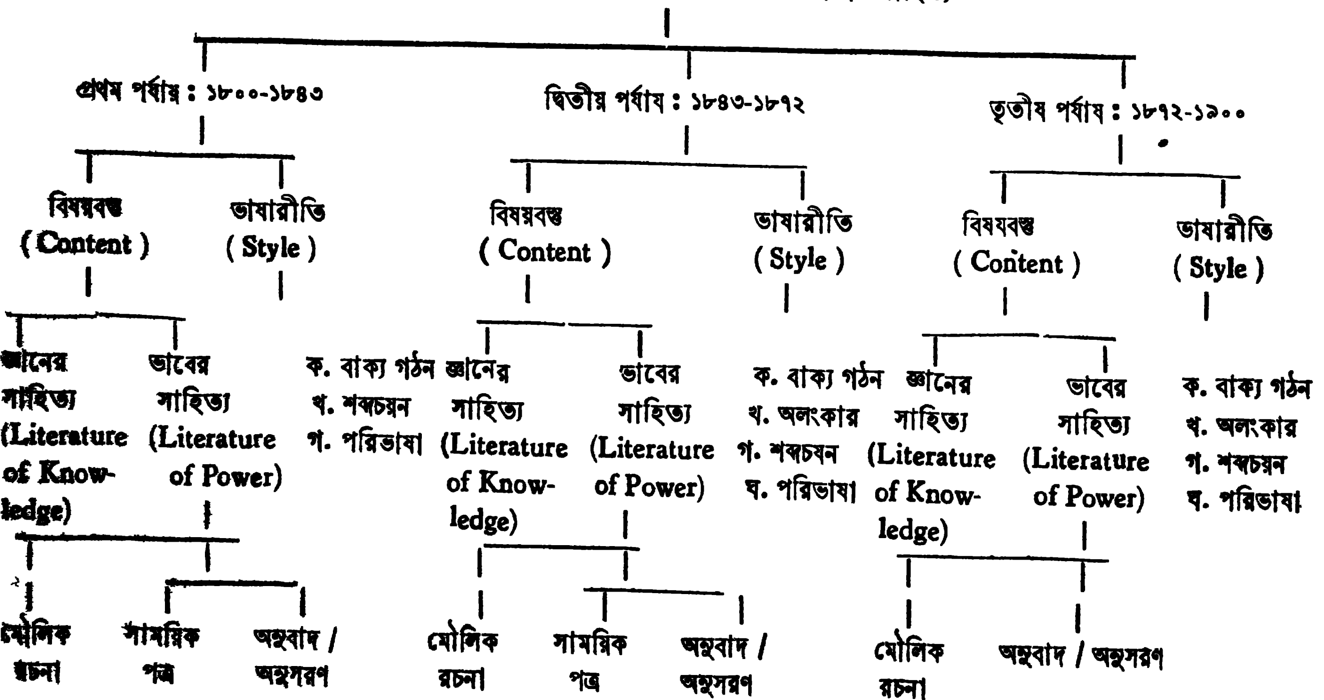
দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৮৪৩—১৮৭২) অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর যুগে জ্ঞানের সাহিত্যের পাশাপাশি ভাবের সাহিত্যের উদ্‌বোধন হয়েছিল। অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' যেমন জ্ঞানের সাহিত্যের অন্তর্গত তেমনি 'স্বপ্নদর্শন' (চারু পাঠ, ৩য় ভাগ) ভাবের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। আবার, বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' এবং 'ভ্রান্তি বিলাস'-এর মধ্যে প্রথমটি জ্ঞানের সাহিত্য এবং দ্বিতীয়টি ভাবের সাহিত্যের অন্তর্গত।

তৃতীয় পর্যায়ে (১৮৭২—১৯০০) বঙ্কিম যুগে ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা গদ্য সাহিত্যে জ্ঞানের সাহিত্য অপেক্ষা ভাবের সাহিত্যের প্রাধান্য দেখা যায়। এই যুগে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব অনুসরণ করে বাংলা গদ্য ভাবের সাহিত্যের উজ্জীবনে উৎসাহিত হয়েছিল।

জ্ঞানের সাহিত্য এবং ভাবের সাহিত্য, এই উভয় ক্ষেত্রেই ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব, উল্লিখিত তিনটি পর্যায়ে, লক্ষ্য করা যায়। প্রভাবের পরিমাণ প্রতিটি পর্যায়ে অবশ্যই সমান নয়। তাছাড়া, এই দুই ধারার বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব নিরূপণের ক্ষেত্রে দুই ধরণের রচনার দিকেই দৃষ্টিপাত প্রয়োজন—(ক) মৌলিক রচনা (খ) অনুবাদ ও অনুসরণ।

বর্তমান গ্রন্থে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব প্রদর্শন প্রসংগে যে আংগিক (structure) অনুসৃত হয়েছে তার একটা সাধারণ ছক দিয়ে 'অবতরণিকা' অংশটির আলোচনা সমাপ্ত করছি :

১৮. Herford-এর উক্তি।


ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য
প্রথম পর্যায় : ১৮০০-১৮৪৩
বিষয়বস্তু (Content)
ভাষারীতি (Style)
জ্ঞানের সাহিত্য (Literature of Knowledge)
ভাবের সাহিত্য (Literature of Power)
ক. বাক্য গঠন
খ. শব্দচয়ন
গ. পরিভাষা
মৌলিক রচনা
সাময়িক পত্র
অনুবাদ / অনুসরণ
দ্বিতীয় পর্যায় : ১৮৪৩-১৮৭২
বিষয়বস্তু (Content)
ভাষারীতি (Style)
জ্ঞানের সাহিত্য (Literature of Knowledge)
ভাবের সাহিত্য (Literature of Power)
ক. বাক্য গঠন
খ. অলংকার
গ. শব্দচয়ন
ঘ. পরিভাষা
মৌলিক রচনা
সাময়িক পত্র
অনুবাদ / অনুসরণ
তৃতীয় পর্যায় : ১৮৭২-১৯০০
বিষয়বস্তু (Content)
ভাষারীতি (Style)
জ্ঞানের সাহিত্য (Literature of Knowledge)
ভাবের সাহিত্য (Literature of Power)
ক. বাক্য গঠন
খ. অলংকার
গ. শব্দচয়ন
ঘ. পরিভাষা
মৌলিক রচনা
অনুবাদ / অনুসরণ

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয়বস্তু (১৮০০-১৮৪৩)

উইলিয়ম কেরি, ফিলিক্‌স্‌ কেরি, রামমোহন, ভবানীচরণ এবং অন্যান্য

এক

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্যের লিখিত রূপের ক্ষীণ অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় কতিপয় কড়চা জাতীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে, রাজকার্য ও বিষয়কর্ম সংক্রান্ত দলিলে ও পত্রে এবং খ্রীস্টান মিশনারিগণের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত দুই একটি পুস্তিকায়। এই সত্য আধুনিক যুগের গবেষকদের বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়েছে :

গদ্য সেদিন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেনি। চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে, জয়পত্র-দানপত্রে, আয়ুর্বেদীয় ব্যবস্থা পত্রে, পর্তুগীজ মিশনারিদের রচনায়, গোস্বামীদের রচিত সহজিয়া কড়চায় অথবা শূন্য পুরাণের ভাষায় আবদ্ধ ছিল।১

The literary potentialities of prose were not comprehended and there is no evidence of any attempt to use prose as a literary medium .....The prose writing which came into being in the 19th century.. had no antecedants in the long history of Bengali literature.২

সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে বাংলা গদ্য সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করল বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে। বাংলা গদ্যের এই নতুন ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর। রাজকার্য পরিচালনা, খ্রীষ্টধর্মের প্রচার, হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং হিন্দুর সনাতন আদর্শ রক্ষার তাগিদ থেকে এই প্রয়োজনের উদ্ভব হয়েছিল। রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ইংরেজ রাজপুরুষদের বাংলা (এবং অন্যান্য প্রাদেশিক) ভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলা গদ্যে পুস্তক প্রণয়নে অগ্রসর হল। অপরদিকে, মিশনারিগণ

---

১. দেবীপদ ভট্টাচার্য, উপন্যাসের কথা, ১ম সংস্করণ, পৃ ১০১।

২. Das, Sisir Kumar, Early Bengali Prose, first edition, p. 4.

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যে পুস্তক প্রণয়নে ব্রতী হলেন। আর, হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধনের প্রয়োজনে নতুন বাংলার প্রথম মানুষ রামমোহন বাংলা গদ্যে লেখনী ধারণ করলেন। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে বাংলা গদ্যের অস্তিত্ব সূচিত হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন এবং রামমোহন প্রভৃতির প্রচেষ্টায়।

এতদ্ব্যতীত, এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সংগে সংগে বিভিন্ন বিদ্যায়তনের জন্য প্রতীচ্যের দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস অনুসরণে বাংলা গদ্যে বিভিন্ন ধরণের পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রযোজনীযতা দেখা দিল।

প্রতীচ্যের চিন্তাজগৎ অনুসরণ কবে জ্ঞানের সাধারণ বিস্তারের (general diffusion of knowledge) জন্যও এই সময বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় রচিত হযেছিল।

প্রযোজনের পথ-বাহিত হযে বাংলা গদ্য আলোচ্য পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে এই সমযের বাংলা গদ্য সাহিত্য ছিল মূলতঃ জ্ঞানের সাহিত্যের (Literature of Power) অন্তর্গত।

উনিশ শতকের শুরু থেকেই, প্রযোজনের তাগিদে, প্রতীচ্যের জ্ঞান-ভাণ্ডার আশ্রয করে, বিভিন্ন ইংবেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণের মাধ্যমে বাংলা গদ্যে জ্ঞানের সাহিত্য দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু, বাংলা গদ্যে ইংরেজি সাহিত্যের প্রেরণাজাত সৃজনীশীল তথা ভাবের সাহিত্য (Literature of Power/Creative Literature) গডে উঠেছিল অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে। নবযুগের বাঙালী ইংরেজি সাহিত্যের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে বাংলা গদ্যে সৃজনীশীল সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেছিলেন। কিন্তু, অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায়, ইংরেজি সাহিত্য নয়, ইংরেজি ভাষা শিক্ষার দিকেই বাঙালীর ঝোঁকটা ছিল বেশী। সরকারি কর্মপ্রাপ্তির প্রয়োজনে সাধারণভাবে ইংরেজি ভাষায় কার্যকরী তথা অর্থকরী জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যেই ইংরেজি ভাষা শিক্ষার তাগিদ অনুভব করেছিলেন, সে যুগের বাঙালীরা।[৩]

৩. বিশেষতো হিন্দু কালেজের ছাত্রদের যে পর্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। যে হেতুক ঐ ছাত্রদের মধ্যে গত বৎসর কেহ কেহ সম্রান্ত ও বিষয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারদের মধ্যে একজন এক প্রধান দপ্তরে তর্জমাকারক আর এক জন মোং নাটকের কালেক্টরি কাছারির প্রধান কেরাণী হইয়াছে।

—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ, পৃ ৬।

সুতরাং, ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রথম অবস্থায় ইংরেজি সাহিত্যের রসাস্বাদন করে ইংরেজি সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবার অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। প্রথম দিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কাজ চালাবার মতো ইংরেজি ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হত।[৪] ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার পর এই কলেজের ছাত্রবৃন্দ ইংরেজি সাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগ লাভ করলেন। অন্যান্য বিদ্যায়তনেও ক্রমশঃ ইংরেজি সাহিত্যের পঠন-পাঠনের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হল।

অবশ্য, হিন্দু কলেজেও প্রথমদিকে বাঙালী ছাত্রেরা ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণিত হযে বিশুদ্ধ সাহিত্য-রস অপেক্ষা যুক্তিবাদের প্রতিই অধিক আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। পরে, রিচার্ডসনের অধ্যাপনায় ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হযেছিল।[৫]

এই প্রসংগে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করছি। যে হিন্দু কলেজ নব্য বাঙালী যুব সম্প্রদায়ের চিন্তা জগৎ পরিচালনা করেছিল সে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা আলোচ্য পর্যাযে নানা ইংরেজি পত্রিকার[৬] সম্পাদনা করলেও বাংলা গদ্য রচনার প্রচেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করেননি। ইংরেজি চিন্তাজগতের ঝোড়ো হাওয়া তাঁদের মানসতরীর পালে লেগে তাঁদের দিশেহারা করে তুলেছিল। বন্দরের শান্ত বন্ধনে তাঁরা ধরা দেননি। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁদের প্রতিভা ক্রিয়াশীল ছিল সমাজকে ইতস্ততঃ আঘাত করবার মধ্যে। সাহিত্য সৃষ্টির কাজে তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন দীর্ঘদিন পরে। বাত্যাবিক্ষুব্ধ ইংরেজি সায়রে ভাসতে ভাসতে অবশেষে তাঁরা যখন দেশীয় বন্দরে উপস্থিত হলেন তখন তাঁরা ইংরেজি তথা প্রতীচ্যের বিপুল ঐশ্বর্য-সম্ভার কাজে লাগাবার পথ খুঁজে পেলেন। অবশ্য মানসিক বিক্ষোভ প্রশান্ত না হলে যে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভবপর নয় সে কথা বলেছেন ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ:

> ...poetry...takes its origin from emotion recollected in tranquillity.[৭]

যাই হোক, আলোচ্য পর্যায়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, রচিত

৪. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, নিউ এজ ২য় সংস্করণ, পৃ ৭৪।

৫. পূর্বোক্ত, ২য় অধ্যায়, পৃ ১৪।

৬. পূর্বোক্ত, তদেব।

৭. Ed., Smith, David Nichol, Wordsworth; Poetry & Prose; 1960 edition, p 171.

হয়েছে বহুবিধ পাঠ্যপুস্তক ; কিন্তু, সে সমস্ত রচনা ভাবের সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। প্রয়োজনের তাগিদে এ পর্যায়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল মূলতঃ জ্ঞানের সাহিত্য।

অবশ্য, জ্ঞানের সাহিত্যের তুলনায় ভাবের সাহিত্যের বিলম্বিত আবির্ভাব সর্বদেশের গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইংরেজি গদ্য অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, ভাবের সাহিত্য নয়, মূলতঃ জ্ঞানের সাহিত্যের বাহন হিসাবেই সক্রিয় ছিল। এদিক থেকে বাংলা গদ্যে ভাবের সাহিত্যের আবির্ভাব বরং ততটা বিলম্বিত লয়ে ঘটেনি। ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বাংলা গদ্য মাত্র অর্ধ শতাব্দী কাল সময়ের মধ্যে ভাবের সাহিত্য সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিল। জ্ঞানের সাহিত্যের মাধ্যমে কার্যকারিতা লাভের অন্তে বাংলা গদ্য 'অকাজের কাজ' এবং 'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়ে'র পথ অনুসরণ করেছিল।

দুই

আলোচ্য যুগে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ইংরেজি প্রভাব অনুবাদ / অনুসরণ, সাময়িক পত্র এবং মৌলিক রচনায় লক্ষ্য করা যায় :

ক. অনুবাদ / অনুসরণ

বিষয়বস্তুর দ্রুত অভাব মোচনের প্রেরণায় এবং আধুনিক জ্ঞানের জগৎ বাঙালীর সম্মুখে উদ্ভাসিত করে তোলার তাগিদে বাংলা গদ্যে বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিল, আলোচ্য পর্যায়ে। এই ধরণের গ্রন্থ একদিকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল, অপরদিকে ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ প্রবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।

ইংরেজি থেকে বাংলা গদ্যে অনূদিত গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল বহুবিচিত্র : খ্রীষ্টতত্ত্ব থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নীতিকথা এবং সাহিত্যধর্মী রচনা পর্যন্ত। বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং খ্রীষ্টতত্ত্ব সম্পর্কিত রচনানিচয় বাংলা গদ্যে জ্ঞানের সাহিত্যের ধারার প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। এই প্রসংগে আলোচ্য পর্যায়ের উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থের নাম স্মরণ করছি :

শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর' (দি গস্‌পেল্ অব্ সেণ্ট ম্যাথু-র অনুবাদ-১৮০০)'ও 'বাইবেল' (নিউ টেস্টামেণ্ট এবং ওল্ড

টেস্টামেন্টের কিছুটা-১৮০১) ; রামকমল সেনের 'ঔষধসার সংগ্রহ' (ফার্মা-কোপিয়া'-র অনুবাদ—১৮১৯) ; পাদ্রি ইয়েটস্-এর 'জ্যোতির্বিদ্যা' (ডেভিড-ব্রিউস্টার-এর গ্রন্থের অনুবাদ—১৮৩৩) ও 'পদার্থবিদ্যাসার' (ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বনে বিরচিত—১৮২৫) ; ফিলিকস্ কেরি-র 'কিমিয়াবিদ্যাসার' (ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বনে বিরচিত—১৮৩৪) ও 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' (গোল্ডস্মিথ-এর 'এ্যান এ্যাব্রিজ্‌মেণ্ট অব্ দি হিষ্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড' গ্রন্থের অনুবাদ—১৮১৯); পীয়ার্স-এর 'পশ্বাবলী' ('এ্যানিম্যাল' বায়োগ্রাফি' গ্রন্থের অনুবাদ—১৮২২) ; ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়-এর 'গ্রীক দেশের ইতিহাস' (গোল্ডস্মিথের 'হিষ্ট্রি অব গ্রীস'-এর অনুবাদ—১৮৩৩) এবং রামমোহন-এর 'খগোল' ও 'জ্যাগ্রাহী' (ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত) এবং ফিলিক্স্ কেরি-র ইংরেজি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া-র আদর্শ অনুসরণে বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বনে বিরচিত 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮১৯) প্রভৃতি গ্রন্থ। এই সমস্ত গ্রন্থ বাংলা গদ্যে পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ভূগোল এবং ব্রিটেন ও গ্রীসদেশের ইতিহাস আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞানের বিষয়কে স্থান দিয়েছিল।

এই পর্যায়ে কয়েকটি ইংরেজি গ্রন্থের বংগানুবাদের মাধ্যমে বাংলা গদ্যে ভাবের সাহিত্যের পথও কিছুটা উন্মুক্ত হয়েছিল। এই প্রসংগে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ-গ্রন্থের নাম স্মরণ করছি : স্কুল বুক সোসাইটি-র 'সদ্‌গুণ ও বীর্যের ইতিহাস,[৮] (এ্যানেক্‌ডোট্‌স্ অব্ ভার্চ্যু এ্যাণ্ড ভ্যালর' গ্রন্থের অনুবাদ —১৮২৯) ; ফিলিক্স্ কেরি-র 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' (জন বানিয়ন-এর 'দি পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস-এর অনুবাদ—১ম ভাগ ১৮২১, ২য় ভাগ ১৮২২), 'পুত্রের প্রতি লর্ড চেষ্টারফীল্ডের উপদেশ'[৯] (চেষ্টারফিল্ডস্ লেটার্স-এর অনুবাদ—লঙ সাহেবের A Descriptive Catalogue-এ উল্লিখিত আছে), প্লুটার্কের 'লাইভ্‌স্'-এর আদর্শে পরিকল্পিত স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'সত্য ইতিহাস সার' —১৮৩০), [১০] কালীকৃষ্ণ দেব কর্তৃক অনূদিত 'রাসেলাস' (জন্‌সন্-এর 'রাসেলাস দি প্রিন্স অব্ আবিসিনিয়া' গ্রন্থের অনুবাদ) প্রভৃতি।

---

৮. গ্রন্থটি মার্শম্যানের অনুবাদ বলে অনুমান করেছেন ডঃ সুকুমার সেন। (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ৩৬)।

৯. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা), কার্তিক ১৩০২, পৃ ৩৫৩।

১০. দেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা চরিত সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, পৃ ১৫২।

এই সমস্ত বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদের ফলে বাংলা গদ্যের বিষয়বস্তু ভাবের সাহিত্যে উন্নীত হবার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। পুত্রের প্রতি :ব্যক্তিগত এবং উপদেশমূলক পত্রাবলী কিভাবে রচনা সৌকর্যে ভাবের সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠতে পারে তারও আদর্শ প্রতিষ্ঠার তাগিদে বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথম লর্ড চেষ্টারফিল্ডের পত্রাবলীর অনুবাদ করা হয়। আর, একটি উপন্যাসধর্মী কাহিনী বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথম স্থান লাভ করল জন্‌সন্‌-এর 'রাসেলাস'-এর অনুবাদের মাধ্যমে।

অনুবাদের মাধ্যমে ভাবের সাহিত্যের প্রথম সূত্রপাত ঘটল ফিলিক্‌স্‌ কেরি-র 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ'১১ শীর্ষক গ্রন্থটির মাধ্যমে। ধর্মীয় তত্ত্ব প্রতিপাদন গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হলেও রূপকধর্মী এই রচনাটি কাহিনী পরিবেশনার গুণে রসোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা গদ্য রচনার সেই শৈশব অবস্থাতেই ফিলিক্‌স্‌ কেরি বিশেষ দক্ষতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। নমুনা স্বরূপ, এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটির দুই একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি :

> কান্তার রূপ এই জগতে ভ্রমণ করত যেখানে এক গুহা ছিল এমত একস্থানে আমি উপস্থিত হইযা শযন করত নিদ্রায পডিলাম। পরে দেখ স্বপ্নে দর্শন করত ছিন্নবস্ত্র পরিহিত আপন গৃহের দিগে বিমুখ এক পুস্তক হস্তে এবং পৃষ্ঠে এক ভারি বোঝা এমত এক লোককে স্বপ্নে দেখিলাম। পরে দৃষ্টি করত সেই লোককে সেই পুস্তক খুলিযা পাঠ করিতে দেখিলাম এবং পাঠ করত সে ব্যক্তি ক্রন্দমান ও কম্পমান হইতে লাগিল। পরে অধিক ধৈর্য্য করণে অসমর্থ হইযা সে ব্যক্তি এক মহা বিলাপ শব্দ করিয়া আমি কি করিব এ কথা কহিয়া চেঁচাইতে লাগিল।
>
> অপরঞ্চ ঐরূপ দশাপন্ন হইয়া সে ব্যক্তি স্বগৃহে ফিরিযা গেল। পরে তাহার

১১. 'যাত্র্যাগ্রসরণ' শিরোনামায় ডঃ সুকুমার সেন এই গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন কিন্তু প্রকাশের কোন তারিখ উল্লেখ করেন নি। (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৫ম সংস্করণ , পৃঃ ৩৫)। ডঃ প্রিয়রঞ্জন সেন ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'যাত্রিকের যাত্রার বিবরণ' গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ফিলিক্‌স্‌ কেরি-র অনুবাদের উল্লেখ করেন নি। (Sen, P, R, Western Influence in Bengali Literature, third edition, p 231).

শ্রীরামপুর কলেজের কেরি লাইব্রেরীতে ফিলিক্‌স্‌ কেরির 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' (প্রথম ভাগ ১৮২১ ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮২২) রক্ষিত আছে। দুইটি ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ২৩৫ ও ২৩১।

স্ত্রীপুত্র ইত্যাদি তাহার দুঃখ না জানে এই নিমিত্তে সে সাধ্য পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিল। পরে তাহার মনোদুঃখ অধিক বৃদ্ধি হওয়াতে সে বহুকাল মনোধারণ করিতে পারিল না তাহাতে অবশেষে সেরূপ ভ্রমনের কথা ভাঙ্গিয়া আপন স্ত্রী পুত্রাদির সহিত এতদ্রূপ কথোপকথন করিতে লাগিল যে তোমরা আমি তোমাদের নিতান্ত মঙ্গলেচ্ছুক জানিবেন মৎ পৃষ্ঠের উপর যে এই অতি ভারি বোঝা ইহাতে আপনা হইতেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিলাম।[১২]

[মূল ইংরেজি অংশ :

As I walked through the wilderness of this world I lighted on a certain place where was a den, and laid me down in that place to sleep ; and, as I slept, I dreamed a dream. I dreamed and behold I saw a man clothed with rags standing in a certain place, with his face from his own house, a book in his hand, and a great burden upon his back.

(Isa. LXIV. 6 ; Luke xiv 33 ; Psxxxviii-4 ; Hab ii. 2)

I looked and saw him opened the book, and read therein : and as he read he wept and trembled ; and not being able longer to certain, he brake out with a lamentable cry, saying "What shall I do ?"

(Acts ii, 37)

In this plight, therefore, he went home, and restrained himself as long as he could that his wife and children should not perceive his distress. But he could not be silent long, because that his trouble increased ; wherefore, at length he brake his mind to his wife and children. and thus he began to talk to them : "O ! my dear wife," said he, "and you, the children of my bowels ; I your dear friend, am in myself undone, by reason of a burden that lieth hard upon me.[১৩]

১২. ফিলিক্স্ কেরি, যাত্রিকদের অগ্রেসরণ বিবরণ, ১ম ভাগ, ১ম সংস্করণ, পৃ ১।

১৩. Bunyan, John, The Pilgrim's Progress, Collins Clear Type Press edition, p 9.

ফিলিক্‌স্ কেরির পর আলোচ্য পর্যায়ে বানিয়ন-এর এই গ্রন্থটির অনুবাদ হয়েছিল। এই প্রসংগে ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'যাত্রিকের যাত্রার বিবরণ' (১৮৩৫) এবং সাটন-এর 'স্বর্গীয় যাত্রীর বৃত্তান্ত (১৮৩৮) উল্লেখযোগ্য।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই সমস্ত অনুবাদ গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। ইংরেজি গদ্যের জনক হিসাবে রাজা আলফ্রেডের নাম স্মরণ করা হয়। অনুবাদের মাধ্যমেই রাজা আলফ্রেড ইংরেজি গদ্যের গোড়াপত্তন করে ছিলেন। অ্যাংলো স্যাক্‌সন্ যুগে তিনি যে ইংরেজি গদ্যের সূচনা করেছিলেন সেই ইংরেজি গদ্য যথার্থ সাহিত্য হয়ে উঠেছিল বেশ কয়েক শতাব্দী পরে। এদিক থেকে বাংলা গদ্য ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সংগে সাহিত্যগুণে বিমণ্ডিত হয়েছিল।

খ. সাময়িক পত্র

ইংরেজি সাময়িক পত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উনিশ শতকের বাঙালী সাময়িক পত্র প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় কলকাতায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্র জেম্‌স্ অগাষ্টাস হিকি-র 'বেঙ্গল গেজেট' (১৭৮৯)। পত্রিকাটি বাঙালীর সম্মুখে ইংরেজি সাময়িক পত্রের আদর্শ সর্ব-প্রথম তুলে ধরে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু কলেজ এবং ইংরেজি উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এ্যাডিসন-স্টীলের সাহিত্যধর্মী সাময়িক পত্রিকার আদর্শের সংগে পরিচিত হয়েছিলেন। এই পরিচয় বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। প্রসংগক্রমে রামগোপাল ঘোষের 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' (১৮৪০), ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' (১৮৬৯) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২)-এর নাম স্মরণ করতে পারি। রামগোপাল ও ভূদেব ছিলেন হিন্দু কলেজের এবং বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন হুগলী কলেজের ছাত্র। এই সমস্ত বিদ্যায়তনে এ্যাডিসন-স্টীল পড়ানো হত।[১৪] আর, ছাত্রজীবনে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এ্যাডিসনের 'স্পেকটেটর'

১৪. পূর্বোক্ত, ২য় অধ্যায়, পৃ ১০, ১১।

পত্রিকার প্রতি আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রজীবনে তিনি 'প্রাইভেট অবজারভার' নামে ইংরেজিতে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকায় কোন একজন সহপাঠী সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করা হলে শিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। শিক্ষক মহাশয় এ প্রসংগে ভূদেবকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন: 'কটূক্তি করা হয় নাই, স্পেকটেটরের অনুকরণ করা হইয়াছে।'[১৫]

যাই হোক, আলোচ্য পর্যায়ের অন্যান্য গদ্য গ্রন্থের মতোই বাংলা সাময়িক পত্রও প্রয়োজনের তাগিদেই প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং, (প্রথম পর্যায়ের সাময়িক পত্রের বিষয়বস্তু সাহিত্যধর্মী ছিল না। খ্রীষ্টান মিশনারিগণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রস্তুতি (Evengelico preparetio) হিসাবে বিভিন্ন বাংলা সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য এবং প্রতীচ্যের বিজ্ঞান—ইতিহাস সম্বন্ধীয় তথ্য সরলভাবে প্রকাশ করতেন। রামমোহন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এবং ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টান সমাজের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রচারের প্রযোজনে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহিত হয়েছিলেন। অপর দিকে, রামমোহন এবং খ্রীষ্টান ভাবধারার বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালনের প্রয়োজনে সাময়িক পত্রিকার আশ্রয় নিয়েছিলেন সনাতন-পন্থী হিন্দু সমাজ। তাছাড়া, ইংরেজি তথা প্রতীচ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের সংগে বাঙালীর পরিচয় ঘটাবার উদ্দেশ্য নিয়েও কতিপয় সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল।) তবে, যে উদ্দেশ্য নিয়েই প্রকাশিত হয়ে থাক এবং যে ধরণের বিষয়বস্তু পরিবেশিত হোক, বাংলা সাময়িক পত্রের ধারা ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণ করেই আমাদের সাহিত্যে উপস্থিত হয়েছিল।

সাময়িক পত্রের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ইংরেজি প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে। সাময়িক পত্রের রচনা-নিচয় এই যুগে বিভিন্ন ইংরেজি বিদ্যালয়ের জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তকের মতোই, বাংলা গদ্যে জ্ঞানের সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ, শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র দিগ্‌দর্শন', (১৮১৮)-এর প্রথম চারটি সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করছি:

১৫. মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, ভূদেব চরিত, ১ম সংস্করণ, পৃ ৬৫।

সংখ্যা	বিষয়বস্তু			
	ইতিহাস	ভূগোল	বিজ্ঞান	বিবিধ
প্রথম সংখ্যা	আমেরিকা দর্শন বিষয়ে	কলম্বসের কথা, পৃথিবী বিভাগের কথা, হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ, বিসুবিয়স পর্বত বিষয়ে	কম্পাসের আকার কম্পাসের গুণ, বলুন দ্বারা সাদ্লর সাহেবের আকাশ গমন	হিন্দুস্থানের বাণিজ্য
দ্বিতীয় সংখ্যা	আলফ্রেড বিষযে	ভারতবর্ষে আসিবার বিবরণ : দৈয়াস, ভাস্কো দি গামা	বাষ্পের দ্বারা নৌকা চালানর বিষয়ে	—
তৃতীয় সংখ্যা	খ্রীষ্টের পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসের সংক্ষেপ বিবরণ, মিশর দেশ বিষয়ে, ইহুদী লোক, আশূর, মাদিয়া, পারস দেশ, রুম দেশ	—	—	ইতিহাস (একটি ঈশপের গল্প)
চতুর্থ সংখ্যা	খ্রীষ্টের জন্মের পর পৃথিবীর বিবরণ, কনস্তান্তীন রাজার কীর্তি, রুম রাজ্যের পূর্ব খণ্ডের বিবরণ, মুসলমানদিগের পরাক্রমের উদ্রেক, চেঙ্গিস খাঁর রাজ্যের বিবরণ ইত্যাদি।	—	পৃথিবীর আকর্ষণ বিষযে	—

দিগ্‌দর্শন পত্রিকার এই রচনাগুলি প্রতীচ্যের বিজ্ঞান-ইতিহাস অনুসরণ করে বাংলা গদ্যে জ্ঞানের সাহিত্যের বিষয়-বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছিল। এই ধরনের অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার মধ্যে পশ্বাবলী (১৮২২), জ্ঞানোদয় (১৮৩১), বিজ্ঞান সেবধি (১৮৩২), বিদ্যাদর্শন (১৮৪২) উল্লেখযোগ্য।

প্রতীচ্যের জ্ঞানের বিষয় নিয়ে সরল ও সাবলীল বাংলা গদ্যে খ্রীষ্টান মিশনারিগণই সর্বপ্রথম, দিগদর্শন পত্রিকার পাতায়, জ্ঞানের সাহিত্যের গোড়া-পত্তন করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে (১৮৪৩-১৮৭২) অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর-রাজেন্দ্রলালের হাতে জ্ঞানের সাহিত্য বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিল। এই সমস্ত রচনা একদিকে যেমন প্রতীচ্যের জ্ঞানরাজ্যের সংগে বাঙালীর পরিচয় ঘটিয়েছিল তেমনি বৃদ্ধি করেছিল বাংলা গদ্যের বিষয়-সম্ভার।

ইংরেজি সাময়িক পত্রের আদর্শ অনুসরণে এই পর্যায়ের কোন কোন বাংলা সাময়িক পত্র 'জার্ণালিজম্' বা সাংবাদিকতার ধারা সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেছিল। এই ধারায় মিশনারিদের পরিচালিত 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) পত্রিকাটি বাংলা গদ্যে সাংবাদিকতার প্রথম প্রবর্তক। নামের মর্যাদা রক্ষা করে পত্রিকাটি সমসাময়িক সমাচার পরিবেশনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। পত্রিকাটির যে কোন দুই একটি সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সাংবাদিকতার প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় :

সংখ্যা	বিষয়বস্তু	
	সংবাদ (সমসাময়িক)	কাহিনী
৩১ সংখ্যা ১৯শে দিজেম্বর (ডিসেম্বর) ১৮১৮	কোম্পানীর কাগজ। সপ্তাহের পঞ্জিকা। ইংগ্লণ্ডের রাজকর। চুরি। মরণ। টাকার আমদানি। কাশ্মীর দেশ। সুপ্রীম কোর্ট। পশ্চিম দেশের সমাচার : কাবোল। বাঙ্ক অব বাঙ্গাল। শ্রীযুক্ত মীরমন বর্দ্দ সাহেব। জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।	অবিবাহিত স্ত্রী বিক্রয় (বাবেল শহরের প্রথা) মূর্খ চিকিৎসক (কাহিনী)
৩২ সংখ্যা ২৬শে দিজেম্বর (ডিসেম্বর) ১৮১৮	কোম্পানীর কাগজ। সপ্তাহের পঞ্জিকা। ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে। জাহাজ আমদানী। সিংহল দ্বীপ। খুন। মরণ। রাজকর্মে নিয়োগ। হেষ্টিংস জাহাজ। যুদ্ধ সমাচার। কলিকাতার সেরিফ। সহমরণ (সহমরণ সম্পর্কিত রাম-মোহনের গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে)। জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।	প্রাচীন কথা (কাহিনীমূলক)।

আলোচ্য পর্যায়ে, সাংবাদিকতার আদর্শ নিয়ে অন্যান্য যে সমস্ত সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১), সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২), বঙ্গদূত (১৮২৯), সংবাদ-প্রভাকর (১৮৩১), বেঙ্গল স্পেকটেটর (১৮৪০) উল্লেখযোগ্য।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাময়িক সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টাও, এই ধরণের পত্রিকাগুলির মধ্যে, 'সমাচার দর্পণ'-এর পাতায় সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। এই প্রসংগে ১৮২১ থেকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান', 'শৌকীন বাবু', 'বৃদ্ধের বিবাহ', 'বৈষ্ণব ও বৈদ্যসম্বাদ' প্রভৃতি রচনা স্মরণ করতে পারি। এই সমস্ত রচনা বাংলা ছোটগল্পের আগমন-সম্ভাবনা উজ্জ্বল করেছে বলে কোন কোন গবেষক মনে করেছেন।১৬

এযুগে সংবাদপত্রের আরো একটি ধারার অস্তিত্ব ছিল। এই ধারাটি ধর্মীয় বাদানুবাদের উদ্দেশ্যে মূলতঃ গড়ে উঠেছিল। এই ধরণের পত্র-পত্রিকার মধ্যে রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) এবং ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির 'গস্‌পেল ম্যাগাজিন' (১৮১৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গ. মৌলিক রচনা

আলোচ্য পর্যায়ে মৌলিক গ্রন্থ রচনার সংখ্যা বাংলা গদ্যে খুবই সীমিত ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আনুকূল্যে যে সমস্ত মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেগুলির অধিকাংশই ছিল কাহিনীমূলক এবং ইতিহাসমূলক। এই কাহিনী এবং ইতিহাস ছিল স্বদেশীয়। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে স্বদেশ-প্রবণতার কারণও স্পষ্ট: ইংরেজ রাজপুরুষদের এ দেশীয় ভাষা ও ভাবধারার সংগে পরিচিত করাই ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পুস্তক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। উক্ত কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের (উদাহরণস্বরূপ—কেরি-র 'ইতিহাসমালা', রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র', মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজাবলি', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' প্রভৃতি) লক্ষ্য করলে বিষয়বস্তুর স্বদেশীয় চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রামরাম বসু-বিরচিত 'লিপিমালা' গ্রন্থটিতে অবশ্য শিব-সতী কাহিনী, বারাণসীর বর্ণনা,

---

১৬. (ক) দেবীপদ ভট্টাচার্য; উপন্যাসের কথা' ১ম সংস্করণ, পৃ ১৪৭।

(খ) শিশিরকুমার দাস, বাংলা ছোটগল্প, ১ম সংস্করণ, পৃ ২৩।

শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনী প্রভৃতি দেশীয় বিষয়বস্তুর পাশে স্থান পেয়েছে বাইবেলের অংশবিশেষের অনুবাদ এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদের কাহিনী। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গ্রন্থরাজির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এটা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম।

বিষয়বস্তু দেশীয় হলেও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোন কোন গ্রন্থে ইংরেজি ভাবধারা অনুসরণে আধুনিক দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়া যায়। যে জীবনীচরিত-সাহিত্য মধ্যযুগীয় বাংলায় ধর্ম এবং অলৌকিক আতিশয্যে আবিষ্ট ছিল সেই চরিত-সাহিত্য সর্বপ্রথম মানবিক হয়ে উঠল 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' গ্রন্থে। এই গ্রন্থদ্বয় রচনার ক্ষেত্রে যে আধুনিক দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়া যায় সেই দৃষ্টিভংগীর পশ্চাতে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে ইংরেজি প্রভাব সক্রিয় ছিল।

আলোচ্য পর্যায়ের একজন শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক রামমোহনের মৌলিক গ্রন্থগুলি ধর্মীয় বাদানুবাদ এবং সমাজ-সংস্কারকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল: 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮) 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ (১৮২৩) প্রভৃতি। এই সমস্ত রচনার ওপর ইংরেজি প্রভাব কতটা কার্যকরী ছিল সে বিষয় নানা কারণে অপ্রমেয়। প্রথমতঃ এই ধরণের রচনা ছিল ধর্ম-সম্পর্কিত; এবং একেশ্বরবাদ ও ঈশ্বরের নিরাকারত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর উপর খ্রীষ্টীয় জগতের প্রভাব নয়, ইসলামের প্রভাব অতিশয় ক্রিয়াশীল ছিল। দ্বিতীয়তঃ রামমোহন তাঁর রচনানিচয়ের কোথাও কোন ইংরেজি বা পাশ্চাত্য গ্রন্থ বা দর্শনের কথা উল্লেখ করেননি। রামমোহন প্রতীচ্যের দর্শন-বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ আত্মস্থ করেছিলেন এবং নবযুগের প্রথম মানুষ হিসাবে নবলব্ধ যুক্তি ও জ্ঞানের আলোকে আমাদের স্বদেশীয় পুরাতন জ্ঞানরাজি দেশবাসীর সম্মুখে উদ্ভাসিত করেছিলেন। কিন্তু, এ ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিভংগীর প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রাচ্যের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দিকেই হাত বাড়িয়েছিলেন। তিনি ধর্ম সংস্কার এবং সমাজ সংস্কারমূলক নিবন্ধে কণ্টকের সহায়তায় কণ্টক উৎপাটনে অগ্রসর হয়েছেন। আমাদের দেশের যুগসঞ্চিত কুসংস্কারের মূলচ্ছেদ করতে গিয়ে তিনি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র বচনকেই শত্রুর বিরুদ্ধে শস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করেছেন।

এই সমস্ত রচনা বিষয়বস্তুর দিক থেকে ইংরেজি প্রভাবের চিহ্ন বহন না

করলেও নতুন আলোকে সবকিছু দেখবার নব-জাগৃতিমূলভ প্রয়াস রামমোহনের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল। তার পশ্চাতে অবশ্যই ইংরেজি চিন্তা-জগৎ পরোক্ষভাবে সক্রিয় ছিল।

তাছাড়া, রামমোহনের এই ধরণের দীর্ঘায়ত প্রস্তাবমূলক প্রবন্ধ ইংরেজি 'dissertation'-এর আদর্শ অনুসরণ করেছে। তাঁর গদ্য ছিল মূলতঃ 'persuasive'[১৭]। প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে স্বমতে আনাই ছিল এই গদ্যের মূল লক্ষ্য। বিতর্ক সভার কায়দায় তিনি একের পর এক প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি প্লেটোর প্রশ্নোত্তরধর্মী রচনার রীতিও গ্রহণ করেছিলেন।

মৌলিক রচনার মাধ্যমে ভাবের সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভূমিকা বিশেষ প্রশংসনীয়। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩) এবং 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৫) সম্পূর্ণতঃ মৌলিক। ইংরেজি শিক্ষা ও ভাবধারার প্রভাবে কলকাতা বাঙালী সমাজের বিকৃতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে তিনি চিত্রিত করেছেন। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই দু'টি গ্রন্থ পরোক্ষভাবে ইংরেজি সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত।

ভবানীচরণের ইংরেজি জ্ঞান খুব কম ছিল না। বিশপ হেবার তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন—'a tall fine-looking man . speaking good English.'[১৮] সুতরাং, তাঁর পক্ষে ইংরেজি সাহিত্যের সামাজিক বস্তুতান্ত্রিকতা (Social Realism) এবং ব্যঙ্গ (Satire) এর আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ধরণের রচনায় ব্রতী হওয়া অসম্ভব নয়, যদিচ, উল্লিখিত দুটি গ্রন্থের উপর ইংরেজি সাহিত্যের কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কোন ইংগিত পাওয়া যায় না। তবে, এধরনের ব্যঙ্গ রচনা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন আদর্শের প্রবর্তন করেছিল। সে যুগে ধর্মীয় বাদানুবাদের ক্ষেত্রে রামমোহনের রচনায় সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ মিশ্রিত থাকত। কিন্তু, এ ধরনের ব্যঙ্গ ছিল ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে। আর, ভবানীচরণের উল্লিখিত রচনাদ্বয়ের ব্যঙ্গ ছিল সামাজিক এবং নৈর্ব্যক্তিক। তাছাড়া, 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থটি বাংলা উপন্যাসের পূর্বসূরী বলে অনেকেই মনে করে থাকেন, এবং বাংলা উপন্যাস ইংরেজি 'নভেল' বা 'ফিকশনে'র ধারা অনুসরণ করেই সৃষ্টি হয়েছিল।

---

১৭. Arthur Quilet Couch 'Oxford Book of English Prose' গ্রন্থের ভূমিকায় এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

১৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৪), ৫ম সংস্করণ, পৃ ১১।

তিন

প্রয়োজনের পথ-বাহিত হয়ে আলোচ্য পর্যায়ের বাংলা গদ্য সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল—এ বিষয় বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে আলোচিত হয়েছে। এই প্রয়োজন, প্রতীচ্যের জ্ঞানের বিষয় নিয়ে, বাংলা গদ্যে গড়ে তুলেছিল জ্ঞানের সাহিত্য। কিন্তু, প্রয়োজনের এই যুগে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা গদ্যে ভাবের সাহিত্য গড়ে উঠবার অনুকূল পরিবেশ পায়নি। তাই, জ্ঞানের সাহিত্য ভাবের সাহিত্যের তুলনায় এযুগে অনেকটা ব্যাপ্ত।

আলোচ্য পর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের দু'টি ধারার (জ্ঞানের সাহিত্য ও ভাবের সাহিত্য) অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় অনুবাদ / অনুসরণ, সাময়িক পত্র ও মৌলিক রচনায়।

বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণের মাধ্যমে বাংলা গদ্যে জ্ঞানের সাহিত্য বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। স্কুল পাঠ্য গ্রন্থের প্রয়োজন মেটাবার জন্য এই সমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই কারণে, এই ধরণের গ্রন্থে বিজ্ঞান ও ইতিহাস আলোচনা কোন ক্ষেত্রেই খুব গভীরে প্রবেশ করেনি। আলোচ্য যুগে রচিত বিজ্ঞান ও ইতিহাস গ্রন্থের অনুবাদের ধারা বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। আলোচ্য পর্যায়ের তুলনায় পরবর্তী দুটি পর্যায় (১৮৪৩ থেকে ১৮৭২ এবং ১৮৭২ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত) বিজ্ঞান ও ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে বিষয় বৈচিত্র্য ও গভীরতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বাংলা গদ্যের অগ্রগতির সংগে সংগে ভাষার সাহিত্যগুণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই পর্যায়ে প্রকাশিত বহু সাময়িক পত্র প্রতীচ্যের বিজ্ঞান ও ইতিহাস আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞানের সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে। আবার, কোন কোন সাময়িক পত্র ইংরেজি সাময়িক পত্রের ধারা অনুসরণে বাংলা গদ্যে 'জার্ণালিজম্' বা সাংবাদিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

জ্ঞানের সাহিত্যের অন্তর্গত মৌলিক রচনা ধর্মীয় বাদানুবাদ এবং সমাজ সংস্কারমূলক রচনার মধ্যে সীমিত ছিল। এই সমস্ত রচনা অবশ্যই ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত নয়। এই ক্ষেত্রে, ইংরেজি জগতের প্রভাব পরোক্ষভাবে কার্যকরী ছিল।

বর্তমান পর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা গদ্যে ভাবের সাহিত্য দিগন্তে জলদর্চি রেখার মতো আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু, ইংরেজি আদর্শ অনুসরণে যে দুই-একটি গ্রন্থ ভাবের সাহিত্যের সূচনা করেছিল, পরবর্তী পর্যায়ের

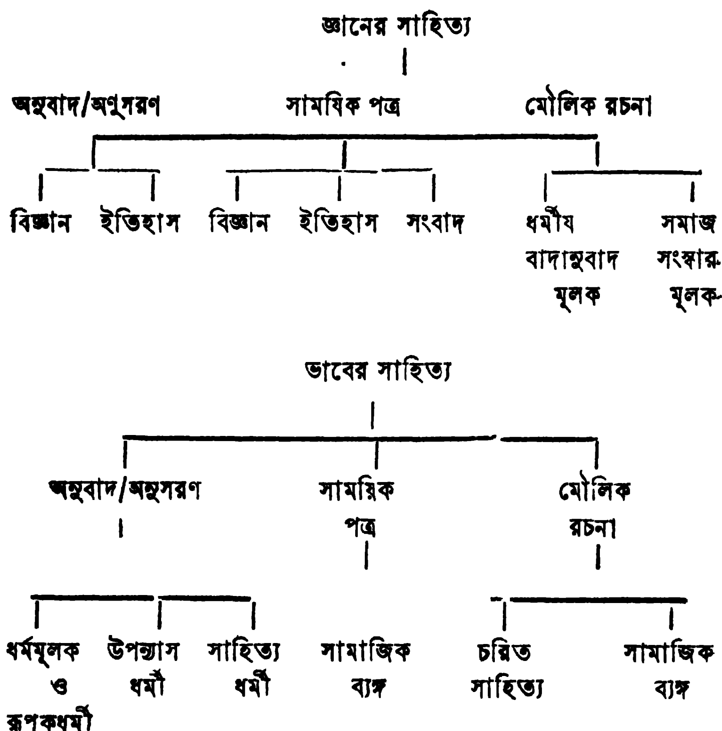
ব্যাপ্ত ও উন্নত ভাবের সাহিত্যের পথিকৃৎ হিসাবে, সেগুলোর মূল্য ছিল অপরিসীম। ইংরেজি থেকে অনূদিত দুটি গ্রন্থ—ফিলিক্স্ কেরির 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' এবং কালীকৃষ্ণ দেবের 'রাসেলাস'—বাংলা গদ্যে ভাবের সাহিত্যের বাতায়ন উন্মুক্ত করেছিল। এ দু'টি গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা গদ্যে সাহিত্যধর্মী কাহিনী রচনার সূত্রপাত ঘটে। 'লর্ড চেষ্টারফীল্ডের উপদেশ' শীর্ষক অনুবাদ-গ্রন্থ বাংলায় পত্র-সাহিত্যের আদর্শের সূচনা করেছিল। পরবর্তী কালে বাংলা গদ্যে উৎকৃষ্ট পত্র-রচনার পরিচয় পাওয়া যায় দেবেন্দ্রনাথ[১৯] এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে।

এ্যাডিসন-ষ্টীলের ধারা অনুসরণে বাংলা সাময়িক পত্রে ব্যঙ্গাত্মক রচনার ধারা গড়ে উঠেছিল। মিশনারিদের পরিচালিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার পাতায় এই ধরনের রচনা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[২০] এই রচনাগুলি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিরচিত বলে অনেকেই মনে করেছেন।[২১] ভবানীচরণ ইংরেজি ভালোই জানতেন।[২২] কিন্তু, এ্যাডিসন-ষ্টীলের রচনার সংগে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে, এ্যাডিসন-ষ্টীলের রচনা যে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কাছে সবিশেষ প্রিয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া, উল্লিখিত সাময়িক পত্রের পরিচালকমণ্ডলী ছিলেন মিশনারিগণ। তাঁদের কাছে ভবানীচরণ এই ধরনের রচনার উৎসাহ পেয়ে থাকতে পারেন।

যে সমস্ত মৌলিক গ্রন্থ ইংরেজি সাহিত্যের অনুসরণে রচিত হয়েছিল সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে কোন ইংরেজি গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের আদর্শ অনুসরণ না করলেও পরোক্ষভাবে ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আধুনিক আদর্শে উজ্জীবিত জীবনী সাহিত্য এবং সামাজিক ব্যঙ্গ রচনার ধারা সৃষ্টি করেছিল। জীবনী সাহিত্য হিসাবে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' মানবিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইংরেজি গ্রন্থের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বিরচিত সত্য ইতিহাস সার[২৩] (প্লুটার্ক-এর 'লাইভ্‌স্' গ্রন্থের আদর্শে পরিকল্পিত—১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) গ্রন্থটি এই প্রসংগে স্মরণীয়।

১৯. পরোক্ত, ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
২০. বর্তমান অধ্যায়, পৃ ৩১।
২১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৪), ৫ম সংস্করণ, পৃ ২৩।
২২. বর্তমান অধ্যায়, পৃ ৩৬।
২৩. দেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা চরিত সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, পৃ ১০২।

আলোচ্য পর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত জ্ঞানের সাহিত্য ও ভাবের সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা নিম্নলিখিত ছকে উদ্ধৃত করছি :



আলোচ্য পর্যায়ে সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুবাদ/অনুসরণমূলক গ্রন্থের মধ্যেই সর্বাধিক দৃষ্ট হয়। বিষয়বস্তু এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি সাহিত্য থেকে গৃহীত। সাময়িক পত্রে যেখানে জ্ঞানের বিষয়ের প্রাধান্য সেখানে ইংরেজি প্রভাব প্রত্যক্ষ। কিন্তু, সাময়িক পত্রে সংবাদ এবং সামাজিক ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু স্বদেশীয় হলেও পরিবেশন রীতির ক্ষেত্রে ইংরেজি সাময়িক পত্রের আদর্শ কার্যকরী থেকেছে। মৌলিক রচনায় বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ইংরেজি প্রভাব আলোচ্য পর্যায়ে বিশেষ স্পষ্ট না হলেও পরিবেশন রীতির ক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বিষয়বস্তু অনুসরণ করে আলোচ্য পর্যায়ের বাংলা গদ্য সাহিত্যকে জ্ঞানের ও ভাবের সাহিত্য হিসাবে দু'টি ধারায় বিভক্ত করলেও ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য

গুণের অভাব উভয় ধারাতেই সমপরিমাণ দৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ, জ্ঞানের সাহিত্যের নমুনা হিসাবে পাদ্রি ইয়েট্সবিরচিত 'পদার্থবিদ্যাসার' (১৮২৫) গ্রন্থটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

গুরু। নক্ষত্রের মধ্যে কোন কোন নক্ষত্র প্রায় সূর্যের ন্যায় বৃহৎ আছে। অনুমান হয় গ্রহসকল যেমন সূর্যের চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিয়া থাকিয়া উত্তাপ ও আলোক পায় তদ্রূপ কতক কতক গ্রহেরাও কোন কোন নক্ষত্রের চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত হইয়া সেই নক্ষত্র হইতে আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। ভাল মহাশয়, কোন কোন নক্ষত্র এতাদৃশ বৃহৎ যদি থাকে, তবে তাহাদিগকে আমরা কেন এমত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখি।[২৪]

ভাবের সাহিত্যের উদাহরণ হিসাবে 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' গ্রন্থটি থেকে পূর্বে উদ্ধৃত[২৫] অংশটি লক্ষ্য করতে পারি।

উভয় ক্ষেত্রেই, ভাষা সরল ও সাবলীল হলেও—'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ'-এর ভাষা কিছুটা অনুবাদ-গন্ধী—সাহিত্য গুণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এই অভাব অস্বাভাবিক নয়। বাংলা গদ্যের লিখিত রূপ তখন কেবলমাত্র গড়ে উঠছে। বাক্যগঠন রীতির পরীক্ষা নিরীক্ষা যখন প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে তখন সাহিত্য গুণ সমন্বিত গদ্যের আবির্ভাব সম্ভব নয়।

বাংলা গদ্য, এই পর্যায়ে, সাহিত্যের যথার্থ মাধ্যম হয়ে উঠবার জন্য ভাষাগত দিক থেকে ইংরেজি সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গির প্রভাব কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে বরণ করে নিয়েছিল তার পরিচয় গ্রহণ করব পরবর্তী অধ্যায়ে।

২৪. উইলিয়ম ইয়েট্স্, পদার্থবিদ্যাসার, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ, পৃ ৪।
২৫. বর্তমান অধ্যায়, পৃ ২০।

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষারীতি (১৮০০—১৮৪৩)

গদ্যশিল্পী কেরি, মৃত্যুঞ্জয়, রামরাম, তারিণীচরণ, ফিলিক্স্ কেরি, পাদ্রি, ইয়েট্স্, ভবানীচরণ, রামমোহন এবং অন্যান্য

এক

আলোচ্য পর্যায়ে বাংলা গদ্যে ভাষারীতির ক্ষেত্রে বাংলা নিজস্ব কথ্য ভাষার রীতি ছাড়া আরো দুটি ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারা ইংরেজি বাক্যগঠন রীতি এবং অপর ধারাটি সংস্কৃত বাক্যগঠন রীতি অনুসরণ করেছে। এই ত্রিধারা ক্রমশঃ মিশ্রিত হয়ে পরবর্তীকালে বলিষ্ঠ এবং আধুনিক বাংলা গদ্যের সৃষ্টি করেছে। এই মিশ্রণের চূড়ান্ত রূপ উনবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্য করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। সুতরাং, গদ্যের গঠন কার্যে উল্লিখিত তিনটি ধারার কোনটিরই মূল্য স্বল্প নয়। কিন্তু, বর্তমান গ্রন্থের বিষয়ের সংগে সংগতি রক্ষা করে বাংলা গদ্যে ইংরেজি ভাষারীতির প্রভাবই অনুসন্ধান করব।

বাংলা গদ্যের লিখিত রূপ যখন সবেমাত্র গড়ে উঠছে তখন সমৃদ্ধশালী ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন ধরণের বাক্য বিন্যাসের সংগে পরিচিত ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী গদ্যকারদের রচনায় ইংরেজি ভাষারীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আর, ইংরেজি মিশনারিগণও বাংলা গদ্যে লেখনী সঞ্চালন করতে গিয়ে স্বভাবতঃই নিজেদের মাতৃভাষার আদর্শ দ্বারা অনেকাংশে পরিচালিত হয়েছিলেন।

ইংরেজি ভাষারীতির প্রভাবের ক্ষেত্রে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত গ্রন্থগুলি সর্বাধিক সক্রিয় ছিল। অনুবাদকের ওপর মূল গ্রন্থের ভাষা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মূল গ্রন্থের ভাব ও রস অনুবাদে যথাযথভাবে পরিস্ফুট করে তোলাই উত্তম অনুবাদকের অভিপ্রেত। সুতরাং, মূলের ভাবসমূহের নিষ্ঠাপূর্ণ ভাষান্তরের জন্য অনুবাদক সমান্তরাল প্রকাশভঙ্গির অন্বেষণে সচেষ্ট থাকেন।

কিন্তু, যে ভাষায় অনুবাদ করা হয় সে ভাষা যদি মূলের ভাষার তুলনায় দুর্বল হয় তবে, অনেক ক্ষেত্রেই, সমান্তরাল প্রকাশভঙ্গির অভাবে অনুবাদক মূলের

ভাষারীতির দাসত্ব করে থাকেন। অনুবাদ এই ক্ষেত্রে ভাষাগত (literal) কিন্তু স্বচ্ছন্দ (free) নয়। ভাষাগত অনুবাদ মূল গ্রন্থের ভাব প্রকাশ করে ; কিন্তু, স্বচ্ছন্দ অনুবাদের মাধ্যমে মূল গ্রন্থের ভাব অপর ভাষার কলেবরে নতুন চেহারা নিয়ে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। এবং,এই ক্ষেত্রে ভাষাগত নয়, ভাবগত চেহারাই অনুবাদের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু আলোচ্য পর্যায়ে বাংলা গদ্য যখন সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের উপযুক্ততা অর্জন করেনি এবং প্রকাশভঙ্গির কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ভাষার ক্ষেত্রে নব নব আদর্শ অনুসরণে বাংলা গদ্য যখন স্বাভাবিক ভাবেই সচেষ্ট থেকেছে তখন অনুবাদ হয়ে উঠেছে ভাষাগত। আর, ভাষাগত অনুবাদের ক্ষেত্রে সমান্তরাল প্রকাশভঙ্গির অন্বেষণে বাংলা গদ্য যখন ব্যর্থকাম হয়েছে তখনই মূল ইংরেজি গ্রন্থের ভাষারীতির অন্ধ অনুসরণে অগ্রসর হয়েছে।

এই পর্যায়ের 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ', 'দি ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' প্রভৃতি অনুবাদ গ্রন্থ উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যেই বাংলা গদ্যে নানা ধরণের ইংরেজি ভাষারীতি প্রয়োগ করেছিল। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে এই ধরণের নানা উদাহরণ উদ্ধৃত করব।

বাংলা অনুবাদ গ্রন্থে ইংরেজি ভাষারীতির প্রভাব বিশেষ প্রকট হলেও মৌলিক রচনায় যে ইংরেজি ভাষারীতির প্রভাব নেই এমন নয়। তবে, অনুবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি আদর্শ প্রত্যক্ষ থাকার দরুন অনুবাদকেরা ইংরেজি ভাষারীতির দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়েছিলেন।

প্রসংগক্রমে স্মরণীয়, আলফ্রেড-এর যুগে নবজাত লিখিত ইংরেজি গদ্য বিভিন্ন লাটিন গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমেই আত্ম-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ রাজা আলফ্রেড কর্তৃক গ্রেগরী দি গ্রেট-এর লাটিন ভাষায় লিখিত 'Curia pastoralis' গ্রন্থটির অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষেত্রেও দুর্বল ইংরেজি ভাষা উন্নত লাটিন ভাষার রীতি অনুসরণ করেছিল। শুধু সেদিন নয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে মিলটন্ এবং ব্রাউন-এর গদ্য রচনা পর্যন্ত লাটিনের ভাষারীতি অনুসরণ করে চলেছিল ; তাই, ইংরেজি গদ্যে লাটিন প্রভাবের পরিমাণ কম নয়। আর, এই প্রভাবের সূত্রপাত হয়েছিল বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থের মাধ্যমে।

যাই হোক, বাংলা গদ্যের লিখিত রূপের প্রতিষ্ঠায় ও অগ্রগতিতে ইংরেজি বাক্যবিন্যাস ও পদবিন্যাসের প্রভাব সবিশেষ কার্যকরী ছিল। ইংরেজি শব্দচয়ন এবং বিভিন্ন ইংরেজি 'টার্ম'-এর পরিভাষা সৃষ্টিতেও, বাংলা গদ্য বিশেষ তৎপর

ছিল। এই প্রসংগে এই অধ্যায়ের পরবর্তী দুটি অংশে যথাক্রমে, বাক্যবিন্যাস/পদবিন্যাস এবং শব্দ চয়ন / পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা উদাহরণের মাধ্যমে লক্ষ্য করব।

দুই

ক. বর্তমানকালে 'হওযা' ক্রিযাব ব্যবহার:

এ ধরণের ব্যবহার বাংলা বাক্যের নিজস্ব গঠন রীতির বিবোধী। বাংলা লিখিত গদ্যেব রূপ অন্বেষণে, আলোচ্য পর্যাযে, মিশনারিগণ এবং ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী গদ্যকারগণ ইংবেজি বীতির প্রভাবে অনেক সময 'copula'-র ব্যবহার করেছেন।[১] অনুবাদেব ক্ষেত্রে এই ব্যবহার অধিক হলেও মৌলিক বচনাতেও এই ধবণের ব্যবহার দেখা যায। শ্রীবামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'বাইবেল'-এর বিভিন্ন অংশের বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায। পরে, রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয বিদ্যালঙ্কার, পাদরি ইযেট্‌স্ প্রভৃতির বচনায এই জাতীয ব্যবহার দেখা গেলেও আলোচ্য পর্যাযের শেষ দিকেই এই ধরণের ব্যবহার খুব বিরল হযে উঠেছিল। বিভিন্ন বাংলা বাক্যে 'copula'-র ব্যবহার সম্বন্ধে কযেকটি দৃষ্টান্ত উৎকলিত করছি:

[১] পষ্ট (স্পষ্ট) রূপে প্রকাশ করিবার শিল্পবিদ্যা 'হয' ব্যাকরণ।

(গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, ইংরেজি ব্যাকরণ, ১ম সংস্করণ, পৃ ৩)

[২] তাহারা 'হয়' এনন সকল ক্রিযা ··।

(তদেব, পৃ ৫৭)

[৩] নক্ষত্রের মধ্যে কোন কেন নক্ষত্র প্রায সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ 'আছে'।

(উইলিযম ইয়েট্‌স্, পদার্থবিদ্যাসার, ২য সংস্করণ, পৃ ২৪)

[৪] পৃথিবী হইতে সূর্য্য কতদূরে 'থাকে' ?

(তদেব, পৃ ৬)

[৫] ক্রিয়াত্মক বিশেষণ দুই প্রকার 'হয়'···।

(রামমোহন গ্রন্থাবলী—৭, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ ৩২)

---

১. Though infrequent, the use of the verb copula can be traced in the writing of this period'. This is another effect of the influence of the English sentence—structure.

Das, Sisir Kumar, Early Bengali Prose, first edition.' p 53.

[৬] ইহা স্বরন্ত প্রকরণীয় 'হয়'।

(তদেব, পৃ ৬)

[৭] অক্ষর দুই প্রকার 'হয়'।

(তদেব)

[৮] ঐ সকল বচন সর্বথাই মনুস্মৃতির বিপরীত 'হয়'।

(রামমোহন গ্রন্থাবলী—৩—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ ৬)

[৯] যে পুরুষের চরণ পদ্মাঙ্কিত 'হয়' সে অবশ্য মহারাজ 'হয়'।

(মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বত্রিশ সিংহাসন, ১ম সংস্করণ, পৃ ১)

[১০] আর্ত্তের বাঞ্ছাপূরণ অবশ্য কর্ত্তব্য 'হয়'।

(তদেব, পৃ ৪৩)

খ সাধারণ ক্রিয়াপদের ব্যবহার :

অনেক সাহিত্যের ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন :

A verb is an almost inevitable factor in the syntax of the English language and there is scarcely any sentence in English without a verb. It was Raja Rammohan Ray who first felt that a sentence without verb becomes somewhat weak and halting and should not be tolerated in decent literature.২

কিন্তু, রামমোহন বাংলা গদ্যে ক্রিয়াপদের ব্যবহারের দিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি দিয়েছেন এমন মনে করবার হেতু নেই। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের প্রথম বাংলা রচনা প্রকাশিত হবার পূর্বে মৃত্যুঞ্জয়, কেরি, রামরাম প্রভৃতির রচনায় ক্রিয়াপদের যথার্থ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের স্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে ইংরেজি বাক্য এবং বাংলা বাক্যের রচনা রীতির মধ্যে গুরুতর পার্থক্য রয়েছে। বাংলা বাক্যের গঠনে প্রথমে থাকে কর্তা, তারপর কর্ম এবং সর্বশেষে ক্রিয়াপদ। কিন্তু, ইংরেজি বাক্যে প্রথমে কর্তা, তারপর ক্রিয়াপদ এবং সর্বশেষে থাকে কর্ম।৩ সংস্কৃত বাক্যের গঠনে এই ধরণের কোন বাঁধাবাঁধি নেই, পদসজ্জার ক্ষেত্রে শ্রুতিমাধুর্যই সেখানে

২. Sen, D C., Bengali Prose Style. first edition, p 45.

৩. Das, Sisir Kumar, Early Bengali Prose, first edition P 35.

পথনির্দেশ করে থাকে। আলোচ্য পর্যায়ের প্রথম দিকে ইংরেজি বাক্যরীতির প্রভাবে অনেক সময় কর্তা ও কর্মের মাঝখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাংলা বাক্যে লক্ষ্য করা যায় :

কর্তা + ক্রিয়া + কর্ম—

[১] এই কথার দৃষ্টান্ত স্থল 'হইয়াছে' সিমিরামিস রাণী।
(পীয়ার্সন, প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়, ১ম সংস্করণ, পৃ ৬৭)

[২] এবং সে যোহনের 'ছিল' উটের লোমের পরিচ্ছেদ।
(উইলিয়ায কেরি, মঙ্গল সমাচার মাত্তিউর)

এই ধরণের আরো কিছু উদাহরণ ডঃ শিশিরকুমার দাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়।৪ ইংরেজি রীতি অনুসরণে ক্রিয়াপদকে বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করার রীতি বাংলা ভাষায় আজও বিদ্যমান।

গ. সংযোজক অব্যয় 'এবং / ও' প্রভৃতির ব্যবহার :

সংযোজক অব্যয় হিসাবে 'এবং/ও' শব্দের ব্যবহার সংস্কৃতে এবং বাংলায় ছিল। কিন্তু, ইংরেজি বাক্য গঠন রীতি অনুসরণ করে বাংলায় 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরু করতে দেখা যায়। ডঃ সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে এই ধরণের কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন৫। তাছাড়া, বাংলা বাক্যরীতির অনুসরণে যেখানে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (Participle) ব্যবহার করা উচিত সেখানে ইংরেজি রীতির অনুসরণে অনেক সময় 'এবং' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।৬ ইংরেজি অলংকার 'পলিসিণ্ডেটন'-এর অনুসরণ করার প্রচেষ্টাও অনেক বাংলা বাক্যে দেখা যায়। বিভিন্ন বাংলা গদ্যকারের অনুবাদমূলক এবং মৌলিক রচনায় এই তিন ধরণের ব্যবহার বহুল পরিমাণে রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ এখানে উৎকলিত করছি :

'এবং' দিয়ে বাক্য শুরু—

[১] …। এবং যেমন কোন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে…
(মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বেদান্তচন্দ্রিকা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১ম সংস্করণ, পৃ ২৬)

৪. Ibid.

৫. সুকুমার সেন, বাঙালা সাহিত্যে গদ্য, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ১৫৪।

৬. Dar, Sisir Kumar, Early Bengali Prose, first edition, p. 52.

[২] …। এবং নানাবিধ চিত্র পটার্পিত চিত্তপুত্তলিকাদের…

(তদেব)

[৩] ··। ও স্বমাত্রপ্রাধান্য বিবক্ষতা ব্রহ্মাবিষ্ণু··

(তদেব, পৃ ১২)

[৪] । এবং ভগবান মনু সকাম ও নিষ্কামের বিবরণ…

(রামমোহন গ্রন্থাবলী—৩—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ ৮)

[৫] ··। এবং স্মার্ত ভট্টাচার্য্য অঙ্গিরার এই বাক্য

(তদেব, পৃ ২৭)

[৬] …। এবং এই তিন স্থানে ইহা প্রাপ্ত হইযাছে যে ·

(তদেব, পৃ ৪৫)

[৭] …। এবং তাহাদের দ্বারা অন্ধকার নষ্ট হইতেছে…

(উইলিযম ইযেট্‌স্, পদার্থবিদ্যাসার, ১৮৩৪ সংস্করণ, পৃ ৫)।

ইংরেজিতে 'and' দিযে বাক্য শুরু করার প্রবণতা সবচেযে বেশী দেখা যায বাইবেল এবং বিশেষতঃ 'দি নিউ টেস্টামেণ্ট' অংশে। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোডায বাইবেল এর বিভিন্ন অংশের বাংলায় অনুবাদ করা হযেছিল এবং এই সূত্র ধরে 'এবং' দিয়ে বাক্যরচনার প্রবণতা বাংলা গদ্যে দৃষ্ট হয।

প্রসংগক্রমে স্মরণীয়, বানিযন-এর 'দি পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস' গ্রন্থটিতে 'and' দিয়ে বাক্যরচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থটিও বাংলায়, আলোচ্য পর্যাযে, অনুবাদ করা হযেছিল।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণের পরিবর্তে 'এবং / ও' ব্যবহার ঃ

[১] ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন 'এবং' কহিলেন

(মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বত্রিশ সিংহাসন, ১ম সংস্করণ, পৃ ১৮)

[২] রাজার হস্ত ধরিলেন 'ও' কহিলেন

(তদেব, পৃ ৩৭)

[৩] বিস্মিত হইলেন 'এবং' মনে মনে বিচার করিলেন

(তদেব, পৃ ১৫)

[৪] অনায়াসে সম্মত হইল 'আর' একত্র চলিল

(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দি ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট, পৃ ২৭)

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে প্রথম বাক্যটি বাংলা রীতি অনুসরণ করে ক্রিয়া-বিশেষণের ব্যবহার করলে 'এবং' শব্দটি উঠে গিয়ে চেহারা হত—ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন।

ইংরেজি 'পলিসিণ্ডেটন' এর অনুসরণে 'এবং/ও' :

[১] '…'এবং' প্রজারদের অসন্তোষাবস্থায়, 'এবং' দীনহীনাবস্থায়, 'এবং' পাত্রমিত্রগণের গরিমাবস্থায়, 'এবং' কলহকরণাবস্থায় সিংহাসন পাইলেন।

(ফিলিক্স্ কেরি, ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়, ১ম সংস্করণ, পৃ ৮৪)

[২] মিসরের পূর্বদিকে সুফ সাগর 'ও' দক্ষিণে কাফরী দেশ, 'এবং' পশ্চিমে লিবিয়া রাজ্য 'আর' উত্তরাঞ্চলে মধ্যস্থ সমুদ্র। তাহা দীর্ঘে ৩০০ ক্রোশ, 'ও' প্রস্থে ৪৫ ক্রোশ ; 'এবং' তাহার মধ্যে নীল নামে নদী বহিয়া ঐ দেশকে সেচন 'ও' সফল করে।

(পীয়ার্সন, প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়, ১ম সংস্করণ, পৃ ৩)

(৩) '…শ্রী বিক্রমাদিত্য নানাপ্রকার স্তব 'ও' প্রণাম 'ও' প্রদক্ষিণ করিয়া…।

(মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বত্রিশ সিংহাসন, ১ম সংস্করণ, পৃ ৮৪)

'এবং' শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার যথাযথ ইংরেজি অলংকার শাস্ত্রসম্মত হয়ে উঠেছিল, তৃতীয় পর্যায়ে, ভূদেব, বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনায়[৭]। বাংলা গদ্যের সাহিত্যগুণ বৃদ্ধি করেছিল, এ জাতীয় প্রয়োগ।

ঘ. খণ্ডবাক্যের সজ্জা :

ইংরেজি ভাষায় মোটামুটি চার রকমের সজ্জা দেখা যায় খণ্ড বাক্যের ক্ষেত্রে। এই প্রসংগে একটি 'Noun clause অবলম্বন করে ইংরেজি 'Subordinate clause'-এর চার রকমের সজ্জার উদাহরণ দিচ্ছি :

1. As the Subject :

That his pupil was a clever boy
/ was admitted by the teacher.

2. As the Object :

The teacher admitted
/ that his pupil was a clever boy.

৭. বর্তমান গ্রন্থের ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

3. Predicatively :
The teacher's admission was
/ that his pupil was a clever boy.
4, In Apposition to Noun or Pronoun :
The teacher's admission
/ that his pupil was a clever boy (was true).
The teacher admitted this
/ that his pupil was a clever boy.'[৮]

বাংলা গদ্যের লিখিত রূপ যখন গড়ে উঠছে তখন খণ্ডবাক্যের সজ্জার ক্ষেত্রে ইংরেজি আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রভাবের প্রশ্নই ওঠে না ; কারণ, সংস্কৃতে খণ্ড বাক্যসজ্জার রীতি নেই ! বাংলা গদ্য, ইংরেজি খণ্ড বাক্যসজ্জার রীতি অনুসরণ করে, প্রকাশ রীতির ক্ষেত্রে, ক্রমশঃ শৃঙ্খলা লাভ করেছিল।

যাই হোক, আলোচ্য পর্যায়ে, বাংলা খণ্ড বাক্যসজ্জার রীতি মূলতঃ উল্লিখিত প্রথম দু'টি রীতি (1 এবং 2) অনুসরণ করেছে।

উদাহরণস্বরূপ :

মূল বাক্যাংশ .	+	অধীন খণ্ড বাক্য
ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন	+	যে সকল মনুষ্যেরা সপ্তাহের এক দিবস সাংসারিক কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিবে। (দিগদর্শন, জুন, ১৮১৮, পৃ ১১)
ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়	+	যে এখন তুমি এ বিষয়ে বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে।
(রামমোহন গ্রন্থাবলী, ৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ ১২)		
আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি	+	যে তোমরা সহমরণ ও অনুমরণ…অন্যথা করিতে প্রয়াস করিতেছ।
(তদেব, পৃ ৩)		

৮. Ray, Basanta Kumar, New Model Grammar (Based on the recommendations of the Committees or Grammatical terminology of England and America), ch. XXXV, first edition p 172.

অধীন খণ্ড বাক্য	+	মূল বাক্যাংশ
শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য যার মহত্ত্ব থাকে	+	সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে।

(মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বত্রিশ সিংহাসন, পৃ ২৯)

নানা আপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন যে ঈশ্বর	+	তাঁহার ধন্যবাদ যেন করি।

(পীয়ার্সন, প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়, ১ম সংস্করণ, পৃ ৬৭)

ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি	+	তিনি উপাস্য হন।

(রামমোহন গ্রন্থাবলী—৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ ৬৭)

বাংলা গদ্যে 'parenthetic clause'-এর ব্যবহার আলোচ্য পর্যায়ে দেখা যায়। এই ধরণের ব্যবহারও ইংরেজি রীতি অনুসরণে ঘটেছে :

মূল বাক্য		Parenthetic Clause		মূল বাক্য
পাখিরা,	+	তাহার এ সংবাদ অপ্রত্যয় করিয়া, কিম্বা তাহার পরামর্শে অবহেলা করিয়া	+	এ বিষয়ে আপনারা কিছু পরিশ্রম করিলেক না।

(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট', পৃ ৮২)

কান্তার রূপ এই জগতে ভ্রমণ করত	+	এক গুহা ছিল এমত এক স্থানে উপস্থিত হইয়া শয়ন করত	+	(আমি) নিদ্রায় পড়িলাম।

(ফিলিক্স্ কেরি, যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ, ১ম ভাগ, ১ম সংস্করণ, পৃ ৯)

৬. সাপেক্ষ বা সমুচ্চয়ী সর্বনাম

(Relative/Conjunctional Pronoun) :

ইংরেজি বাক্য গঠন রীতি অনুসরণ করে সাপেক্ষ বা সমুচ্চয়ী সর্বনামের ব্যবহার, আলোচ্য পর্যায়ে, বাংলা গদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। ইংরেজি বাক্যে সাপেক্ষ সর্বনাম সাধারণতঃ একটি অধীন খণ্ডবাক্য (**Subordinate**

Clause) উপস্থিত করে (Relative Pronoun introduces either a subordinate or a co-ordinate clause) ৯। বাংলা গদ্য থেকে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি :

[১] পরে গত রাজা / যে অনেক প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে রাজ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন··· ।
(ফিলিক্স্ কেরি, ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়, ১ম সংস্করণ, পৃ ৮৪)

[২] এক গাধা / যে এক ছোট কুকুরের সহিত এক বাটীতে থাকিত··· ।
(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট, ১ম সংস্করণ, পৃ ১৬)

[৩] এক দুর্ব্বল বৃদ্ধ / যে আপন সান্নিধ্যের বনে····
(তদেব, পৃ ২৬)

চ. নিত্য বা পরস্পর সম্বন্ধী অব্যয়

(Correlatives) :

এই ধরণের অব্যয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলা গদ্যে ইংরেজি রীতি অনুসৃত হয়েছে। সংস্কৃতে 'যাবৎ'-এর পর 'তাবৎ' ব্যবহৃত হয়—(যাবৎ জীবনং তাবৎ মরণং—শঙ্করাচার্য) ; কিন্তু, ইংরেজি রীতি অনুসরণ করে বাংলা গদ্যে 'তাবৎ' এর পর 'যাবৎ' এবং 'তাহারা'-র পর 'যাহারা' ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। 'Netther···nor'-এর অনুসরণে বাংলা গদ্যে 'না' ব্যবহার করা হয়েছে।

'তাহারা' হয় এমন সকল ক্রিয়া যে (যাহারা) অন্য ক্রিয়া সকলের অগ্রে থাকিয়া······।

(গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, ইংরাজী ব্যাকরণ, ১ম সংস্করণ, পৃ ৫৭)।

'Neither···nor-এর প্রভাবে যে সমস্ত বাক্য বাংলা গদ্যে রচিত হয়েছে তার দুই একটি নমুনা দিচ্ছি :

সেখানে 'না' পথিকবাস ছিল যে তাহাতে উত্তরে এবং 'না' কোন মনুষ্য ছিল যে··· ।

(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দি ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট, পৃ ৩২)।

---

৯. Ray, Basanta Kumar, New Model Grammar (Based on the recommendations of the Committees on Grammatical Terminology of England and America). First edition, p 55.

'না' আপন ভক্ষ্যকে নারিতে সমর্থ হইল 'না' আপন পা ছড়াইবার……।
(তদেব)

ডঃ শিশির কুমার দাসও এই বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান উদাহরণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।১০

ছ. ইংরেজি প্রকাশভঙ্গির অনুসরণ :

গাড়ি তৈয়ার করুক (উইলিয়ম কেরি, কথোপকথন, ১৮১৮ সংস্করণ, পৃ ৫)

—বাংলার সাধারণ রীতি : গাড়ি নিয়ে এস অথবা, গাড়ি ডেকে আন। কিন্তু উল্লিখিত উদাহরণে ইংরেজি 'Get the carriage ready'-র প্রভাব রয়েছে।

ভাল মহাশয় (উইলিয়ম ইয়েট্‌স্‌, পদার্থবিদ্যাসার, ১৮৩৪ সংস্করণ, পৃ ৩—৭ এর মধ্যে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে)।

— ইংরেজি well gentleman বা, Sir—এর প্রভাব রয়েছে।

আইস পোলা (কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, তাজেল—১)—Come, my son এর প্রভাব।

অতিশয় অনিয়ম (গোবিন্দচন্দ্র সেন, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম সংস্করণ, পৃ ১৯)।

… ইংরেজি much irregularities-এর প্রভাব।

নিদ্রায় পড়িলাম (ফিলিক্‌স্‌ কেরি, যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ, ১ম ভাগ, ১ম সংস্করণ, পৃ ৯)

— fell asleep-এর প্রভাব। বাংলায় আমরা বলি—নিদ্রিত হলাম/নিদ্রা গেলাম ইত্যাদি।

খেঁকশিয়ালী…নিরানন্দ দৃষ্ট হইল।

(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট, ১ম সংস্করণ, পৃ ১০)

— ইংরেজি 'true passive'-এর ব্যবহার। এই ধরণের উদাহরণ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন—আমি দৃষ্ট হই।১১

১০. Das, Sisir Kumar, Early Bengali prose, first edition, p 150.

১১. Chatterji, Suniti Kumar, O. D. B. L, Vol II, 1926 editioa, p 921.

জ. যতিচিহ্নাদির ব্যবহার :

দুরান্বয় দোষ থেকে মুক্তি তথা ভাষার সহজবোধ্যতার জন্ত যতিচিহ্নাদির যথাযথ প্রয়োগ প্রয়োজনীয়। সংস্কৃতে এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় এক দাঁড়ি এবং দুই দাঁড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নাদির ব্যবহার ইংরেজি রীতির অনুসরণে আলোচ্য পর্যায় থেকে শুরু হয় এবং উনিশ শতকের প্রথম চার দশকের মধ্যে নানা ধরণের যতিচিহ্ন ব্যবহারের পরিচয় বাংলা গদ্যে পাওয়া যায়। ইংরেজির প্রত্যক্ষ প্রভাব যে এ ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত রচনাবলীতে। মৌলিক গ্রন্থের তুলনায়, আলোচ্য পর্যায়ে, অনুবাদ গ্রন্থের যতিচিহ্নাদি ছিল অনেকটা নিয়মিত।

এই পর্যায়ে, বিভিন্ন সময় রচিত বাংলা অনুবাদ ও মৌলিক রচনায় যতিচিহ্নাদির ব্যবহার প্রসংগে কতিপয় উদাহরণ লক্ষ্য করতে পারি :

অনুবাদ :

ছক (ক)

বাক্য	ইংরেজি অংশ	বাংলা অনুবাদ
প্রথম	That's true	তা তো বটে।
দ্বিতীয়	What is there wonderful in that ?	এ কোন আশ্চর্য্য।
তৃতীয়	If it please God he can by a nod change dust into mountain, or reduce a mountain into dust	দেবতা করিলে এক ইঙ্গিতে ধূলাকে পর্ব্বত করিতে পারেন ও পর্ব্বতকে ধূলা।

— উইলিয়ম কেরি, কথোপকথন (Dialogues Intended to facilitate the acquiring of Bengali Language), ১৮১৮ সংস্করণ, পৃ ৩৬—৩৭।

ছক (খ):

বাক্যের অংশ	ইংরেজি বাক্য	বাংলা অনুবাদ
প্রথম	Gold has several remarkable properties ;	অন্য ধাতু হইতে স্বর্ণের স্বতন্ত্র গুণ আছে ;
দ্বিতীয়	it is the heaviest of all metals,	সকল ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ ভারী,
তৃতীয়	being half as heavy as lead,	সীসার পরিমাণ হইতে তাহার পরিমাণ দেড়গুণ অধিক,
চতুর্থ	and nineteen or twenty times heavier than a quantity of water equal to its bulk.	এবং সমান পরিমিত জলের সহিত স্বর্ণ তৌল করিলে জল হইতে স্বর্ণ বিশ গুণ ভারী হয়।

(দিগ্‌দর্শন, নভেম্বর, ১৮১৮, পৃ ৩২৪-৩২৫)

ছক (গ):

ইংরেজি বাক্য	বাংলা অনুবাদ
Here is the brush,	তুলী পাইয়াছি,
where is the paint ?	রঙ্গ কোথা ?
There are many clouds,	বড় মেঘ হইয়াছে,
it is likely there will be rain.	অনুমান করি বৃষ্টি হইবে.
Where shall I put the bundle ?	ঐ পুঁটুলিটা কোথায় রাখিব ?
The box is very heavy,	ঐ সিন্দুকটা বড় ভারি,
how can I carry it ?	কেমন করিয়া লইয়া যাইব ?
No one in the world can	ইহকালে কেহ ষোল আনা
be perfectly happy.	সুখী হইতে পারে না.
Take as much as you	আমার যথেষ্ট আছে,
please, I have abundance.	তোমার যত খুশী লও.

(পীয়ার্সন, বাক্যাবলী, পৃ ১০, ১৪, ৬৭)

মৌলিক রচনা :

উদাহরণ (ক) :

বিন্ধ্য নামে এক পর্ব্বত ছিলেন তিনি অগস্ত্য মুনির প্রসাদাৎ অতি বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছিলেন তাহার বৃদ্ধির কথা বিশেষ কি কহি উর্দ্ধে একশত যোজন প্রস্থে পঞ্চাশৎ যোজন এতাদৃশ শরীর চন্দ্রসূর্য্য যে পথেতে সর্ব্বদা গমনাগমন করেন সেই পথ নিজ শৃঙ্গের দ্বারা রুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার সহিত দেবতারা যুদ্ধাদি করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না।

(উইলিয়ম কেরি, ইতিহাসমালা, ১ম সংস্করণ, পৃ ২১৬-২১৭)

উদাহরণ (খ) :

উত্তর বেদার্থ নির্ণয় কর্ত্তা মুনিগণের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে এ নিমিত্ত যদি বেদ বিচারণীয় না হয়েন তবে পরস্পর বিরুদ্ধ যে ব্যাসাদি ঋষি বাক্য তাহা কিরূপে বিচারণীয় হইতে পারে অতএব এই যুক্তির অনুসারে পুরাণ এবং ইতিহাস প্রভৃতি যাহা ঋষি বাক্য তাহাও বিচারণীয় না হইলে সকল কর্ম্মের লোপাপত্তি হয় দ্বিতীয়তঃ এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে দুর্জ্ঞেয় নিমিত্ত বেদ যদি ব্যবহার্য্য না হযেন তবে গায়ত্রী সন্ধ্যা দশ সংস্কার প্রভৃতি বেদমন্ত্রে করেন কি পুরাণ বচনে করিয়া থাকেন।

(রামমোহন গ্রন্থাবলী-২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ ৪৬)

উদাহরণ (গ) :

এক্ষণে যাহারা ভাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে তাহারদিগের বিদ্যার কি এই ফল হইল কেবল নাস্তিকতা করিবেক ভাল যদি এই নাস্তিকের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদিগের মত কেহ পদপ্রাপ্ত হইতে পারিত তথাচ বুঝিতাম যে নাস্তিকতা করাতে সাহেবলোক তুষ্ট আছেন এই নিমিত্ত করে তাহা কোনমতেই নহে কেননা কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবলোক বেলিক নাস্তিককে যখন উচ্চপদে বা বিশ্বস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করেন না ইহা নিশ্চয় আছে যেহেতু যে ব্যক্তি আপন ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে তাহা হইতে কোন কুকর্ম্ম না হয় সে অবশ্যই বিশ্বাসের অপাত্র ইহা কি তাহারা জানেন না।

(সমাচার চন্দ্রিকা, ৫৮৬ সংখ্যা, ২০শে বৈশাখ, ১২৩৮)

উদ্ধৃত 'ছক' তিনটি ও 'উদাহরণ' তিনটি লক্ষ্য করলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধরা পড়ে।

প্রথমতঃ বাংলা গদ্য রচনায় যতিচিহ্নাদি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। ছক (ক), ছক (খ), ছক (গ) লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে অনুবাদক মূল ইংরেজি বাক্যের যতিচিহ্নাদির ব্যবহারে অনুবাদের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থেকেছেন। এই তিনটি ছকে ইংরেজি বাক্য অনুসরণে বাংলা বাক্যে পূর্ণচ্ছেদ (অনেক ক্ষেত্রে বাংলা দাঁড়ির ব্যবহার না করে ইংরেজি ফুলস্টপের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে), অর্ধচ্ছেদ, পদচ্ছেদ, প্রশ্নবোধক চিহ্ন প্রভৃতির যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দু'টি ছকের অন্তর্গত বাংলা রচনার প্রকাশকাল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ছক (গ)-এর অন্তর্গত রচনার প্রকাশকাল ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ।

দ্বিতীয়তঃ মৌলিক রচনার নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত প্রথম দু'টি উদাহরণের (ক এবং খ) প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮১২ এবং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনুবাদমূলক বাংলা রচনায় প্রায় সর্বপ্রকার যতিচিহ্নাদির ব্যবহার প্রত্যক্ষ ; কিন্তু, এই সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত মৌলিক রচনায় দাঁড়ি ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার যতিচিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় না। এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে দাঁড়ির ব্যবহারও করা হয়েছে দু'টি তিনটি বাক্যের অন্তর।

তৃতীয়তঃ, ছক (গ) এবং উদাহরণ (গ)-এর যতিচিহ্নাদি প্রয়োগের মধ্যেও পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। ছক (গ)-তে যতিচিহ্নাদির প্রয়োগ যথাযথ কিন্তু উদাহরণ (গ) তে একটি দীর্ঘ বাক্যে কেবলমাত্র পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে :

যতিচিহ্নাদির ব্যবহার :

রচনা	১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে	১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে
অনুবাদমূলক	পূর্ণচ্ছেদ, পদচ্ছেদ, অর্ধচ্ছেদ (ছক 'ক' ও 'খ')	পূর্ণচ্ছেদ, পদচ্ছেদ, অর্ধচ্ছেদ প্রশ্নবোধক চিহ্ন (ছক 'গ')
মৌলিক	পূর্ণচ্ছেদ (ছক 'ক' ও 'খ')	পূর্ণচ্ছেদ (ছক 'গ')

চতুর্থতঃ, ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে মূলতঃ মিশনারিগণ বাংলা গদ্যে বিভিন্ন যতিচিহ্নের প্রয়োগ শুরু করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম

দুই দশকের মধ্যেই। এই ধারা অনুসরণ করেই বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নাদির ব্যবহার প্রবর্তিত হয। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য রামমোহনের রচনাতে পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া অন্য কোন যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হযনি। এমন কি, বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম দিকের রচনায কেবলমাত্র পূর্ণচ্ছেদেরই ব্যবহার করেছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন :

> তাঁহার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বেতালপঞ্চবিংশতি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয। এই গ্রন্থে দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোন বিরামচিহ্নের প্রয়োগ নাই। কিন্তু যতদিন যাইতে থাকে, তিনি অনুভব করেন যে, রচনা সহজবোধ্য করিতে হইলে সকল প্রকার বিরামচিহ্নের বহুল প্রয়োগ আবশ্যক, এ বিষয়ে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ লেখকদের অনুসরণ করিয়া চলিতেন।[১২]

তিন

ক. ইংরেজি শব্দ চযন :

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে বিদেশী শব্দের আমদানি স্বল্প নয এবং বিদেশী শব্দের মধ্যে ইংরেজি শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে নিঃসন্দেহে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বিংশ শতকের বর্তমান দশক পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যে সমস্ত ইংরেজি শব্দ প্রবেশ করেছে তাদের সংখ্যা যথেষ্ট। আমাদের রচনা কার্যে যেমন বাংলা শব্দের পাশাপাশি আমরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি তেমনিই মুখের ভাষাতেও বাংলা এবং ইংরেজি শব্দের সংমিশ্রণে আমরা অভ্যস্থ হয়ে গিযেছি। এই ধরণের ইঙ্গ-বঙ্গ শব্দের মিশ্রণে বাক্য রচনা কবলে বা কথা বললে অনেক ক্ষেত্রে আজ আর বেসুরো শোনায় না। আমরা 'রেলগাড়ীটা কি ঠিক সময় পৌছবে?' না বলে স্বাভাবিক ভাবেই বলে ফেলি 'ট্রেণটা' কি ঠিক 'টাইমে' পৌছবে? অথবা, 'ট্রেণটা' কি 'রাইট' 'টাইমে' পৌছবে? অথবা, 'ট্রেণটা' কি ঠিক সময়ে 'রিচ্' করবে?' ইত্যাদি।

আলোচ্য পর্যায়ে, ইংরেজি শব্দ গ্রহণের সূচনা-পর্বে প্রয়োজনের টানে ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে স্থান পেতে লাগল। ইংরেজি শাসন

১২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (সাহিত্য), ভূমিকা, ১ম সংস্করণ পৃ ১/০

প্রতিষ্ঠিত হবার পর পরিবেশের পরিবর্তনের সংগে সংগে সরকারি কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে এবং প্রতীচ্যের বিজ্ঞান-ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। বাংলা ভাষায়, প্রয়োজনের টানে প্রবিষ্ট, কতিপয় ইংরেজি শব্দের উদাহরণ দিচ্ছি :

ডিসকৌণ্ট, পারমিট, কৌসিল, এক্সচেঞ্জ
বাঙ্ক, নোট, জজ, রেকার্দ (Record)
প্লাতীনা, ডেকসিয়ানরি ইত্যাদি ॥
(সমাচার দর্পণ থেকে)
ক্রুশাদ, কোম্পানী, কোম্পাস, বাক্স ইত্যাদি ॥
(দিগদর্শনের পাতা থেকে)
রিপোর্ট, এডবর্টাইজ, আসৈনি, ফিস্ ইত্যাদি ॥
(সমাচার চন্দ্রিকার পাতা থেকে)
টচমেণ্ট (attachment), ডবল, ডিক্রি।
প্রিমিয়ম, ওয়ারিণ (warrant), কালেকটর ইত্যাদি।
('কলিকাতা কমলালয়' থেকে)

এই সময়ে বাংলা শব্দভাণ্ডারে গৃহীত বহু ইংরেজি শব্দ উচ্চারণগত এবং ব্যাকরণগত দিক থেকে কিছুটা বঙ্গীয় রূপ লাভ করেছিল।

এই যুগে প্রবিষ্ট অনেক ইংরেজি শব্দই বিকৃত উচ্চারণ অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছিল। সুতরাং এই পর্যায়ে, বাংলা গদ্যে ব্যবহৃত অনেক ইংরেজি শব্দকেই তৎসম (তাহার সমান অর্থাৎ ইংরেজির সমান) বলা চলে না! এই শব্দগুলির অধিকাংশই ছিল ভগ্ন বা অর্ধ-তৎসম জাতীয়। উদাহরণ :

Proof — পুরুপ, Sloop — স্লুপ, Central — সেনটেরেল।
Master — মেষ্টর, (সমাচার দর্পণ)।
Sheriff — সরিপ, Sergeant — সারজেন।
Law — লা, Summon — সমন।
(কলিকাতা কমলালয়)

Balloon — বলুন, Pope — পাপা।
October — অক্তুবর। (দিগ্‌দর্শন)

অবশ্য উচ্চারণ-বিকৃতি ছাড়াও কিছু ইংরেজি শব্দ এই সময় বাংলা শব্দ

ভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে : যেমন, 'সার্টিফিকেট' 'কোম্পানি' (নববাবু বিলাস) ; 'ডাইরেকটর', 'অফিস' (সমাচার চন্দ্রিকা) ইত্যাদি।

ব্যাকরণগত দিক থেকে বাংলা শব্দভাণ্ডারে গৃহীত নানা ইংরেজি শব্দের বঙ্গীয় রূপদানের (কখনো ইংরেজি শব্দের সংগে বাংলা প্রত্যয় যুক্ত করে, কখনো ইংরেজি শব্দের পর বাংলা বিভক্তি ব্যবহার করে, আবার কখনো বিপ্রকর্ষের নিয়ম অনুসরণ করে) প্রচেষ্টাও এই যুগ থেকেই শুরু হয়। কতিপয় উদাহরণ উৎকলিত করছি :

[১] ইংরেজি শব্দ + ঈয় প্রত্যয় (তৎ-কর্তৃক উক্ত, তত্র জাত, তদ্বিষয়ক ইত্যাদি অর্থে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত)

ইংলণ্ড + ঈয় = ইংলণ্ডীয়।

আথেন্স + ঈয় = আথেন্সীয়।

[২] ইংরেজি শব্দ + ই প্রত্যয় (অপত্যার্থে)

রোম + ই = রূমি।

[৩] ইংরেজি শব্দ + বাংলা বিভক্তি

ডিরেকটর + প্রথমা বিভক্তির বহু বচনের চিহ্ন 'এরা' = ডিরেক্টরেরা।

পার্লিয়ামেণ্ট + সপ্তমী বিভক্তির একবচনের চিহ্ন 'এ' = পার্লিয়ামেণ্টে।

যিশরায়েল + ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনের চিহ্ন 'এর' = যিশরায়েলের।

[৪] অনেক সময় স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের রীতি অনুসরণ করে ইংরেজি শব্দ বঙ্গীয় রূপলাভ করেছে : সেনটেরেল, কেলার্ক, পুরুপ।

সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাষার প্রকাশ ক্ষমতার প্রবৃদ্ধি প্রয়োজনীয়। ভাষার প্রকাশ ক্ষমতার প্রবৃদ্ধি ঘটে, অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে, শব্দভাণ্ডারের প্রসারতার উপর। এই পর্যায় থেকে বিভিন্ন ইংরেজি শব্দ অনুপ্রবেশের সংগে সংগে বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রসার ঘটতে শুরু করে এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যের নানা প্রয়োজনে এই সমস্ত শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। বিচিত্র এবং বিভিন্ন ধরণের ইংরেজি শব্দের ব্যবহার পরবর্তী পর্যায়গুলিতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

খ. পরিভাষা :

উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলা গদ্যে যখন বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত ঘটল তখন বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির

প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। আলোচ্য পর্যায়ে, কোন পূর্ব আদর্শ সম্মুখে না পেয়েও, বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় যে তৎপরতা দেখা গিয়েছে তা' নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পরবর্তী কালে, ইংরেজি প্রভাবিত নানা বিষয়বস্তু গ্রহণের সংগে সংগে পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা যখন বৃদ্ধি পেয়েছে তখন প্রথম দিকে রচিত এই সমস্ত পরিভাষা আদর্শ হিসেবে অনেক সময় কার্যকরী থেকেছে।

বর্তমান পর্যায়ে, পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফিলিক্স্ কেরি-র অবদান যথেষ্ট। পরবর্তী যুগের গদ্যকার অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে সার্থক পূর্বসূরী হিসাবে ফিলিক্স্ কেরি-র নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' গ্রন্থটিতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের[১৩] মধ্যেই বাংলা ভাষায় পরিভাষা সৃষ্টির প্রথম এবং উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তিনি 'Glossary of words used in the History of England' শিরোনামায় গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত পরিভাষার বারো পৃষ্ঠা ব্যাপী (৭ পৃষ্ঠা থেকে ১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) একটি দীর্ঘ তালিকা উপস্থিত করেছেন। নমুনা স্বরূপ, এখানে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করছি :

Anarchy—অপ্রভুত্ব, অনাধিপত্য	Keeper of the seal—রাজমুদ্রা-রক্ষক
Aristocracy—কুলীন প্রভুত্ব	Knight—যোদ্ধৃকুল
Board of Trade—বাণিজ্য নিয়ামক সভা	Indulgences—পাপক্ষমাপত্র
Chairman—সভাপতি	Militia—গার্হস্থ্য সৈন্য, লৌকিক সৈন্য
Despotism—একাধিপত্য	Pacific Ocean—প্রশান্তসাগর
Elector—পসন্দকর্ত্তা, মনোনীত কর্ত্তা	Parliament—মহাসভা
	Vicar—গ্রামস্থ ধর্মোপদেশক

কেরি তাঁর 'বিদ্যাহারাবলী' গ্রন্থটিতেও পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেছেন।

১৩. ডঃ সুকুমার সেন এই গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ ১৮২০ বলে উল্লেখ করেছেন।
(সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ৩৫)
কিন্তু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের বাংলায় এবং ইংরেজিতে লেখা 'title page'-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বাংলায় লেখা— শ্রীরামপুরে ছাপা হইল, ইতিশক ১৮১৯। ইংরেজিতে লেখা Printed for the Calcutta Book society 1820.

এই যুগেই রামমোহন Geography শব্দের পরিভাষা করেছিলেন জ্যাগ্রাহী এবং পাদ্রি ইয়েট্স্ Physics-এর পরিভাষা করেছিলেন পদার্থবিদ্যা।

আলোচ্য পর্যায়ে সৃষ্ট আরও কয়েকটি পরিভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করছি :

দূরবীণ, স্থির বায়ু, সামান্য বায়ু, বিষুব রেখা

(উইলিয়ম ইয়েট্স্, পদার্থবিদ্যাসার)

মধ্যস্থ সমুদ্র (Mediterranean, Sea), ত্রিকোণ স্তম্ভ (Pyramid), নদীর অশ্ব (Hippopotamus) ইত্যাদি।

(পীয়ার্স ন, প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়)

উপরি উদ্ধৃত কিছু কিছু পরিভাষা পরবর্তীকালে অপরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন :

বাণিজ্য নিয়ামক সভা, সভাপতি, দূরবীন, স্থির বায়ু, সামান্য বায়ু, বিষুব রেখা, পদার্থ বিদ্যা।

আর, পাপক্ষমাপত্র শব্দের পরিবর্তে পরবর্তীকালে কেবল 'ক্ষমাপত্র'[১৪] শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রশান্ত সাগর হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর।

আলোচ্য যুগে অনুবাদমূলক গ্রন্থগুলি পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। মূলগ্রন্থে ব্যবহৃত ইংরেজি 'টার্ম'-এর বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদকেরা বাংলা পরিভাষার সৃষ্টি করেছিলেন।

চার

বাংলা গদ্যের লিখিত রূপের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে ইংরেজি প্রভাবের সক্রিয়তা পূর্ববর্তী অংশে ক্রিয়াপদের ব্যবহার, খণ্ড বাক্যের সজ্জা, যতিচিহ্নাদির প্রয়োগ এবং ইংরেজি ভাষারীতির বিবিধ অনুসরণ সম্বন্ধে কিছু উদাহরণ লক্ষ্য করেছি। মুখের ভাষা হিসাবে বাংলা গদ্যের নিজস্ব রীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং জননী হিসাবে সংস্কৃতের প্রভাবও বাংলা ভাষায় কম ছিল না। উপরন্তু, উনিশ শতকের শুরু থেকে ইংরেজি ভাষারীতির আদর্শ অনুসরণের ফলে বাংলা গদ্য মাত্র অর্ধ শতাব্দী কালের মধ্যেই সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল।

১৪. কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, মার্টিন লুথারের জীবন চরিত, ২য় সংস্করণ: ১২৯৫, পৃ ২০।

সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য ভাষার প্রকাশভঙ্গির শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। এই শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং বৈচিত্র্য আনয়নে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছিল। ইংরেজি অনুসরণে যতিচিহ্নাদির প্রয়োগ এবং খণ্ড বাক্যের সজ্জা বাংলা গদ্যের শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রবর্তনে সবিশেষ সহায়তা করেছিল। তাছাড়া, ইংরেজি ভাষারীতির অন্যান্য আদর্শ বাংলা গদ্যের প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছিল। রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি এ যুগের বিশিষ্ট বাঙালী গদ্যকারের রচনা থেকে শুরু করে বিদেশী মিশনারিদের বাংলা রচনা পর্যন্ত ইংরেজি বাক্যগঠন রীতির দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত। এই প্রভাবের প্রকৃতি এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত কতিপয় উদাহরণে লক্ষ্য করেছি।

উচ্চাংগের সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী ভাষা, বাংলা গদ্যে, এই পর্যায়ে অবশ্যই গড়ে ওঠেনি। সাহিত্যে উত্তরণের জন্য ভাষার যে স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা প্রয়োজন, সেই স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে ইংরেজির অনুসরণ, আলোচ্য পর্যায়ে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনোভাব নিয়ে করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়গুলিতে (বর্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়) উপযোগিতা ও কার্যকারিতার দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রমশঃ যেমন কিছু কিছু ইংরেজি রীতি বর্জন করা হয়েছিল তেমনি আবার প্রথম পর্যায়ে গৃহীত অনেক রীতি বাংলা গদ্যে চিরন্তন ছাপ এঁকে দিয়েছিল।

প্রথম পর্যায়ে ইংরেজি অলংকার অনুসরণে ভাষার সাহিত্যগুণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। পরবর্তী পর্যায়গুলিতে এই প্রচেষ্টা, সাহিত্যিক গদ্য ব্যবহারের তাগিদে, বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারীতিরও পরিবর্তন ঘটে। প্রথম পর্যায়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু কল্পনার জগতে ডানা মেলে দেয়নি। এক সংকীর্ণ প্রয়োজনের জগতে এবং জ্ঞানের বিষয় পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিচরণ করেছে মাত্র। বিষয়বস্তু তখন যেমন ছিল সীমিত তেমনি প্রকাশ ভঙ্গিও ছিল সীমিত। বাংলা গদ্য যখন পরবর্তী পর্যায়গুলিতে কল্পনার বিচিত্রতর ও সূক্ষ্মতর প্রকাশে সচেষ্ট হয়ে উঠল তখন ইংরেজি সাহিত্যের অলংকার-সুষমা আত্মসাৎ করার প্রেরণা বোধ করল।

পরিশেষে স্মরণীয়, এই পর্যায়ে ইংরেজি ভাষারীতির অনুসরণ করে এবং

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে বিভিন্ন ইংরেজি শব্দ গ্রহণ করে বাংলা গদ্যের প্রকাশ ক্ষমতার প্রসারতা ঘটেছিল ; ফলে, পরবর্তী পর্যায়গুলিতে ইংরেজি সাহিত্যের ভিন্নরূপী ও বিচিত্রধর্মী বিষয়বস্তুর রূপায়ণে বাংলা গদ্য অনেক বেশী কৃতকার্যতা লাভ করেছিল।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ের দু'টি অধ্যায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং ভাষারীতির প্রভাব যথাক্রমে আলোচিত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিষয়বস্তু (১৮৪৩-১৮৭২)

গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, রামকমল, দ্বারকানাথ, রাজকৃষ্ণ, তারাশঙ্কর, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য

এক

ভাষারীতি এবং বিষয়বস্তু পরস্পর নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ। একের অগ্রগতি অপরের অগ্রগতির অপেক্ষক। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বৃদ্ধির সংগে সংগে ভাষাও বিচিত্র বিষয়বস্তু পরিবেশনের উপযোগিতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রকাশভংগির নব নব রূপ অনুসন্ধানে তৎপর হযে ওঠে। অপরপক্ষে, ভাষারীতি যখন প্রকাশ ক্ষমতার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য অর্জন করে অধিক প্রকাশক্ষম হয়ে ওঠে তখন তার বিচিত্র প্রকাশ ক্ষমতা প্রযোগের জন্য বিষয়বস্তুর নব নব ক্ষেত্র অন্বেষণ করে থাকে। এই দুইয়ের সম্যক সম্মিলনেই উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি।

প্রথম পর্যায়ে, সুদীর্ঘ তেতাল্লিশ বছরের সাধনায়, ইংরেজি ভাষারীতি অনুসরণ করে, বাংলা গদ্যের ভাষারীতি প্রকাশভংগির ক্ষেত্রে অনেকটা কার্যকারিতা অর্জন করেছিল। এই উন্নত ভাষারীতি এবার তার প্রকাশের আধার হিসাবে নব নব বিষয়বস্তুর অন্বেষণে অগ্রসর হল। আলোচ্য পর্যায়ে, বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে, হয়ে উঠল স্ফীতকায় এবং বৈচিত্র্যমণ্ডিত।

পূর্ববর্তী পর্যাযে, জ্ঞানের সাহিত্যের উদ্‌বোধন করেছিলেন মিশনারিগণ। বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণের মাধ্যমে, আলোচ্য পর্যায়ে, অক্ষয়কুমার এবং বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত আয়াসে জ্ঞানের সাহিত্য সার্থক হয়ে উঠল। জ্ঞানপিপাসু এই দুই সাধক স্বদেশ-মৃত্তিকায় স্বদেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং হিতকর প্রতীচ্যের জ্ঞানবীজ সযত্নে সংগ্রহ করে বপন করেছিলেন। প্রসংগক্রমে স্মরণীয় যে ইংরেজি গদ্য রচনার প্রথম যুগে স্বদেশের মৃত্তিকায় জ্ঞানের বীজ বপন করেছিলেন আলফ্রেড, লাটিন ভাষায় লিখিত ওরোসিউস্-এর 'হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড' অনুবাদ করে।

বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ এবং অনুসরণের মাধ্যমে বাংলা গদ্যে জ্ঞানের সাহিত্যের ধারাটি আলোচ্য পর্যায়ে বিশেষ স্ফীতকায় হয়ে উঠল। বিদ্যাসাগর

এবং অক্ষয়কুমারের আদর্শ অনুসরণ করে অনেক গদ্যশিল্পীই ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে বংগবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ভাবের সাহিত্য দিগন্তে জলদর্চি রেখার মতো আভাসিত হয়েছিল। এইবার বিভিন্ন ধর্মী এবং বহুসংখ্যক ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণের মাধ্যমে ভাবের সাহিত্যেরও বর্ষণ শুরু হল। তাছাড়া, ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণে রচিত কিছু মৌলিক গ্রন্থও বাংলা গদ্যে ভাবের সাহিত্যের ধারাটি পরিপুষ্ট করেছিল।

আর, ইংরেজি সাহিত্যের ধারা অনুসরণে বাংলা গদ্যে সাময়িক পত্রের যে ধারা পূর্ববর্তী পর্যায়ে প্রবর্তিত হয়েছিল সে ধারার পরিপূর্ণতা দেখা গেল আলোচ্য পর্যায়ে অক্ষয়কুমারের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশনায়। ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রভৃতি পত্রিকাও সাহিত্যধর্মী বিষয় পরিবেশনে অগ্রসর হল।

যাই হোক, আলোচ্য পর্যায়ে, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়-সম্ভার সবিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই প্রভাবের পরিচয় তিনটি ধারার (অনুবাদ ও অনুসরণ / সাময়িক পত্র / মৌলিক রচনা) মাধ্যমে গ্রহণ করব।

দুই

অনুবাদ / অনুসরণ :

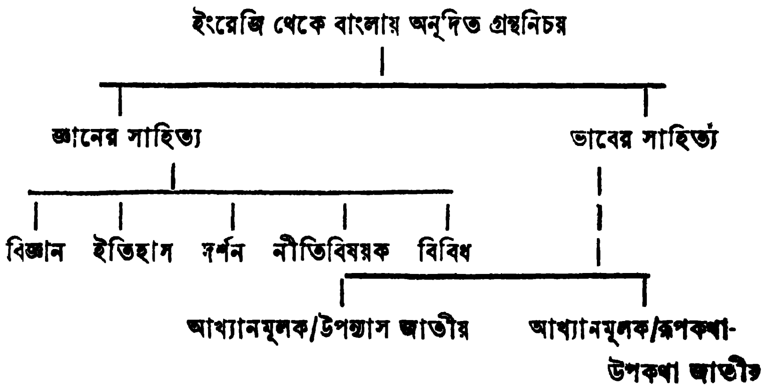
অনুবাদের পাশাপাশি অনুসরণ শব্দটি ব্যবহার করেছি, কারণ, কিছু কিছু বাংলা গ্রন্থ সরাসরি কোন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ না হলেও কোন একটি ইংরেজি গ্রন্থ বা একাধিক ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বনে বা অনুসরণে রচিত হয়েছিল। এই পর্যায়ের, অনুবাদকেরা, ভাষার প্রকাশক্ষমতা প্রবৃদ্ধির দরুণ, আক্ষরিক অনুবাদ অপেক্ষা স্বচ্ছন্দ অনুবাদের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন বেশী। এবং বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রামকমল ভট্টাচার্য, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই আক্ষরিক অনুবাদ অপেক্ষা স্বচ্ছন্দ অনুবাদের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব এই পর্যায়ে অনুবাদ / অনুসরণের মধ্যেই, পূর্ববর্তী পর্যায়ের মতো, প্রকট ছিল।

যে কোন সাহিত্যেরই অগ্রগতির ক্ষেত্রে অনুবাদের মূল্য অস্বীকার করা

যায় না। অনেকে অনুবাদের তুলনায় মৌলিক রচনায় প্রতিভা ও পরিশ্রমের প্রয়োগ অধিকতর ফলপ্রসূ বলে জ্ঞান করেন। কিন্তু, সাহিত্যের ভাণ্ডারে মৌলিক বিষয়ের অবদান যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজনীয় অপর দেশের সাহিত্যের সম্ভার অনুবাদের মাধ্যমে স্বদেশীয় সাহিত্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া।[১]

বিশেষতঃ, বাংলা গদ্য সাহিত্য যখন সবেমাত্র গড়ে উঠেছে তখন ইংরেজির মতো একটি অতি উন্নত সাহিত্যের বিবিধ-বিচিত্র সম্ভার অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারে স্থান করে দেবার প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য অপরিসীম। একদিকে এই সমস্ত অনুবাদ গ্রন্থ বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বিষয়-দৈন্য উৎসাদন করেছে অপরদিকে বাংলা সাহিত্য তথা বাঙালী সাহিত্যিকের কাছে আদর্শ হিসাবে উদ্ভাসিত থেকেছে।

এই পর্যায়ের বাংলায় অনূদিত গ্রন্থগুলি, বিষয়বস্তু হিসাবে, বিভিন্ন ধারা উপধারায় বিভক্ত করতে পারি :



ক. জ্ঞানের সাহিত্য : অনুবাদ / অনুসরণ

বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণের ক্ষেত্রে আলোচ্য পর্যায়ে অক্ষয়কুমার দত্তের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁর প্রায় সমুদয় রচনাই ইংরেজির অনুবাদ অথবা প্রত্যক্ষ অনুসরণ। বাংলা গদ্যে জ্ঞান ও যুক্তির ঐতিহ্য

১. Some may think that the same talents and industry would be better devoted to original work, but it must be allowed that to elucidate and render accessible the labours of others may be a service as valuable as the addition of new material to the common store.—Ed., J. B. Sykes, Technical Translator's Manual, Introduction, first edition, p. XVII

সৃষ্টিতে তিনি উৎসাহী ছিলেন। ‘সুশিক্ষিত বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত২’ হয়ে তিনি ইংরেজি জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতীচ্যের জ্ঞান বাংলা গদ্যে সংকলন করেছিলেন। ‘চারুপাঠ’ গ্রন্থের তিনটি ভাগই ইংরেজি গ্রন্থাদির অনুসরণে লিখিত। ‘চারুপাঠ’ (প্রথম ভাগ)-এর ‘বিজ্ঞাপন’ অংশে অক্ষয়কুমার বলেছেন :

> চারুপাঠ প্রথম ভাগ প্রস্তুত ও প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থ যে নানা ইংরেজি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত, ইহা বলা বাহুল্য।

গ্রন্থটির রচনানিচয় বিষয়বস্তু অনুসারে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা চলে : বিজ্ঞান-মূলক এবং নীতিমূলক।

পরিচ্ছেদ	বিজ্ঞানমূলক	নীতিমূলক
প্রথম	আগ্নেয়গিরি। সিন্ধুঘোটক। ধীবর	বিদ্যাশিক্ষা। দয়া। তরুণ বয়স্কদিগের প্রতি উপদেশ
দ্বিতীয়	পৃথিবীর ইতিহাস। জলপ্রপাত। পৃথিবীর পরিমাণ। বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির কারণ। পুরুভুজ	সন্তোষ। কুসংসর্গ
তৃতীয়	উষ্ণ প্রস্রবণ। দীপমক্ষিকা। পৃথিবীর গতি। বনমানুষ। শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান	আত্মপ্রসাদ। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন
চতুর্থ	জলস্তম্ভ। পরমাণু	আত্মগ্লানি

অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞানমূলক রচনাগুলি প্রতীচ্য বিজ্ঞানের তথ্যে বাংলা গদ্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। এই সমস্ত নিবন্ধে প্রাকৃতিক ভূগোল, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যার নানা জ্ঞাতব্য তথ্য সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই প্রসংগে দুই একটি রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করছি।

২. যাঁহারা ইংরেজি, ফরাসী জর্ম্মেন ভাষায় সুশিক্ষিত হন, প্রকৃত জ্ঞানলাভ উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের শিক্ষণীয় অল্প বিষয়ই আছে। সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান-সঞ্চার উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা বিদ্যমান আছে উল্লিখিত তিনটি ইউরোপীয় ভাষার একটিতে অধিকার থাকিলে তাহার সহস্রগুণ অক্লেশে একত্রে পাওয়া যায়। সুপাকার শুভ্র অন্ন প্রস্তুত পাইলে তুষাবৃত কতকগুলি কণিকামাত্র সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন কি? তাহাও নির্বাচন করিয়া লওয়া ইউরোপীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত বুদ্ধির কার্য্য।—অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, ২য় সংস্করণ, উপক্রমণিকা, পৃ ৩২।

'চারুপাঠ' (১ম ভাগ)-এর প্রথম পরিচ্ছেদে আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রয়েছে। শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে বাংলায় একটি নিবন্ধ পূর্বেই রচনা করেছিলেন।৩ কিন্তু, অক্ষয়কুমারের এই রচনাটি অধিক তথ্যসমৃদ্ধ। বিসুবিয়সের আলোচনা কেন্দ্র করে আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে ধারণা দেবার চেষ্টা করেছিলেন মিশনারিগণ। অপরপক্ষে, অক্ষয়কুমার আগ্নেয়গিরি সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কারণ অনেকটা বিশদভাবে প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন এবং উদাহরণক্রমে বিসুবিয়সের প্রসংগ উত্থাপন করেছেন। আগ্নেয়গিরি সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

> পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা এই পর্ব্বতাগ্নি উৎপন্ন হইবার যে সকল কারণ দর্শাইয়া থাকেন, তাহা লিখিত হইতেছে। পৃথিবীর অভ্যন্তর অতিশয় উষ্ণ। অবনীর পৃষ্ঠদেশ যে স্থান যত নিম্নে সে স্থান তত উত্তপ্ত। ১৫।১৬ ক্রোশ নিম্নে সমুদয় স্থান অত্যুষ্ণ তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। নারিকেল মধ্যবর্ত্তী জলভাগ যেমন কঠিন আবরণে আবৃত. পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তরল বস্তুরাশি সেরূপ কঠিন আচ্ছাদনে আবৃত। সাগরের জল যেমন কম্পিত হইয়া তরঙ্গ উপস্থিত করে, অবনীগর্ভস্থ উল্লিখিত অগ্নিময় মহাসাগরও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইয়া তরঙ্গমালা উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ তরঙ্গ লাগিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে স্থান বিশেষ কম্পিত, স্ফীত ও বিদীর্ণ হয়। যদি ঐ তরঙ্গ অধিক প্রবল না হয়, তাহা হইলে উহার উপরিস্থিত কঠিন পদার্থ সমুদায়, কিয়ৎক্ষণ কম্পিত হইয়া নিবৃত্ত হয় অথবা কিছুদূরে স্ফীত হইয়া থাকে; আর যদি সমধিক প্রবল হয় তাহা হইলে সেই তরঙ্গের উপরিভাগে যত বস্তু থাকে, তাহা তরঙ্গের শক্তিতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে আসিয়া পর্ব্বতাকার হয় এবং পরে অভ্যন্তরস্থ অগ্নিময় তরল পদার্থ সেই পর্ব্বত নির্ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে আরম্ভ হয়। যে স্থান বিদীর্ণ করিয়া সেই সমুদায় উত্থিত হয়, সেইস্থানে একটি গহ্বর হইয়া থাকে। এইভাবে আগ্নেয়গিরি উৎপত্তি হয়।
>
> (চারুপাঠ, ১ম ভাগ, ৩য় সংস্করণ, পৃ, ৮-৯)

'বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির কারণ' শীর্ষক নিবন্ধে অক্ষয়কুমার উদ্ভিদ বিদ্যার আলোচনা করেছেন। বিজ্ঞান রাজ্যের এই দিকটি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভের

৩. দিগ্‌দর্শন, এপ্রিল. ১৮১৮, পৃ, ৩২।

জন্য তিনি কিছুকাল মেডিকেল কলেজে যাতায়াত করেছিলেন।[৪] উদ্ভিদ বিদ্যা সম্বন্ধে যে পাশ্চাত্য জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন সে জ্ঞান জাতীয় প্রয়োজনে জনসমক্ষে উপস্থিত করবার তাগিদে তিনি লেখনী ধারণ করেন। উল্লিখিত নিবন্ধটি তারই প্রমাণ। এখানে, আধুনিক উদ্ভিদবিদ্যার প্রথম পাঠ বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করলেন অক্ষয়কুমার। বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুসরণে লেখক গর্ভ কেশর, পরাগ কেশর, বীজকোষ প্রভৃতির কার্যাবলীর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অক্ষয়কুমারের নীতিমূলক নিবন্ধাদিও বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এই প্রসংগে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ ধরণের নিছক নীতিমূলক রচনার আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি। আদি ও মধ্যযুগেও বাংলা সাহিত্যে উপদেশ ও নীতিবচন ছড়ানো-ছিটানো ভাবে কিছু কিছু পাওয়া গেলেও সেগুলো কখনোই প্রাধান্য লাভ করে গ্রন্থের মূল বিষয় হয়ে ওঠেনি। আর, এ ধরণের নীতিবচন ছিল মূলতঃ ধর্মোপদেশ মূলক। প্রসংগক্রমে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থের 'শিক্ষাষ্টক' অংশটি স্মরণ করতে পারি।

'চারুপাঠ' (২য় ভাগ)-এর রচনানিচয়ও মূলতঃ বিজ্ঞানমূলক এবং নীতিমূলক :

বিজ্ঞানমূলক	নীতিমূলক
দিগদর্শন, ব্যোমযান,	আত্মোন্নতিবিধান,
চন্দ্র, সৌরজগৎ,	সৎকথন ও সদাচার,
গ্রহ ও উপগ্রহ,	নীতিচতুষ্টয়,
ধূমকেতু, আলেয়া,	পরিশ্রম, সন্তোষ,
প্রবাল, মেরুজ্যোতি,	আত্মসংযম, প্রভু ও
প্রাকৃতিক নিয়ম	ভৃত্যের ব্যবহার

'চারুপাঠ' দ্বিতীয় ভাগে (১৮৫১) স্থানপ্রাপ্ত যে কোন বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের দু' একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করলে দেখা যাবে যে অক্ষয়কুমার সরলভাবে অভ্রান্ত নিষ্ঠার সংগে প্রতীচ্য বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। 'প্রাকৃতিক

৪. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়চরিত ১২৯৪ সংস্করণ পৃ ১৯ ও ৪৭।

শীর্ষক রচনাটিতে পাশ্চাত্যের কার্যকারণ সম্পর্কিত তত্ত্ব তিনি অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বিরচিত 'নিয়মের রাজত্ব' শীর্ষক নিবন্ধটির সার্থক পূর্বসূরি হিসাবে অক্ষয়কুমারের এই নিবন্ধটি গ্রহণ করা চলে :

> সংসারে তাবৎ বস্তুর যাবৎ কার্য্যই বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট রীত্যনুসারে সংঘটিত হয়। সমুদ্রের জল সূর্য্যের তেজে বাষ্প হইয়া উর্দ্ধগামী হয়, এবং তাহাতেই মেঘ জমিয়া পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করে। এই স্থলে জল ও তেজ এই উভয় পদার্থের কার্য্য বাষ্প অথবা মেঘ। এই কার্য জগতের নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ জল ও তেজের যাদৃশ প্রকৃতি এবং উভয়ের যাদৃশ পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, তাহাতে ঐ কার্য্যের ঐ প্রকার ঘটনা ব্যতিরিকে আর কিছুই হইতে পারে না, জল ও তেজের যে অবস্থায় ঐ কার্য্য একবার ঘটিযাছে, পুনর্বার তাহাদের সে অবস্থা ঘটিলে অবশ্যই সে কার্য্য ঘটিবে, এই যে বিশিষ্ট রীতি আছে, ইহাকেই নিয়ম বলা হয়।
>
> (চারুপাঠ, ২য ভাগ, পৃ ২৯)।

গ্রহ ও উপগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রেও ভাষার এই স্পষ্টতা, সারল্য এবং যুক্তিক্রম লক্ষ্য করা যায়। নতুন গ্রহ আবিষ্কারের জন্য প্রতীচ্য বিজ্ঞান জগতে হার্শেল সাহেব বিশেষ পরিচিত হয়েছিলেন। আমাদের বিজ্ঞানমূলক বিভিন্ন নিবন্ধেও, উনিশ শতকে, হার্শেলের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫]

> ...গ্রহগণ যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে উপগ্রহগণ সেইরূপ গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। প্রায় সমুদয় গ্রহ ও উপগ্রহ পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করে, কেবল হার্শেল গ্রহের উপগ্রহ সমুদায় পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে গমন করিয়া থাকে।
>
> গ্রহগণের এইরূপ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করাকে উহাদের বার্ষিক গতি কহে। তদ্ভিন্ন উহাদের আহ্নিক গতি নামে আর এক প্রকার গতি আছে, উহারা যতদিনে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একবার পরিভ্রমণ করে, ততদিনে উহাদের বৎসর হয় এবং চলিতে চলিতে যত সময় শকট চক্রের ন্যায় এক একবার আপনা আপনি আবর্ত্তন করে তত সময়ে উহাদের অহোরাত্র হয়। এই শেষোক্ত গতিকে আহ্নিক গতি বলে।
>
> (চারুপাঠ, ২য়, ভাগ, পৃ ৭৬-৭৭)।

---

৫. বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই হর্শেল-এর উল্লেখ করেছেন।

'চারুপাঠ' (৩য় ভাগ, ১৮৫৯) গ্রন্থে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রচনা স্থান পেয়েছে। এদিক থেকে 'স্বপ্নদর্শন' শীর্ষক রচনাটি ভাবের সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় স্থানলাভ করবে।

বিজ্ঞানমূলক রচনার ধারায় অক্ষয়কুমারের 'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থটি সবিশেষ স্মরণীয়। 'চারুপাঠ' গ্রন্থে বিজ্ঞানমূলক কতিপয় বিচ্ছিন্ন রচনা স্থান পেয়েছে। 'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থে লেখক বস্তু এবং গতি (Matter and Motion) সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন। অবশ্য পাদ্রি ইয়েট্‌স্ বাংলা ভাষায় পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ে বাংলা গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। কিন্তু ইয়েট্‌স এর রচনা* ছিল কথোপকথন জাতীয় এবং অত্যন্ত সূত্রাকারে পদার্থবিদ্যার তথ্যসমূহ সেখানে উপস্থাপিত হয়েছে। অক্ষয়কুমারের আলোচনা এই ক্ষেত্রে অনেকটা বিস্তৃত। অনেক সময়, লেখক চিত্র এবং অঙ্কের সাহায্যে বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুটনে প্রযাসী হয়েছেন। এই প্রসংগে মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) সম্বন্ধীয় আলোচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

জড়বস্তু সকল পরস্পর যত নিকটে থাকে, তাহারা পরস্পর তত তেজে আকর্ষণ করে আর যত দূরবর্তী হয় তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ তত অল্প হইয়া থাকে।......' (অক্ষয়কুমার দত্ত, পদার্থবিদ্যা, ১৮৭৩ সংস্করণ, পৃ ২৩)।

দূরত্ব অনুসারে লেখক মাধ্যাকর্ষণের হার অঙ্কের সাহায্যে চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট করেছেন। বাংলা গদ্যে বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারই, ইংরেজি গ্রন্থের আদর্শ অনুসরণ করে, অঙ্কের সাহায্যে বক্তব্য পরিস্ফুট করতে সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়েছেন :

দূরত্ব	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	ইত্যাদি
আকর্ষণ	১	১/৪	১/৯	১/১৬	১/২৫	১/৩৬	১/৪৯	১/৬৪	১/৮১	১/১০০	ইত্যাদি

(তদেব, পৃ ২৪)

পদার্থবিদ্যা গ্রন্থে অক্ষয়কুমারের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে গতিজাড্য (Inertia of Motion), স্থিতিজাড্য (Inertia of Rest), পরিচালকতা

* পাদ্রি ইয়েট্‌স্-এর 'পদার্থ বিদ্যাসার' ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

(Conduction and Convection), বিকিরণ (Radiation), ঘনত্ব (Density), আপেক্ষিক গুরুত্ব (Spceific Gravity), অপেক্ষক গতি (Relative Motion), চক্রাবর্ত গতি (Circular Motion), পরিবর্তিত গতি (Acceleration), মিশ্র গতি (Mixed Velocity) ইত্যাদি।

কিছুটা বিজ্ঞান এবং কিছুটা সমাজতত্ত্ব নিয়ে অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (দুই ভাগ ১৮৫২-১৮৫৩) রচনা করেছিলেন। গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা'য় গ্রন্থটির উৎস হিসাবে জর্জ কুম্ব-এর 'কানষ্টিটিউশন আব্ ম্যান' গ্রন্থটির উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, কুম্ব ছাড়া লেখক তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে অনেক সময় অন্যান্য ইংরেজি গ্রন্থের প্রসংগও উল্লেখ করেছেন :

W. Lawrence : Lectures on Comparative Anatomy.
Chapter IV, Lecture IV.
Liebig : Organic Chemistry, Part I.
P. B. Shelley : Poetical Works, Queen Mab, Note 17.
Fowler : Physiology, Chapter II.
Penny Encyclopaedia, Article on Lapland.

ইত্যাদি।

লেখক অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রতীচ্য বিজ্ঞানবেত্তার কোন কোন বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। এদিক থেকে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থটির 'উপক্রমণিকা'য় লেখক উত্তরোত্তর প্রধান প্রধান বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে লায়ল[৭] সাহেবের সংগে একমত হতে পারেন নি।[৮]

উল্লিখিত গ্রন্থগুলির দিকে লক্ষ্য করলে এই সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে 'তাঁর হাতেই গড়ে উঠেছিল বাংলা বৈজ্ঞানিক গদ্য তথা বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সম্পন্ন রচনা'[৯] এবং এই ক্ষেত্রে ইংরেজি প্রভাবের কার্যকারিতা অনস্বীকার্য।

রোগ-জর্জর দেহ নিয়ে জীবন সায়াহ্নে অক্ষয়কুমার রচনা করেছিলেন

৭ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞান রহস্য' গ্রন্থে লায়ল সাহেবের প্রভাব স্মর্তব্য। বর্তমান গ্রন্থের ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮. অক্ষয়কুমার দত্ত, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ১ম সংস্করণ, ১ম ভাগ, পৃ ৬।

৯. শিশিরকুমার দাস, মুখবন্ধ [নবেন্দু সেন, গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] পৃ. ১৩।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)। গ্রন্থদ্বয় অক্ষয় মনীষার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। সমাজ বিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান এবং দর্শনের মণি কাঞ্চন যোগ ঘটেছে আলোচ্য গ্রন্থে। প্রকাশকাল অনুসরণ করলে গ্রন্থদ্বয় বঙ্কিম যুগের অন্তর্গত। গ্রন্থটির প্রকাশকাল: প্রথম ভাগ ১৮৭৬, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩। কিন্তু, এই গ্রন্থরচনার সূত্রপাত হয় আলোচ্য যুগেই। এই গ্রন্থের অনেকগুলি প্রস্তাবই অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং, এই গ্রন্থের আলোচনা বর্তমান পর্যায়ের অন্তর্গত করেছি।

প্রতীচ্য জগতের আদর্শ অনুসরণ করে সমাজতত্ত্বমূলক এবং ভাষাতত্ত্বমূলক আলোচনার ক্ষেত্রে বাংলা গদ্য সাহিত্যের নব দিগন্ত সর্বপ্রথম উদ্ঘাটিত করেছিলেন অক্ষয়কুমার। এই গ্রন্থেই তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের পরিচয় গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের ধর্ম ও সমাজের বিজ্ঞানসম্মত ও ইতিহাস সম্মত আলোচনার সার্থক সূত্রপাত করেন।

গ্রন্থটি অনুবাদ নয়, বিভিন্ন গ্রন্থের অনুসরণ। এবং এই অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনি যেমন ইংরেজি গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছেন তেমনি নির্ভর করেছেন দেশীয় নানা গ্রন্থের ওপর। সর্বোপরি, সমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী অক্ষয়কুমার বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বয় সাধন করে প্রায় মৌলিক রচনার স্তরে গ্রন্থটি উন্নীত করেছেন।

গ্রন্থটির প্রথম ভাগের 'উপক্রমণিকা'য় তিনি বিষয়বস্তুর উৎস সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে বলেছেন:

> কাশ্মীর রাজা মুনসী শীতল সিংহ এবং তত্রত্য কলেজের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মথুরানাথ ইহারা প্রত্যেকে পারসীক ভাষায় এ বিষয়ের একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন।·· ···আর লাভাজী ও নারায়ণ দাসের হিন্দী ভক্তমালে, প্রিয়দাস কর্তৃক ব্রজভাষায় লিখিত তদীয় টীকায়, বাঙ্গালা ভাষায় কৃষ্ণদাসের কৃত সেই টীকার সবিস্তার বিবরণে এবং ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ভাষায় বিরচিত অপরাপর বহুতর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের প্রবর্তক ও অন্য অন্য ভক্তগণ সম্বন্ধীয় অনেকানেক উপাখ্যান এবং নানা সম্প্রদায়ের কর্তব্যাদি বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত আছে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীমান হ, হ, উইলসন ঐ দুই পারসীক পুস্তক এবং হিন্দী ও সংস্কৃতাদি ভাষায় রচিত ভক্তমাল প্রভৃতি অন্য অন্য সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ দর্শন করিয়া ইংরেজি ভাষায় হিন্দু

ধর্মাবলম্বী উপাসক সম্প্রদায় সমুদায়ের ইতিহাস বিষয়ের দুইটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এসিয়াটিক রিসর্চ নামক পুস্তকাবলীর ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে তাহা প্রথম প্রকাশিত হয়। আমি তাঁহার সেই দুই প্রবন্ধকেই অধিক অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় পশ্চাৎ প্রস্তাবিত সম্প্রদায় সমূহের অনেকাংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছি। স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংযোজন করা হইয়াছে।

অক্ষয়কুমারের দুই ভাগে বিভক্ত এই গ্রন্থটি বিপুল কলেবর। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ লেখক এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে গ্রন্থটির ব্যাপকত্ব আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

প্রথম ভাগ। কতিপয় আলোচিত বিষয়:

বৈষ্ণব সম্প্রদায়, রামানুজ সম্প্রদায়, কবীর পন্থী, খাকী, মলুকদাসী, দাদূপন্থী, রয়দাসী বা রৈদাসী, সেনপন্থী, বল্লভাচারী, মীরাবাই, সনকাদি সম্প্রদায় অর্থাৎ নিসাৎ, চৈতন্য সম্প্রদায়, চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা, স্পষ্টদায়ক, কর্ত্তাভজা, রামবল্লভী, বাউল, ন্যাড়া, দরবেশ, সাঁই, আউল, সহজী, হজরতী, পাগলনাথী, সখীভাবন ইত্যাদি ॥

দ্বিতীয় ভাগ। কতিপয় আলোচিত বিষয়:

শৈব সম্প্রদায়ের বিবরণ: নাগা, দঙ্গলী, অঘোরী, কাঙালিঙ্গী, অবধূত, ঠিকরনাথ, কনফট যোগী ইত্যাদি।

শাক্ত সম্প্রদায়ের বিবরণ: পশ্বাচারী ও বীরাচারী, বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও ভৈরবী, শৈবাচার, ভৈরবী, করাবী ইত্যাদি।

সৌর ও গাণপত্য: নিরঞ্জনী সাধু, মানভাব, কুলি গায়েন, দশমার্গী, ফকির সম্প্রদায়, নরেশ পন্থী ইত্যাদি ॥

গ্রন্থটির দুইভাগের দুইটি দীর্ঘ 'উপক্রমণিকা' অংশ লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় বিশেষভাবে বহন করে। ধর্ম, সমাজ এবং ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে তিনি আলোচনা করেছেন। ইংরেজি প্রভাব এই ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রকটিত। বহু ইংরেজি গ্রন্থের প্রসংগ এবং পাশাপাশি আমাদের বেদ পুরাণের প্রসংগ উপক্রমণিকায় উদ্ধৃত হয়েছে। এদিক থেকেও গ্রন্থটি সমন্বয়ের আদর্শই জাগ্রত রেখেছে।

প্রথম ভাগের 'উপক্রমণিকা'য় লেখক আমাদের সংস্কৃত ভাষার সংগে ইন্দো-ইউরোপীয় এবং ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার সম্পর্ক সন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন। এই সময়

ভাষাতত্ত্বের দিকে বাঙালীর সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, ম্যাক্সমূলার-এর ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনার দ্বারা। পরবর্তীকালে, এ বিষয়টির প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। ডক্টর বসন্তকুমার রায় প্রাচীন ইংরেজি (Old English)-র বিশেষ্য (Noun) এবং ক্রিয়াপদ (Verb)-এর রূপতত্ত্ব (Morphology) আলোচনায় ইন্দো-জার্মানিক ভাষার সংগে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[১০]

অক্ষয়কুমার দত্ত বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কারে আমাদের দেশে সর্বপ্রথম উৎসাহ বোধ করেছেন এবং য়ুরোপীয় ভাষা বিজ্ঞানীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন ঃ

> কিন্তু ধন্য শব্দবিদ্যা। ইউরোপীয় শাব্দিকদিগকে শতবার ধন্যবাদ। আমরা ঐ মৃতসঞ্জীবনী শব্দবিদ্যা প্রভাবে, ঐ অপরিজ্ঞেয়কল্প আর্য্যবংশীয়দিগের কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি।
>
> (অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, উপক্রমণিকা, ১২৭৭ সংস্করণ, পৃ ১১)

লেখক তাঁর ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় কতিপয় পাশ্চাত্য লেখকের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। লেখকের রচনায় পাশ্চাত্য গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতি অনুসরণ করলে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির প্রতি লেখকের আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় ঃ

Bopp : Comparative Grammar.
MaxMuller : Lecture on the Science of Language.
Prichard : Physical History of Mankind.[১১]

বিভিন্ন ভাষার শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য সূত্র অন্বেষণ করতে গিয়ে লেখক ভাষাতত্ত্ব

১০ Ray, Basanta Kumar, The Morphology of the Old English Noun and the Verb Traced from Pro-ethnic Indo-Germanic, University of Dacca, 1931.

১১. Francis Bopp-এর 'Comparative Grammar' এবং Max Muller-এর ভাষাতত্ত্বের উপর গ্রন্থ ভারতবর্ষে সে সময় বিশেষ পরিচিত থাকলেও Bopp-এর পর সে যুগে অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিতই যে ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে আরো অনেকটা অগ্রসর হয়েছিলেন সে কথা উনিশ শতকের বাঙালীর কাছে অজানা ছিল। এই প্রসংগে Schleicher-এর 'Compendium' (১৮৬২) এবং Brugmann-এর গ্রন্থের কথা স্মরণ করতে পারি।

সম্মত শাব্দিক পরিবর্তনের ধারা প্রদর্শন করেছেন :

সংস্কৃত	আবস্তিক	পারসীক	গ্রীক	লাটিন
দদামি	দধ্বামি	দেহম্	ডিডোমি	ডো
দদাসি	দধ্বাহি	দেহ	ডিডোমি	ডাস
দদাতি	দধ্বেভি	দেহদ্	ডিডোটি	ডাট···

ইত্যাদি।

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করবার পর লেখক ঋগ্বেদ এবং অবেস্তা-র ধর্মের সাদৃশ্য লক্ষ্য করছেন। বিভিন্ন আর্য ধর্ম ও আর্যভাষার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে তিনি বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

আর্যবংশীয়দের আদিম আর্য্য ভাষা যেমন বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রীক, লাটিন, কেলটিক ও টিউটোনিক, সংস্কৃত ও পারসীক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ভাষায় পরিণত হইয়াছে আদিম আর্যধর্মও সেইরূপ ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে।

(অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, উপক্রমণিকা, ১২৭৭ সংস্করণ, পৃ ১১)।

দ্বিতীয় ভাগের 'উপক্রমণিকা' অংশে লেখক আমাদের বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিচার করেছেন। উপক্রমণিকার গোড়ায় তিনি আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা এবং এই ক্ষেত্রে রামমোহনের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন। ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে লেখক আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পাশ্চাত্য গ্রন্থ বিশেষের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। গ্যেটে এবং গিবন[১২]-এর বক্তব্য তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত করেছেন। লেখক ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন :

·· যদিও বিশ্বকরণ অজ্ঞেয় স্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাচ সে বিষয়ে

১২. Gibbon-এর 'The Decline and Fall of the Roman Empire' সেযুগের বাঙালীকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। হেমাঙ্গ বসু এই গ্রন্থ অবলম্বনে লিখেছিলেন 'মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের সংক্ষেপ বিবরণ' (১৮৬৫)। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছিলেন :

তাঁহার নিজের পড়ার জন্ত তিনি যে বইগুলি সঙ্গে লইয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটা আমার চোখে খুব ঠেকিত। দশবারোখণ্ডে বাঁধানো বৃহদাকার গিবনের 'রোম'।

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পৃ ১৪০]।

চিন্তা না করিয়া একেবারে নিরস্ত থাকা উচিত নয়। তাহাতে স্থির নিশ্চয় হইবার উদ্দেশে যতদূর সাধ্য জানিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। জ্ঞানাচল আরোহণ করিতে করিতে যখন শিখরদেশ তিমিরময় কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন দেখিবে, তখন জানিবে আর আরোহণ করিবার অধিকার নাই।

(অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪৮-৪৯)।

এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে লেখক গোটের একটি উক্তি ব্যবহার করেছেন :

> Man is not born to solve the mystery of Existence ; but he must nevertheless attempt it, in order that he may learn how to keep within the limits of the knowable.
>
> (তদেব, পৃ ৪৯)

আলোচ্য গ্রন্থটির তৃতীয় ভাগ প্রকাশ করবার ইচ্ছা অক্ষয়কুমারের ছিল। তাঁর এই বাসনা পূর্ণ হয়নি। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপি থেকে কোন কোন প্রবন্ধ সংগ্রহ করে ১৮৯৮ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ (১৩০৫ সাল থেকে ১৩১৭ সাল)-এর মধ্যে, 'হিতৈষী', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩]

অক্ষয়কুমারের 'ধর্মনীতি' (১৮৫৫) গ্রন্থে ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা থাকলেও প্রসংগক্রমে সমাজতত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেছেন। বিবাহ এবং সংসার ধর্ম পালনের বয়স বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি আমাদের দেশীয় শাস্ত্র থেকে শুরু করে প্রতীচ্যের বিভিন্ন লেখকের মতামত পর্যন্ত পর্যালোচনা করেছেন। এই প্রসংগে লেখক প্লেটো এবং মাইকেল স্লিয়ান-এর মত উল্লেখ করেছেন।

অনেকে এই যুগের আর একজন বিশিষ্ট গদ্যকার বিদ্যাসাগরকে নিছক পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা এবং অনুবাদক বলে অভিহিত করে থাকেন। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ বিদ্যাসাগর গঠনশীল বাংলা গদ্যের তথা জাতীয় উন্নতির প্রয়োজনে একাধারে পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং বিভিন্ন ইংরেজি এবং সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে নিযুক্ত হয়েছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। যখন বাংলা গদ্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আপন রূপ অন্বেষণে সচেষ্ট তখন

১৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১৫), ৫ম সংস্করণ, পৃ ৬৮।

বিদ্যাসাগর গদ্যের গঠনকার্যের জন্যই বিশেষ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, সেই গদ্যের দ্বারা 'অকাজের কাজ' এবং 'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়' করবার অবকাশ পাননি। বাংলা গদ্য সাহিত্য গঠনের গুরু দায়িত্ব তিনি মাতৃভাষার প্রয়োজনে আপন স্কন্ধে নির্দ্বিধায় তুলে নিয়েছিলেন। অনুবাদ-কার্যে তিনি হাত দিয়েছিলেন মাতৃভাষার বিষয়-দৈন্য উৎসাদনের প্রেরণায়। বাংলা গদ্যের উন্নতির জন্য অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সে যুগে ছিল অসামান্য। এই অসামান্য প্রয়োজনীয় কাজে বিদ্যাসাগরের মতো একজন নিষ্ঠাবান ও শক্তিশালী গদ্যকার যে অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল বাংলা গদ্যের উন্নতির পক্ষে আশ্বাসপূর্ণ:

> বাঙলা ভাষায় উপযুক্ত পুস্তক নাই। এই পুস্তক ইংরেজি হইতে অনুবাদ করিতে হইবে। অনুবাদের দায়িত্ব দুই ভাষায় অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির উপর দেওয়া উচিত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপযুক্ত ব্যক্তি।১৪

বিবিধ ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণে বিদ্যাসাগরের যে সমস্ত গ্রন্থ জ্ঞানের সাহিত্য প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ছিল সে সমস্ত গ্রন্থ মূলতঃ ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতিবিষয়ক এবং জীবনচরিত বিষয়ক ছিল: বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ—১৮৪৮), বোধোদয় (১৮৫১), জীবনচরিত (১৮৪৯), চরিতাবলী (১৮৫৬)। তাছাড়া, আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৪) এবং কথামালা (১৮৭৬), একাধারে ছিল নীতিমূলক ও আখ্যানমূলক।

এই সমস্ত গ্রন্থের কোনটিই সম্পূর্ণতঃ আক্ষরিক অনুবাদ নয়। ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর প্রয়োজনমতো আক্ষরিক অনুবাদ, সারানুবাদ এবং ভাবানুবাদের পথে অগ্রসর হয়েছেন। আমাদের প্রয়োজন এবং পরিবেশের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজি গ্রন্থের অংশ বিশেষ বর্জন করেছেন।

অনুবাদক হিসাবে অক্ষয়কুমারের সংগে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভংগীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অক্ষয়কুমারও ইংরেজি থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রে দেশের প্রয়োজন ও পরিবেশের দিকে দৃষ্টি রেখে ইংরেজি গ্রন্থের অংশবিশেষ গ্রহণ ও বর্জনের নীতি অনুসরণ করেছিলেন:

> যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত, কিন্তু দেশীয়

১৪. সংবাদ প্রভাকর, ৯ই বৈশাখ, ১২৫৬ সাল (১৮৪৯)।

লোকের পক্ষে সেরূপ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে যে সকল উদাহরণ এ দেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে।

(অক্ষয়কুমার দত্ত, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ১ম ভাগ, বিজ্ঞাপন)

বিদ্যাসাগরও 'ঈশপ্‌স্ ফেবুল্‌স্'-এর অনুবাদ প্রসংগে এই একই ধরণের আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়ে গ্রহণ-বর্জনের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি ঈশপ-এর সমস্ত গল্প অনুবাদ না করার কারণ হিসাবে 'বিজ্ঞাপনে' বলেছিলেন 'এতদ্দেশীয পাঠকবর্গের পক্ষে, সকল গল্পগুলি তাদৃশ মনোহর' বলে মনে হবে না। বিদ্যাসাগর যেখানেই অনুবাদ করতে সচেষ্ট হয়েছেন সেখানেই দেশীয রূপদানের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন।

ইংরেজি থেকে বাংলায় বিদ্যাসাগরের প্রথম অনূদিত গ্রন্থ 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয় ভাগ—১৮৪৮)। গ্রন্থটি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় রচিত স্বল্প কয়েকটি ইতিহাস গ্রন্থের অন্যতম। যে কয়টি ইতিহাস প্রাচীন এবং মধ্যযুগে সংস্কৃত অথবা ফারসী ভাষায় লেখা হয়েছিল, সেগুলোর অধিকাংশই ছিল জীবনীমূলক। প্রায়শঃই রাজা-বাদশার প্রশস্তি কীর্তনই ছিল সে সমস্ত গ্রন্থের মূল লক্ষ্য। কিন্তু বাংলায় এই ধরণের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টারও অভাব ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজি ইতিহাসগ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে তথ্যভিত্তিক এবং বিশ্লেষণাত্মক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত ঘটে বাংলা গদ্যে।

বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয় ভাগ) 'শ্রীযুক্ত মার্শমন রচিত ইংরেজি গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বন পূর্ব্বক সঙ্কলিত, ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে'।

(বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ বিজ্ঞাপন)।

'বোধোদয়' গ্রন্থটি বিদ্যাসাগর মূলতঃ চেম্বার্স[১৫]-এর গ্রন্থ অনুসরণে রচনা করেন। মূলতঃ বলবার কারণ,* চেম্বার্স এর, উল্লিখিত গ্রন্থটি ছাড়াও অন্যান্য

১৫. চেম্বার্স-এর রচনার প্রতি বিদ্যাসাগরের প্রীতি ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে চেম্বার্স বিরচিত কতিপয় পুস্তক স্থান লাভ করেছিল: Scientific Reader / A Biographical Dictionary of Eminent Scotsmen / Encyclopaedia of English Literature / Information for the People.

[বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'বিদ্যাসাগর সংগ্রহে' গ্রন্থগুলি রক্ষিত আছে]

গ্রন্থের সহায়তা তিনি পেয়েছিলেন। প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' অংশে তিনি স্পষ্টই বলেছেন :

বোধোদয নানা ইংরেজি পুস্তক হইতে, সঙ্কলিত হইল, পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে।

গ্রন্থটি বিজ্ঞানমূলক ; কিন্তু, অক্ষযকুমারের 'পদার্থবিদ্যা'র মতো বিজ্ঞানের বিশেষ একটি শাখার বিশদ আলোচনা নয়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু (content) বিবিধ ও বিচিত্র :

পদার্থ, ঈশ্বর, চেতন পদার্থ, মানবজাতি, ইন্দ্রিয়, বাক্যকথন : ভাষা, কাল, গণনা : অঙ্ক, বস্তুর আকার ও পরিমাপ, ধাতু : স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ প্রভৃতি, ক্রয়-বিক্রয়-মুদ্রা, জল-নদী-সমুদ্র, উদ্ভিদ, ইতর জন্তু, কৃষিকর্ম, শিল্প-বাণিজ্য-সমাজ ইত্যাদি॥

এই বিবিধ বিষয়বস্তু অনুসরণ করে এই গ্রন্থটিকে সাধারণ জ্ঞানের একটি প্রাথমিক গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করা চলে। অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ' (তিন ভাগ) গ্রন্থের অপর একটি ভাগ বলে এই গ্রন্থটিকে মনে হয়। সে যুগে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব মোচনের জন্য যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই বিষয়বস্তুর জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন ইংরেজি ভাণ্ডারের দিকে।

বিদ্যাসাগরের 'শিশুশিক্ষা' চেম্বার্স সাহেবের 'রুডিমেণ্ট্‌স্ অব নলেজ' গ্রন্থের অনুসরণে বিরচিত।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নামে প্রকাশিত 'নীতিবোধ' (১৮৫১) গ্রন্থটি চেম্বার্স-এর 'মরাল ক্লাস বুক' গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত। এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিদ্যাসাগর-বিরচিত :[১৬]

পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, সুচিন্তা, স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়।

প্রস্তাবগুলি নীতিমূলক এবং ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের পূর্বসূরী হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

বিদ্যাসাগরের 'জীবনচরিত' গ্রন্থটি চেম্বার্স-এর 'বায়োগ্রাফি গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটির 'বিজ্ঞাপনে' এই কথা উল্লিখিত :

রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভবদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলন

১৬ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতিবোধ,, ১ম সংস্করণ, বিজ্ঞাপন।

> করিয়া ইংরেজি ভাষায় যে জীবনচরিত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইলে এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে ঐ আশায় আমি ঐ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

উদ্দেশ্য এখানেও সেই একই। জাতীয় উন্নতির প্রয়োজনে প্রতীচ্যের বিজ্ঞানীদের জীবনাদর্শ তুলে ধরা। গ্রন্থটিতে বিজ্ঞানীদের জীবনচরিত বর্ণনা প্রসংগে তাঁদের আবিষ্কার সম্বন্ধে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য তিনি সরলভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

> গ্যালিলিয় এই দৃষ্টিপোষক নলাকার নূতন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রযোগ করিযা দেখিতে পাইলেন, চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর, সূর্য্যমণ্ডল সময় সময় কলঙ্কিত হয, ছাযাপথ সূক্ষ্ম তারকাস্তবকমাত্র, বৃহস্পতি পারিপার্শ্বিক চতুষ্টযে পরিবেষ্টিত, শুক্র গ্রহের চন্দ্রের ন্যায হ্রাসবৃদ্ধি আছে; শনৈশ্চরের উভয় পার্শ্বে পক্ষাকার কোন পদার্থ আছে। ঐ পক্ষ এক্ষণে অঙ্গুরীয় বলিযা সিদ্ধান্তিত হইযাছে। (গ্যালিলিয)

'জীবনচরিত' গ্রন্থের প্রস্তাবগুলির মধ্যে রযেছে : নিকোলাস কোপার্নিকাস, গ্যালিলিয়, সর আইজাক নিউটন, সর উইলিয়ম হর্শেল ইত্যাদি।

সুতরাং গ্রন্থটি একাধাবে জীবনচরিতমূলক এবং বিজ্ঞানমূলক। জীবনচরিত হলেও সরলভাবে প্রতীচ্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করা এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বাংলা গদ্যে বিজ্ঞানের তথ্য পরিবেশনার এই ধারা 'দিগদর্শন' সামযিক পত্রিকা থেকে শুরু করে অক্ষযকুমার, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রকট হযে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞানরহস্য' এই ধারার একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ[১৭]। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করার ব্যাপারে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সমিতি এবং বেথুন সোসাইটির অবদান কম ছিল না[১৮]।

বিদ্যাসাগর 'চরিতাবলী' (১৮৫৬)-তে বিভিন্ন মহানুভব ব্যক্তির জীবন-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। 'জীবনচরিত' গ্রন্থে বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের প্রসংগ উপস্থিত করা হয়েছে; 'চরিতাবলী'তে পরিবেশন করা হয়েছে বিভিন্ন

---

১৭. বর্তমান গ্রন্থের ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৮. বর্তমান গ্রন্থের ২য় অধ্যায়, পৃ ১৬।

কর্মী পুরুষের কৃতিত্বের কাহিনী। এই সমস্ত কর্মীপুরুষ সকলেই বিদেশের। গ্রন্থটি একাধারে জীবনচরিতমূলক এবং নীতিধর্মী, মূল প্রতিপাদ্য—পরিশ্রম, সাধনা এবং অধ্যবসায় দ্বারা মানুষ কিভাবে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে স্থানপ্রাপ্ত চেম্বার্স-এর 'এ বায়োগ্রাফিক্যাল ডিক্শেনারি অব এমিনেণ্ট স্কট্স্মেন' গ্রন্থটির কিছুটা অনুসরণ করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের 'আখ্যানমঞ্জরী' (তিনভাগ) 'চরিতাবলী'-র মতোই নীতিধর্মী। এই গ্রন্থটি বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুসরণে রচিত। এই ধরণের নীতিধর্মী গ্রন্থ ইংরেজি তথা খ্রীষ্টিয় আদর্শ অনুসরণে রচিত হয়েছে। গ্রন্থটির কয়েকটি প্রস্তাবের শিরোনামা লক্ষ্য করলেই নীতিধর্মিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

প্রত্যুপকার, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, লোভ সংবরণ, গুরুভক্তি, আতিথেয়তা, প্রভুভক্তি ও দয়াশীলতা ইত্যাদি। [১ম ভাগ]।

দয়া ও দানশীলতা, যথার্থ পরোপকারিতা, দয়া ও সদ্বিবেচনা, অমায়িকতা ও উদারচিত্ততা, যথার্থবাদিতা ও অকুতোভয়তা ইত্যাদি। [২য় ভাগ]

যথার্থ বদান্যতা, পতিপরায়ণতার একশেষ, চাতুরীর প্রতিফল, সৌভ্রাত্র্য, মহানুভবতা ইত্যাদি। [৩য় ভাগ]

বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত 'ভুবনের গল্প' শীর্ষক কাহিনীটি ঈশপের 'দি থিফ্ এ্যাণ্ড হিজ্ মাদার' গল্পের অনুসরণ। বঙ্কিম যুগে বিদ্যাসাগর ঈশপের গল্পের অনুবাদ করে 'কথামালা' (১৮৭৬) নামে প্রকাশ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবৃন্দ বিশেষ আয়াস সহকারে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সংগে সুপরিচিত হয়েছিলেন এবং অনেকেই সংস্কৃত গ্রন্থের পাশাপাশি বহু ইংরেজি গ্রন্থের অনুসরণে বাংলা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যে সমস্ত গদ্যশিল্পী ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণের মাধ্যমে আলোচ্য যুগে জ্ঞানের সাহিত্যের ধারা পরিপুষ্ট করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রামকমল ভট্টাচার্য, দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণ, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রামকমল ভট্টাচার্যের 'বেকন, অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ' অনুবাদ-গ্রন্থ। বেকন-এর কতিপয় প্রবন্ধের এখানে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করা হয়েছে :

> Of Great Place : উচ্চপদ / Of Expence : ব্যয় / Of Goodness and Goodness of Nature : ভব্যতা ও শিষ্টাচার / Of Religion of Health : স্বাস্থ্যরক্ষা / Of Youth and Age : যৌবন ও জড়া / Of Travaile : পর্যটন / Of Envie : অসূয়া, মাৎসর্য্য / Of Unitie in Religion : শাস্ত্রচর্চা / Of Judicature : ব্যবহার দর্শন / Of Fortune : সৌভাগ্য / Of Seeming Wise : বিজ্ঞতা / Of Delaies : দীর্ঘসূত্রিতা / Of Parents and Children : সন্তান / Of Suspicion : সন্দেহ ॥

ফ্রান্সিস বেকন-এর 'এ্যাডভান্সমেণ্ট অব্ লার্নিং' গ্রন্থটি 'সুবুদ্ধিব্যবহার' (১৮৬০) শিরোনামায় বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি বলেছেন :

> লর্ড বেকনের প্রণীত এডবান্সমেণ্ট অব লার্ণিং নামে যে গ্রন্থ আছে বেকন তাহাতে সলোমন প্রভৃতির কয়েকটি উপদেশ বাক্যের ব্যাখ্যা আমি সেইগুলি অনুবাদ করিযা সুবুদ্ধি ব্যবহার নাম দিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এতৎ পাঠে বালকদিগের ধর্মনীতি, নীতি ও রাজনীতি জ্ঞানের সম্ভাবনা আছে।

বেকন আমাদের চিন্তাজগতে সে যুগে যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন তারই ফলশ্রুতি হিসাবে উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। একসময় রামমোহন কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির কর্মকর্তাদের বেকন-এর 'নোভাম্ অর্গেনাম্' গ্রন্থটি অনুবাদ করতে উৎসাহিত করেছিলেন[১৯] এবং লর্ড আমহার্স্ট'কে লিখিত পত্রে 'Baconian Learning' এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় বেকন দীর্ঘদিন উপস্থিত ছিল। বিদ্যাসাগরও ছিলেন বেকন-এর একজন পরম ভক্ত। 'নোভাম্ অর্গেনাম্' গ্রন্থটি সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করবার জন্য তিনি সুপারিশ করেছিলেন। পরবর্তী-কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বেকন-এর 'এ্যাডভান্সমেণ্ট অব্ লার্নিং' কথাটি প্রতীক চিহ্নে স্থান দিয়েছে।

১৯. Mazumdar, J. K., Raja Rammohan Roy and Progressive Movements in India, Introduction, first edition, p xivi.

বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণে এ যুগে যে সমস্ত ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (প্রথম ভাগ), হেমাঙ্গচন্দ্র বসুর 'মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের সংক্ষেপে বিবরণ' এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'রোমরাজ্যের ইতিহাস' এবং 'গ্রীসদেশের ইতিহাস' উল্লেখযোগ্য।

প্রথম গ্রন্থটি মার্শম্যান সাহেবের 'আউটলাইন হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল'-এর প্রথম আটটি অধ্যায়ের অনুবাদ; 'মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের সংক্ষেপ বিবরণ' গিবন-এর ডিক্লাইন এ্যাণ্ড ফল্ অব্ দি রোমান এম্পায়ার' অবলম্বনে রচিত, 'রোমরাজ্যের ইতিহাস' লিওনার্ড স্মিট্জ্ ও টমাস আনল্ড-এর রোমীয় ইতিহাস এবং লিওনার্ড স্মিট্জ্-এর গ্রীসদেশীয় ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

সংস্কৃত কলেজ গোষ্ঠীর লেখক ছাড়া অনুবাদক হিসাবে হরচন্দ্র দত্ত এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম স্মরণীয়। হরচন্দ্র দত্ত মেকলের 'লাইফ্ অব্ রবার্ট ক্লাইব' গ্রন্থটি অবলম্বনে রচনা করেছিলেন 'লর্ড ক্লাইব' (১৮৫২) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'শিল্পিক দর্শন' গ্রন্থটি বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত একটি বিজ্ঞানমূলক রচনা। রাজেন্দ্রলালের 'প্রাকৃত ভূগোল'ও এ প্রসংগে স্মরণীয়।

খ. অনুবাদ ও অনুসরণ : ভাবের সাহিত্য :

এই যুগে, বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণের মাধ্যমে যাঁরা বাংলা গদ্যকে ভাবের সাহিত্যে উন্নীত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এবং মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। ইংরেজি সাহিত্যে সুপরিচিত নানা আখ্যান-উপাখ্যানের অনুবাদ ও অনুসরণ করে তাঁরা আমাদের ভাবের সাহিত্যের বাতায়ন খুলে দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯) সেক্সপীয়র-এর 'দি কমেডি অব্ এরারস্'-এর গদ্যানুবাদ। নাটকীয় আংগিক পরিহার করে বিদ্যাসাগর তাঁর রচনাটি বিবৃতিমূলকতা আশ্রয় করে, কাহিনী আকারে সজ্জিত করেছেন। বিদ্যাসাগর যখন 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনায় হাত দিয়েছেন তখন তিনি গদ্যকার হিসাবে প্রবীণত্ব অর্জন করেছেন। সুতরাং, সেক্সপীয়র-এর নাটক অনুবাদের মতো সুকঠিন কার্যে তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। 'সেক্সপীয়রের নাটকগুলিকে

সংগেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি এক সময় শোভাবাজারের আনন্দকৃষ্ণ বসুর কাছে অত্যন্ত মনোযোগের সংগে সেক্সপীয়র-পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।[২০]

বিদ্যাসাগরের এই গ্রন্থটি সেক্সপীয়র-এর নাটকটির অবিকল অনুবাদ নয়। তিনি বাংলা ভাষায় 'দি কমেডি অব এর্‌রাস্‌'-এর নাট্যরূপ দান করেননি। সেক্সপীয়র-এর নাটকের পাঁচটি অংকের বিষয়বস্তু তিনি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিধৃত করেছেন এবং কখনো আক্ষরিক অনুবাদ কখনো ভাবানুবাদ আবার কখনো সারানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কাহিনী পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর দেশীয় রঙ ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রন্থটি বাঙালীর মনের দ্বারে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। 'ভ্রান্তিবিলাস' একটি বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ বলে মনে হয় না। পাত্র-পাত্রী এবং স্থানের নাম তিনি পরিবর্তন করেছেন এবং য়ুরোপীয় নামের পরিবর্তে বাঙালী নাম ব্যবহার করেছেন।

বিদ্যাসাগরের অনুবাদের একটু নমুনা এখানে তুলে ধরছি :

বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

> চিরঞ্জীব বলিলেন, দেখ কিঙ্কর! যত শীঘ্র জাহাজে উঠিতে পারি ততই মঙ্গল, এখানকার যেরূপ কাণ্ড তাহাতে কখন কি উপস্থিত হয় বলা যায় না। অতএব চল, পান্থনিবাসে গিয়া দ্রব্য সামগ্রী লইয়া সন্ধ্যার মধ্যেই জাহাজে উঠিব।
>
> (৪র্থ অধ্যায়)

[Ant. S, Come to the Contaur ; fetch our stuff from thence.
I long that we were safe and sound abroad.

... ... —

Ant. S. I will not stay to-night for all the town
Therefore away, to get our stuff abroad.

(Act IV, Sc. 4)]

সেক্সপীয়র-এর বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি যে একটি মূল্যবান সংযোজন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনার পূর্বে

২০ বিহারীলাল মিত্র, বিদ্যাসাগর, ১ম সংস্করণ, পৃ ১২৩।

মাত্র চার পাঁচখানি সেক্সপীয়র-এর নাটকের বাংলা রূপ দানের চেষ্টা করা হয়।[২১] পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্র এবং কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেক্সপীয়র-এর নাটকের বাংলা রূপদানে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ' (তৃতীয় ভাগ) গ্রন্থটির 'স্বপ্নদর্শন' শীর্ষক নিবন্ধের তিনটি ভাগ ভাবের সাহিত্যের অন্তর্গত। এ্যাডিসন (Addison) বাঙালীর ভাবজগতে দীর্ঘদিন সক্রিয় ছিলেন। বাঙালীর এ্যাডিসন-প্রীতির পরিচয় বহন করে অক্ষয়কুমারের উল্লিখিত রচনাটি। রচনাটি এ্যাডিসন-এর 'Vision of Mirza' অনুসরণে সুলিখিত। এ্যাডিসন-এর পথ অনুসরণ করে বাংলা গদ্য সাহিত্য এখানে কল্পনা ও ভাবের জগতে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মূল ফরাসী গ্রন্থ[২২] থেকে বাংলায় অনুবাদ করে তিনি 'পৌলবর্জিনী' (১৮৬৮-৬৯) নামে প্রকাশ করেছিলেন। প্রকৃতির পটভূমিকায় উপস্থাপিত এই রোমান্টিক আখ্যায়িকা একদা রবীন্দ্রনাথের কিশোর চিত্ত হরণ করেছিল।[২৩] ইতিপূর্বে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণে বাংলায় রচনা করেছিলেন 'পাল ও বর্জিনিয়া ইতিহাস' (১৮৫৬)।

কণ্টর-এর 'রোমান্স অব হিষ্ট্রি' গ্রন্থটির বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে বিরচিত গ্রন্থগুলি বাংলা গদ্যে রোমান্স-জাতীয় রচনার সূত্রপাত করেছিল। এই প্রসংগে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (ঐতিহাসিক উপন্যাস-১৮৫৬) এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৭-৫৮) ও 'বিচিত্রবীর্য' গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি আদর্শে রোমান্স রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) পূর্বসূরী হিসাবে এই গ্রন্থগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২১. টেম্পেস্ট: সঙ্কটন (১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লিপি লেখক থাকা কালে এই নাটকটি তিনি অনুবাদ করেন); ভানুমতী চিত্তবিলাস (The Merchant of Venice): হরচন্দ্র ঘোষ; চারুমুখ চিত্তহরা (Romeo & Juliet): হরচন্দ্র ঘোষ; সুশীল বীরসিংহ নাটক (Cymbeline): সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; কুসুমকুমারী (Cymbeline); চন্দ্রকান্ত ঘোষ—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই নাটকগুলি প্রকাশিত হয়। (বসুমতী, সেক্সপীয়র চতুর্থ জন্ম শত-বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ)।

২২. Bernandin de Saint Pierre. Paul et Virginie (1787).

২৩. রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, পৃ ৭৭।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন ইংরেজি সাহিত্যকুঞ্জ থেকে বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি পুষ্প চয়ন করেছিলেন। তাঁর 'রাসেলাস' (১৮৫৭) জনসন্-এর 'রাসেলাস : দি প্রিন্স অব আবিসিনিয়া' গ্রন্থটি অবলম্বনে বিরচিত। তারাশঙ্করের পূর্বে কালী কৃষ্ণ দেব এই গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন (১৮৩৩)।

আরও কয়েকটি ইংরেজি থেকে অনূদিত গ্রন্থ বাংলা গদ্যে কাহিনীরস পরিবেশনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বসুপালিতোপাখ্যান' (১৮৫৮) বোকাসিও-র 'দি ডেকামেরন' গ্রন্থের অষ্টম উপাখ্যান (সেকেণ্ড ডে : নভেল—VIII)-এর ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণে লিখিত। লেখক দেশীয় পরিবেশের রঙে রঞ্জিত করে এই বিদেশী উপাখ্যান পরিবেশন করেছেন। কাহিনীর কাঠামো বজায় রেখে তিনি পাত্র-পাত্রী এবং স্থানের নাম পরিবর্তন করে কাহিনীটির বিদেশী চেহারার রূপান্তর সাধন করেছেন। ইংল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বিদেশী স্থানের পরিবর্তে তাঁর কাহিনীতে কলিঙ্গ, সুহ্ম, কেরল, কামরূপ প্রভৃতি স্থানের নাম ব্যবহৃত হয়েছে। কাউন্ট অ্ এ্যাঙ্গিয়ার্স হয়েছেন বসুপালিত।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফরাসী কবি ফেনেলন-বিরচিত 'টেলিম্যাক্' (Telemaque) গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে 'টেলিমেকাস' (১৮৫৮-১৮৬০) রচনা করেন। লেখক 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন :-

> এই অনুবাদ অবিকল নহে ; আমার ক্ষমতা এবং বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা অনুসারে যতদূর সম্ভাবিতে পারে, মূলের তাৎপর্য্য মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।

টেলিমেকাস উপাখ্যানের সংগে এ দেশীয় পাঠকবর্গের পরিচিতির অভাবের জন্য রাজকৃষ্ণ 'পূর্ব্ববৃত্তান্ত' উপক্রমণিকায় সংক্ষেপে সংকলিত করেছেন।

হোমার-এর মহাকাব্য 'ইলিয়াড' বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেছিলেন মধুসূদন। মধুসূদন পাত্র-পাত্রী এবং স্থানের নামের পরিবর্তন করেননি ; কিন্তু বাঙালী পাঠকদের হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য 'উপক্রমণিকা' অংশে 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের ঘটনাদির সংগে আমাদের 'মহাভারত'-এর ঘটনাবলীর সাদৃশ্য প্রদর্শন করেছেন। মধুসূদন এই গ্রন্থটি মূল গ্রীক ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি অনুবাদ না বলে অনুসরণ বা অবলম্বন হিসাবে গ্রহণীয়। মূলের কোন কোন অংশ মধুসূদন বর্জন করেছেন এবং 'ইলিয়াস' নগরীর কাহিনী 'ইলিয়াড' না হয়ে নায়কের নাম অনুসারে করা হয়েছে 'হেক্টর বধ' (১৮৭১)। বাংলা গদ্য সাহিত্যে এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে

একটি মূল্যবান সংযোজন। কিন্তু, সে যুগের একটি সাময়িক পত্রিকায় মূল গ্রীক ভাষা থেকে অনূদিত বলে মধুসূদনের দাবির প্রতিবাদ করা হয়েছে।[২৪] বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণে অপর যে সমস্ত উপাখ্যান বাংলা গদ্যে এ যুগে রচিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে গুরুদাস হাজরার 'রোমিও জুলিয়েটের মনোহর উপাখ্যান' (১৮৪৮), এডওয়ার্ড রোয়ের কর্তৃক 'ল্যাম্বস্ টেল্স্ ফ্রম সেক্সপীয়র' গ্রন্থের নয়টি কাহিনীর অনুবাদ (১৮৫২), জন রাবিনসন্-এর 'রাবিনসন ক্রুশোর জীবনচরিত' (ডেনিয়াল ডিফো-র রবিনসন ক্রুশো-র অনুবাদ) এবং নীলমণি বসাক কর্তৃক 'দি এ্যারাবিয়ন নাইট্স্'-এর বাংলা অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণের মাধ্যমে বাংলা গদ্যে শিশুদের রূপকথা ও উপকথার জগৎ, বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে, উপস্থিত করেছিলেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

রেভারেণ্ড জেম্স্ লঙ-এর ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন 'ক্রীলফের নীতিগল্প' (১৮৭০)। রুশদেশে ক্রীলফের গল্প বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। আমাদের দেশের 'হিতোপদেশ' ও 'পঞ্চতন্ত্র' এবং গ্রীসদেশের ঈশপের গল্পের মতোই ক্রীলফের গল্পগুলি ছিল মূল্যবান। 'ক্রীলফের নীতিগল্প' থেকে কয়েকটি শিরোনামা উদ্ধৃত করছি :

গর্দ্দভ ও বুলবুল বোঁত্তা, অথবা অযোগ্য বিচারক / দুইটি পিপা, অথবা কথায় কিন্তু কার্য্যে নয় / টাকা, অথবা ব্যবহার ভ্রষ্ট যুবক / বোয়াল মৎস্য, অথবা ধনীর দণ্ড / বিড়াল এবং পাচক ব্রাহ্মণ, অথবা কার্য্যে প্রয়োজন কথায় নহে / চকমকি প্রস্তর ও হীরা, অথবা আত্মশ্লাঘার ভৎর্সনা ইত্যাদি॥

২৪. Why the author of this abstract...should have said on the title page that he had rendered it from the Greek we are at a loss to understand : for the performance before us is neither a translation nor a paraphrase of the original Iliad. We have compared some portion of the version before us with the original and have found that whole passages have been omitted and others freely tampered with, apparently for no intelligible reason......(Calcutta Review, Critical Notices, Vol LIV, 1872).

কাহিনীর শিরোনামাগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে অনুবাদক কাহিনী গুলির বাঙালী রূপদানে সচেষ্ট ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'নানাবিধ' শিরোনামায় মধুসূদন মুখোপাধ্যায়-এর যে বিভিন্ন রূপকথা-উপকথার সংকলন রক্ষিত আছে সেগুলি ১৮৫৭ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। কাহিনীগুলি হান্স এণ্ডারসেন-এর বিভিন্ন রূপকথাধর্মী রচনার বাংলা অনুবাদ। কাহিনীগুলির শিরোনামা :

মরমেড অর্থাৎ মৎস্যনারীর উপাখ্যান (১৮৫৭)

চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষীর বিবরণ (১৮৫৭)

কুৎসিত হংসশাবক ও খর্ব্বকায়ার বিবরণ (১৮৫৮)

বায়ুচতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা (১৮৫৮)

পুত্র শোকাতুরা দুঃখিনী মাতা এবং নায়ক শোকাতুরা দুঃখিনী নায়িকা (১৮৫৮)

চকমকি বাক্স এবং অপূর্ব্ব রাজবস্ত্র (১৮৫৮)

হংসরূপী রাজপুত্র (১৮৫৯)

ছোট কৈলাস এবং বড় কৈলাস (১৮৬০)

অবোধ (১৮৬০)

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় লিখিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে স্যাণ্ডফোর্ড ও মার্টন অবলম্বনে 'কথাতরঙ্গ' (১৮৬৫) উল্লেখযোগ্য। এই যুগে ইংরেজি রূপকথা জাতীয় গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত আরো দুইটি গ্রন্থের নাম স্মরণীয় : হানা মূর-এর 'দি শেফার্ড অব্ দি স্যালিসবারি প্লেইন'-এর বাংলা অনুবাদ 'মেষপালক বিবরণ' এবং লেরিচমণ্ড-এর ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'ছোটজেন'।[২৫]

ইংরেজি থেকে অনূদিত এই সমস্ত গ্রন্থ বাংলা গদ্যকে ভাবের সাহিত্যে উন্নীত করতে সাহায্য করেছিল। বিভিন্ন ধরণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে বিরচিত এই গ্রন্থগুলি বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা প্রবর্তনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। এই পর্যায়ের অনেকগুলি বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদই স্বদেশীয় পোষাকে বিভূষিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রায় মৌলিকধর্মী রচনায় পরিণত হয়েছিল।

বিবিধ বিষয়ক এই সমস্ত অনুবাদের মূল্য অপরিসীম :

যাহারা গত অর্দ্ধ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের আশ্চর্য উন্নতির কারণ

২৫. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এই গ্রন্থটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ('বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' [illegible])।

অনুসন্ধান করিবেন, আমাদিগের বিশ্বাস, তাঁহারা বঙ্গভাষায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবকে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। এই নূতন যুগের প্রথম অবস্থায় ইংরাজী গ্রন্থাদির অনুবাদ যে সাহিত্যের কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে অনুভব করা অসম্ভব। বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মগণ ইংরাজী গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া যে সকল বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার সকলগুলি বর্ত্তমান যুগে সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত না হইলেও, সে সময় ভাষা গঠনে, রচনা পদ্ধতি প্রচলনে এবং জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিতরণে অল্প সাহায্য করে নাই।[২৬]

তিন

সাময়িক পত্র :

ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যে সাময়িক পত্রের উদ্‌বোধন হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে[২৭]। জ্ঞানপ্রচার এবং ধর্মপ্রচার এই পর্যায়ের সাময়িক পত্রাদির মূল লক্ষ্য ছিল। সাংবাদিকতা বা 'জার্নালিজম্'-এর আদর্শ সেই সময়েই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আলোচ্য পর্যায়ে, জ্ঞানমূলক এবং সংবাদমূলক রচনার পাশাপাশি সাময়িক পত্রিকা আশ্রয় করে সাহিত্য সমালোচনার ধারা গড়ে উঠল। তাছাড়া, সাহিত্যধর্মী নানা আলোচনাও ক্রমশঃ সাময়িক পত্রিকার পাতায় স্থান লাভ করল।

অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) ব্রাহ্মধর্মের মুখপাত্র হিসাবে প্রকাশিত হলেও ধর্মচর্চা অপেক্ষা জ্ঞানচর্চাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ গ্রন্থই যেমন জ্ঞানের সাহিত্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ছিল তেমনিই অক্ষয়কুমারের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ও জ্ঞানের বিষয়কেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র কতিপয় 'প্রস্তাব' উল্লেখ করছি :

[১] পদার্থবিদ্যা / জ্যোতিষ, (পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে আলোচনা)

—৪৭ সংখ্যা।

২৬/ মন্মথনাথ ঘোষ, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, ১ম সংস্করণ, পৃ ৫৫-৫৬।

২৭. বর্তমান গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়, পৃ ৭৭-৭৮।

[২] পদার্থবিদ্যা / জ্যোতিষ, (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের আলোচনা)
—৫১ সংখ্যা।

[৩] পদার্থবিদ্যা / জ্যোতিষ, (চন্দ্র সম্বন্ধীয় আলোচনা)
—৫৪ সংখ্যা।

[৪] পদার্থবিদ্যা / জ্যোতিষ, (গ্রহণ সম্বন্ধীয় আলোচনা)
—৫৮ সংখ্যা।

[৫] ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের পূর্ব্বকালীন বাণিজ্যের বিবরণ
—৭৮ সংখ্যা।

বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যবান প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। অক্ষয় কুমারের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এর অনেকগুলি প্রবন্ধ, 'ধর্মনীতি' এবং 'চারুপাঠ' গ্রন্থের প্রবন্ধাবলী সর্বপ্রথম 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।

প্রতীচ্যের জ্ঞানের বিষয় পরিবেশনে এই যুগের কয়েকটি সাময়িক পত্রের অবদান অবিস্মরণীয়। এই প্রসংগে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৮৪৬) উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মোটামুটি তিন মাস অন্তর এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। সমসাময়িক সংবাদ পরিবেশন নয়, জ্ঞান পরিবেশনই এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বারটি খণ্ডের বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীবনী ও নীতিকথা এবং মনস্তত্ত্ব ও দর্শনমূলক রচনা :

১৮৪৬ : ১. রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত ২. ক্ষেত্রতত্ত্ব
৩. বিবিধ বিষয়ক পাঠ ৪. রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত
১৮৪৭ : ৫. জীবনবৃত্তান্ত ৬. ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত
৭. বিবিধ বিষয়ক পাঠ
১৮৪৮ : ৮. ভূগোল বৃত্তান্ত ৯. ক্ষেত্রতত্ত্ব
১৮৪৯ : ১০. নীতিবোধক ইতিহাস ১১. চিত্তোৎকর্ষ বিধান
১২. চিত্তোৎকর্ষ বিধান[২৮]

(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র,
১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ৮৬-৮৭)

উইলিয়ম কেরি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'এগ্রিকাল্চারাল্ এ্যাণ্ড হর্টিকাল্চারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া' (১৮২০)-র আনুকূল্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্পাদনায়

২৮. Isaac Watts-এর 'Improvement of the Mind'-এর অনুবাদ।

'ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ' (১৮৫৩) প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় 'দি ট্রানজাকশনস্ এ্যাণ্ড জার্নাল্স্'-এর প্রবন্ধাদি অনুবাদ করে প্রকাশিত হয়। আর পূর্ববর্তী পর্যায়ে প্রকাশিত 'পশ্বাবলী' পত্রিকার সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র, এই পর্যায়ে, 'পক্ষীর বিবরণ' (১৮৪৪) প্রকাশ করেছিলেন।

এই যুগের কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা ইংরেজি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্য সমালোচনার ধারা প্রবর্তন করেছিল। এই প্রসংগে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) এবং 'সংবাদ প্রভাকর' (মাসিক পত্রিকা)-এর নাম স্মরণীয়। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় নানা বিষয়ের জ্ঞান থেকে শুরু করে নীতি ও ধর্মবিষয়ক রচনার সংগে সংগে নতুন গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হত। নতুন গ্রন্থের সমালোচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারার সূত্রপাত ঘটে।

'সংবাদ প্রভাকর' প্রাত্যাহিক পত্রে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হত। ১২৬০ সালের (১৮৫৩ খ্রীঃ) বৈশাখ মাস থেকে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর একটি মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। এই মাসিক পত্রিকায় ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন কবিদের অপ্রকাশিত রচনা এবং জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী উপকার করে গিয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্ত এই পর্যায়ে রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত, রাম বসু, গোজলা গুঁই, হরু ঠাকুর প্রভৃতির জীবনী আলোচনা করেছেন। এই ধরণের রচনা তখন বাংলা সাহিত্যে ছিল সম্পূর্ণ নতুন। এই প্রসংগে জন্সন্-এর 'দি লাইভ্স্ অব পোয়েট্স্' গ্রন্থটি স্মরণে আসে। ঈশ্বর গুপ্তের ইংরেজি জ্ঞান খুব বেশী ছিল না; সুতরাং জন্সন্-এর গ্রন্থটি তিনি পড়েছিলেন এমন ধারণা করা যায় না। কিন্তু, এই গ্রন্থটির পরোক্ষ প্রভাবে এই ধরণের আলোচনার সূত্রপাত বাংলা সাহিত্যে হয়ে থাকতে পারে। বিশেষতঃ উনিশ শতকের এই সময়টিতে জন্সন্-এর বিভিন্ন রচনার সংগে বাঙালী ছাত্রসমাজ সুপরিচিত[২৯] ছিল এবং জন্সন-এর 'রাসেলাস: দি প্রিন্স অব্ আবিসিনিয়া' গ্রন্থের একটি বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল।[৩০]

আলোচ্য পর্যায়ে, এ্যাডিসন-এর স্পেকটেটর পত্রিকার আদর্শ অনুসরণে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'বিচারক' (১৮৫৮) পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা

২৯. বর্তমান গ্রন্থের ২য় অধ্যায়; পৃ ১০, ১৫

৩০ বর্তমান অধ্যায়, পৃ ৮৩ দ্রষ্টব্য।

প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার আদর্শ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছিলেন ঃ

> ইহা এ্যাডিসনের স্পেকটেটরের ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ থাকিত।৩১

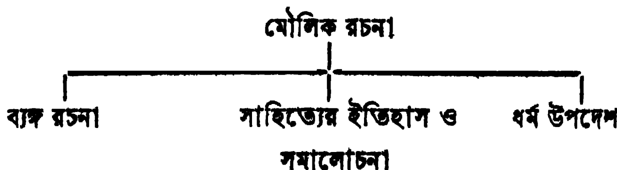
সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে 'অবোধবন্ধু' (১৮৬৩) সে যুগে বিশিষ্টতা লাভ করেছিল। এই পত্রিকায কৃষ্ণকমল ভটাচার্যের বিভিন্ন রচনা (পৌলবর্জিনী, নেপোলিযনের জীবনবৃত্তান্ত, যুরোপীয় ডুযেল সম্বন্ধীয় নিবন্ধ প্রভৃতি) প্রকাশিত হত।

সাহিত্যধর্মী অন্যান্য সামযিক পত্রিকার মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'পূর্ণিমা' (১৮৫৯), 'সাহিত্য সংক্রান্তি', (১৮৬৩), ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর 'এডুকেশন গেজেট' (১৮৬৮)৩২, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫) এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-এর 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) উল্লেখযোগ্য। 'সোমপ্রকাশ'-এর সাহিত্য সমালোচনা সে যুগে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল।

চার

মৌলিক রচনা ঃ

বর্তমান পর্যায়ের বাংলা গদ্যে মৌলিক রচনার পরিমাণ, পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও, অনুবাদ ও অনুসরণের তুলনায় অনেকটা কম। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে যে সমস্ত মৌলিক গদ্যগ্রন্থ এই পর্যায়ে রচিত হয়েছিল সেগুলি মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় ঃ



কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (১৮৬২) ইংরেজি সামাজিক

৩১. বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়, ১ম সংস্করণ, পৃ ২০০।

৩২. পত্রিকাটি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হয়। ভূদেবের পূর্বে এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ও ব্রায়ান স্মিথ ও প্যারীচরণ সরকার।

ব্যঙ্গ কৌতুকের আদর্শে বিরচিত। ক'লকাতার নবীন সমাজের ব্যঙ্গচিত্র পরিবেশনের প্রবণতা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায এর মধ্যে। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' রচনার ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্ভবতঃ এ্যাডিসন-এর আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। এই প্রসংগে স্মরণীয় যে হিন্দু কলেজের পাঠ্যতালিকায এ্যাডিসন-এর স্থান ছিল এবং হিন্দু কলেজের ছাত্র কালীপ্রসন্নের পক্ষে এ্যাডিসন-এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস[৩৩] হিসাবে সুপরিচিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৭) সামাজিক ব্যঙ্গ ধরণের। প্যারীচাঁদের ওপর ডিকেন্স-এর প্রভাবের কথা অনেকে উল্লেখ করে থাকেন।[৩৪] কিন্তু, উনিশ শতকের পাঁচের দশকে বাঙালী মানসে ডিকেন্স-এর প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয় না ; কারণ, তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি পিকৃউইক্ পেপার্স্' ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সুতরাং, মাত্র কয়েক বছর পূর্বে বিলাতে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের প্রভাব অত দ্রুত বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত হওয়া খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

সাহিত্যের ইতিহাস রচনার আদর্শও আমাদেব গদ্যসাহিত্যে এসেছে ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণে। এদিক থেকে বিদ্যাসাগর এবং রামগতি ন্যায়রত্নের নাম স্মরণীয। বাংলায় লেখা প্রথম সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষবক প্রস্তাব'[৩৫] গ্রন্থটির

৩৩. প্যারীচাঁদ গ্রন্থের ইংরেজি ভূমিকায় বলেছেন: **The above original novel in Bengali being the first work of the kind is now submitted to the public with considerable diffidence.**

৩৪. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ ৭৫-৭৬।

৩৫. ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য অনুসারে জানা যায় যে, বেথুন সোসাইটিতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ ৪৪) কিন্তু, সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত বেথুন সোসাইটির 'প্রসিডিংস' অনুসরণে দেখা যায় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী থেকে শুরু করে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের মধ্যে যে সমস্ত প্রবন্ধ বেথুন সোসাইটিতে পাঠ করা হয় সেগুলির মধ্যে বিদ্যাসাগরের উল্লিখিত প্রবন্ধটি ছিল ১৪ সংখ্যক প্রবন্ধ। সুতরাং ৮ই জানুয়ারী ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বিদ্যাসাগর এই প্রবন্ধটি পাঠ করেননি। (Bethune Society Proceedings, P. 35) তাছাড়া ১২ই মার্চ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ (৩০শে ফাল্গুন, ১২৫৯)-এর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের উল্লিখিত বক্তৃতার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

দিকে দৃষ্টিপাত করছি। প্রথমতঃ উল্লিখিত গ্রন্থটি আমাদের দেশে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেছে। দ্বিতীয়তঃ ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার প্রথম প্রয়াস এই গ্রন্থে দেখা যায়। তৃতীয়তঃ বিদ্যাসাগর ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণ করে এই গ্রন্থে সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত করেন।

এই ধরণের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রেরণা তিনি হয়তো চেম্বার্স বিরচিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইংলিশ লিটারেচর' গ্রন্থ থেকে পেয়ে থাকবেন। গ্রন্থটি তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ছিল।

বিজ্ঞানসম্মত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগেও ছিল। পাণিনির ব্যাকরণ এদিক থেকে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। কিন্তু ভাষাতত্ত্ব, অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের 'শব্দবিদ্যা', সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা জাগ্রত হয়েছে ইংরেজি প্রভাবে। গ্রন্থটির উপসংহারে বিদ্যাসাগর ম্যাক্স্‌মূলার এবং হোরেস হেম্যান উইলসন-এর প্রভাব ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে স্বীকার করেছেন।

বিদ্যাসাগর আলোচ্য গ্রন্থটিতে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ইংরেজি আদর্শ অনুসরণে তুলনামূলক পদ্ধতি এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমালোচনার নমুনা হিসাবে গ্রন্থটি থেকে দুই-একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি :

> এই মহাকাব্যের রচনা অতি প্রগাঢ়, কিন্তু কিঞ্চিৎ দুরূহ, কালিদাসের রচনার ন্যায় সরল নহে। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, কিরাতার্জ্জুনীয় কর্ত্তা ভারবি কালিদাসের উত্তরকালে এবং মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির পূর্বে, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।
>
> (কিরাতার্জ্জুনীয়)

> বস্তুতঃ এরূপ ললিত পদবিন্যাস, শ্রবণ মনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগুণ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেমন চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিনী। জয়দেব রচনা বিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুরূপ হইত, তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত।
>
> (গীতগোবিন্দ)

প্রসংগক্রমে স্মরণীয় যে ডি. এল. রিচার্ডসন যেমন অধ্যাপনার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করেছিলেন তেমনি তাঁর কিছু কিছু ইংরেজি রচনা বাংলা সমালোচনার মানদণ্ড সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। এই প্রসংগে তাঁর 'লিটেররি রিক্রিয়েশন্‌স্‌' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। কবি রঙ্গলাল তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' গ্রন্থের ভূমিকায় কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে এই গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

আলোচ্য পর্যায়ে খ্রীষ্টীয় নীতিকথনের আদর্শ অনুসরণে বাংলা গদ্যে যাঁরা ধর্মোপদেশ রচনা করেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম স্মরণীয়। আমাদের দেশে সংস্কৃতে লেখা ধর্মোপদেশ সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হলেও, সারল্য ও সহজবোধ্যতার দিকে কখনোই অগ্রসর হয়নি। অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষের পক্ষে সংস্কৃত শাস্ত্রবচন ছিল দুর্বোধ্য। কিন্তু ইংরেজিতে লেখা শাস্ত্রবচন ও ধর্মোপদেশের মূল লক্ষ্য ছিল সারল্য ও সর্বজনবোধ্যতা। এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই একসময় বিদেশী মিশনারিগণ তাঁদের ক্ষমতা অনুসারে সহজ সরল বাংলা গদ্যে খ্রীষ্টধর্মের বাণী জনসমক্ষে পৌছে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই ধারারই চূড়ান্ত হয়েছিল কৃষ্ণমোহন-দেবেন্দ্রনাথের হাতে।

গীর্জায় কৃষ্ণমোহন যে সমস্ত ধর্মব্যাখ্যা করতেন সেগুলো সংগৃহীত হয়ে 'উপদেশ কথা' (১৮৪০) নামে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া কৃষ্ণমোহনের ধর্মোপদেশ 'উপদেশক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর উপদেশমূলক রচনার সারল্য ও সাবলীলত্ব স্বভাবতঃই খ্রীষ্টীয় ধর্ম উপদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়:

> এক লতা কোন তালবৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহার মস্তক পর্যন্ত উঠিল, পরে তালবৃক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, ওগো, তোমার কত বয়স? সে উত্তর করিল, আমার একশত বৎসর হইতে পারে। লতা বলিল, বাপরে, এত বৎসরের মধ্যেও তুমি বড় হইতে পার নাই? দেখ তোমার বয়স যত বৎসর, আমার বয়সের তত দিন না হইলেও তোমার যে উচ্চতা তাহা আমি পাইয়াছি। তালবৃক্ষ কহিল, তাহা আমি জানি; আমার বাল্যকালাবধি প্রতি বৎসর তুল্য আত্মাভিমানী কোন কোন লতা আশ্রয় লইয়া উঠে, তাহাদের ন্যায় তুমিও ম্লান হইবা।
>
> (উপদেশক পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ১৮৪৭, পৃ ২১০)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মোপদেশ যে কতটা পরিমাণে খ্রীষ্টীয় ধর্মোপদেশের দ্বারা প্রভাবিত ছিল তার কয়েকটি মূল্যবান উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন ডঃ নবেন্দু সেন।৩৬

আলোচ্য পর্যাযে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত এবং ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা গদ্য গ্রন্থাদি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় জ্ঞানের সাহিত্য এবং ভাবের সাহিত্য উভয়ই ব্যাপ্তি লাভ করেছে। অবশ্য, ভাবের সাহিত্যের তুলনায জ্ঞানের সাহিত্যের প্রাধান্য আলোচ্য পর্যাযেও পরিদৃষ্ট হয়। অনুবাদ, অনুসরণ, সাময়িক পত্র এবংমৌলিক রচনার ধারাও আলোচ্য পর্যায়ে অনেকটা পরিপুষ্টি লাভ করে। এই ত্রিধারার মধ্যে অনুবাদ ও অনুসরণই সর্বাধিক উন্নত হযে ওঠে।

আলোচ্য পর্যায়ের কতিপয ধারা বাংলা গদ্য সাহিত্যকে সৃজনীধর্মী করে তুলতে বিশেষ সহাযতা করেছিল। প্রথমতঃ, বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণের মাধ্যমে এই পর্যাযে বাংলা গদ্যে রূপকথা ও উপকথার ধারায়সূত্রপাত ঘটে। মধুসূদন মুখোপাধ্যাযের নাম এই প্রসংগে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। বাংলার নিজস্ব রূপকথা-উপকথার জগৎ তখনও মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। লিখিত রূপে সে জগৎ তখন বাঙালী কিশোরের কাছে আত্মপ্রকাশ করেনি। লিখিত রূপে যে সমস্ত রূপকথা বাংলা গদ্যে আলোচ্য যুগে প্রকাশিত হল সেগুলো ছিল বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থ অনুসরণে বিরচিত।

আমাদের দেশজ রূপকথার লিখিত রূপাযণে সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তিনি বিংশ শতকের গোড়ায় লেখনী সঞ্চালন শুরু করেছিলেন। তাছাডা, এই ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তু মূলতঃ স্বদেশীয় হলেও (কিছু কিছু বিদেশী রূপকথারও তিনি বংগীয় রূপ দান করেছিলেন) বিদেশী রূপকথা রচনার আদর্শের দ্বারাই তিনিও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণে সাহিত্য সমালোচনারও সূত্রপাত এই পর্যায়ে প্রথম লক্ষ্য করা যায়। ভরত, বিশ্বনাথ, আনন্দবর্ধন, অভিনব গুপ্ত প্রভৃতির অবদানে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র সবিশেষ উন্নত ছিল। কিন্তু, বাংলা গদ্যে, আলোচ্য পর্যায়ে, যখন সর্বপ্রথম কবি-সাহিত্যিক অথবা

৩৬. নবেন্দু সেন, 'গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তাঁদের সৃষ্টিকার্য সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হল তখন বাঙালী সাহিত্য সমালোচকদের কাছে ইংরেজি সমালোচনার আদর্শই বিশেষভাবে জাগ্রত ছিল। আর, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নির্দেশিত কাব্য বা নাটক সম্পর্কিত সংজ্ঞার আলোকে সে যুগের বাঙালী সাহিত্যবিচারে অগ্রসর হননি। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় আলংকারিকদের মতামত উল্লেখ করলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের মতবিরুদ্ধ বক্তব্য রেখেছেন। এই প্রসংগে স্মরণীয় যে বিদ্যাসাগর উপাখ্যানকে কাব্য-শ্রেণীভুক্ত করতে চাননি ('সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের 'উপাখ্যান' অংশটি দ্রষ্টব্য)।

এই সময় মধুসূদন তাঁর ইংরেজিতে লেখা কয়েকটি ব্যক্তিগত পত্রে তাঁর নিজের সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসংগে সংস্কৃত আলংকারিকদের প্রসংগ মাঝে মাঝে উত্থাপন করেছেন, কিন্তু, সেক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত আলংকারিক-দের বিরোধিতা করা।

পরবর্তী পর্যায়ে, বঙ্কিম যুগে, বাংলা সমালোচনা সাহিত্য যখন প্রতিষ্ঠা পেল তখনও ভারতীয় আলংকারিকদের আদর্শ অনুসরণ অপেক্ষা ইংরেজি সমালোচনার আদর্শ অনুসরণেরই প্রবণতা দেখা যায়।

আলোচ্য পর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু সিডনি, ড্রাইডেন, জনসন্, কোলরিজ, শেলি প্রভৃতির সাহিত্য সমালোচনার আদর্শ দ্বারা যে এই পর্যায়ের বাঙালী সাহিত্য সমালোচকেরা পরিচালিত হয়েছিলেন, এমন নয়। ইংরেজি সমালোচনার উৎকৃষ্ট আদর্শের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সমসাময়িক সমালোচকেরা ক্রমশঃ প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আলোচ্য পর্যায়ে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' জাতীয় সাময়িক পত্রিকায় সমসাময়িক বাংলা গ্রন্থের সমালোচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা শাখার উদ্বোধন ঘটে। এই ক্ষেত্রে, সে সময়কার বাঙালী সমালোচকদের কাছে সিডনি-শেলি নয়, বরং ইংরেজিতে প্রকাশিত 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' বা 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর মতো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচনা বাঙালী সমালোচকদের কাছে আদর্শ হিসাবে কার্যকরী ছিল।

তৃতীয়তঃ, এই পর্যায়ে বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থ থেকে অনূদিত কয়েকটি কাহিনী বাংলা গদ্যে উপন্যাস রচনার পথ প্রস্তুত করেছিল।

চতুর্থতঃ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ জাতীয় রচনাও এ যুগে বিশেষ পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এই ধরণের রচনা-নিচয় পরবর্তী বা তৃতীয় পর্যায়ে (১৮৭২-১৯০০) বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে বাংলা গদ্যে ভাবের সাহিত্যের যথার্থ প্রতিষ্ঠা দান করেছিল। আলোচ্য পর্যায়ে, বিষয়বস্তুর সংগে সংগে ভাষাও ক্রমশঃ ভাবের সাহিত্যের উপযোগী হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে, ইংরেজি প্রভাবে বাংলা গদ্যের ভাষা কতটা কার্যকারিতা লাভ করেছিল তার পরিচয় গ্রহণ করব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভাষারীতি (১৮৪৩-১৮৭২)

গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণমোহন, তারাশঙ্কর এবং অন্যান্য

এক

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের পর থেকে 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২)-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত, আলোচ্য দ্বিতীয় পর্যায়ে, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি। বিচিত্র বিষয়বস্তুর রূপায়ণে এই পর্যায়ে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভাষারীতি অনেক পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করেছিল, ইংরেজি সাহিত্যের নানা উৎকৃষ্ট প্রকাশভঙ্গির অনুসরণ করে। ভাষার প্রকাশক্ষমতা প্রবৃদ্ধির জন্য, প্রথম পর্যায়ের মতোই, আলোচ্য সময়ে ইংরেজি বাক্যের গঠনরীতি নানা ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছিল। অবশ্য, পূর্ববর্তী পর্যায়ে অভিজ্ঞতার অপেক্ষাকৃত অভাবে বাংলা গদ্যের অবয়বে বিসদৃশ ঠেকে এমন অনেক রীতি, ইংরেজি প্রভাবে, বাংলা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছিল। বর্তমান পর্যায়ে এই ধরণের কিছু রীতি অপ্রয়োজনীয় ও বিসদৃশ বিবেচনায় বর্জন করা হল। বাংলা গদ্যের প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতা এবং কার্যকারিতা অর্জনের প্রয়োজনে কিছু কিছু নতুন রীতিও এই পর্যায়ে গৃহীত হয়েছিল।

এই সময় বিষয়বস্তু যেমন ক্রমশঃ কল্পনার নব নব ক্ষেত্র অন্বেষণ করেছে তেমনি ভাষাও ক্রমশঃ কল্পনার সূক্ষ্মতর ও বিচিত্রতর প্রকাশের উপযোগিতা লাভে তৎপর হয়ে উঠেছে। তাই, ইংরেজি সাহিত্যের অলংকার বা 'রেটরিক'-এর প্রতি বাঙালী গদ্যকারেরা ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয়েছেন এবং অনেক সময় ইংরেজি থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে ইংরেজির উৎকৃষ্ট প্রকাশভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সুতরাং, নানাদিক থেকে বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক গুণের প্রবৃদ্ধি আলোচ্য পর্যায়ে নিঃসন্দেহে ঘটেছে।

ইংরেজি শব্দচয়নের ক্ষেত্রেও এই পর্যায়ে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। আইন-আদালত রাজকার্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দ পূর্ববর্তী পর্যায়ে চয়ন করা হয়েছে। কিন্তু, ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার ক্রমিক-

প্রসারের সাথে সাথে নানা ইংরেজি শব্দের ব্যবহার বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনে স্বাভাবিক হযে উঠতে থাকে। সুতরাং, শুধু রাজকার্য নয, বাঙালীর ঘর ও বাহিরের বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। বাংলা গদ্য সাহিত্যও তাই, বিভিন্ন পরিবেশের রূপায়ণে বিভিন্ন ইংরেজি শব্দ চয়নে উৎসাহিত হতে থাকে।

তাছাড়া, বিষযব্যাপ্তির সংগে সংগে ইংরেজি দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে ব্যবহৃত নানা শব্দের বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টায বাঙালী গদ্যকারেরা উৎসাহী হযে ওঠেন।

দুই

ক. বর্জন

[১] ইংরেজি বাক্য গঠন রীতি অনুসরণ করে প্রথম পর্যাযে বাংলা গদ্যে বর্তমান কালে 'হওযা' ক্রিযার ব্যবহার শুরু হযেছিল।[১] কিন্তু, এই ধরণের ব্যবহার বাংলা ভাষারীতির সম্পূর্ণ বিরোধী বলে বর্জন করা হল। দেখা গেল, এই ধরণের ক্রিযাপদের ব্যবহার বাংলার নিজস্ব ভাষারীতি অনুসরণে উহ্য রেখে দিলে বাক্যের প্রকাশ ক্ষমতার হ্রাস হয না। তাই কীট [হয] নানাবিধ না লিখে লেখা হল—'কীট নানাবিধ' (বিদ্যাসাগর, বোধোদয, চেতন পদার্থ), অথবা, 'অশ্বারোহী ব্যক্তি [হয] অতি দানশীল', না লিখে লেখা হল—'অশ্বারোহী ব্যক্তি অতি দানশীল' (তদেব, চক্ষু) ইত্যাদি।

[২] সাপেক্ষ সর্বনাম বা ইংরেজি 'Relative Pronoun'-এর ব্যবহারও আলোচ্য পর্যাযে পরিহার করবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয। এই ধরণের ব্যবহার একটি বাংলা বাক্যকে অনাবশ্যকভাবে জটিল করে তোলে : বাক্য তার প্রকাশভঙ্গীর স্বচ্ছতা হারিযে ফেলে। সুতরাং, আলোচ্য পর্যাযে এই ক্ষেত্রে ইংরেজি রীতির বশ্যতা স্বীকার না করে বাংলা মৌখিক ভাষার সাধারণ প্রকাশ-ভঙ্গি এবং সংস্কৃত 'ক্তাচ্' প্রত্যযের ব্যবহারের রীতি অনুসরণ যুক্তিযুক্ত বলে বাঙালী গদ্যকারেরা বিবেচনা করলেন। তাই, পূর্ববর্তী পর্যাযে, সাপেক্ষ

১. বর্তমান গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়, পৃ ৪০।

সর্বনামের ব্যবহার[২] যথেষ্ট পরিমাণে হয়ে থাকলেও এই পর্যায়ে নানা ভাবে পরিহার করার প্রবণতা দেখা গেল :

এক সিংহ [যে] অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া নিতান্ত দুর্বল ও অক্ষম হইয়াছিল—এই ধরণের বাক্য গঠন পরিহার করে লেখা হল : এক সিংহ, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া নিতান্ত দুর্বল হইয়াছিল (বিদ্যাসাগর, কথামালা, বৃদ্ধসিংহ)।

গিফোর্ডের পিতা, [যিনি] সম্রান্ত ও সম্পন্ন লোক ছিলেন, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতব্যয়িতার দ্বারা নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া গিয়াছিলেন—এ ধরণের বাক্য রচনা না করে সমুচ্চযী অব্যয় 'কিন্তু' ব্যবহার দ্বারা দুটি বাক্য সংযুক্ত করে সাপেক্ষ সর্বনামের ব্যবহার পরিহার করা হল : 'গিফোর্ডের পিতা সম্রান্ত ও সম্পন্ন লোক ছিলেন ; কিন্তু, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতব্যয়িতার দ্বারা নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া গিয়াছিলেন' (বিদ্যাসাগর, চরিতাবলী, গিফোর্ড)।

[৩] ইংরেজি বাইবেল এবং জন বানিয়ন-এর 'দি পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস' গ্রন্থের ধারা অনুসরণ করে 'এবং' দিয়ে বাক্য আরম্ভের প্রবণতা প্রথম পর্যায়ে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।[৩] বাইবেল-এর বাইরে বিংশ শতাব্দীর পূর্বে 'and' দিয়ে শুরু হয়েছে এমন বাক্য ইংরেজি গদ্যে খুব বেশী দেখা যায় না। তাই, আলোচ্য পর্যায়ে, নানা ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণ করতে গিয়ে বাঙালী গদ্যকারেরা 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরু করতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন নি। মিশনারিগণ এবং রামমোহনের রচনায় 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরু করার প্রবণতার কারণ বাইবেলের রচনা-রীতির প্রভাব।

আলোচ্য পর্যায়ে 'এবং' দিয়ে বাক্য রচনার রীতি বর্জন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভূদেব ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাক্যের প্রথমে 'এবং' শব্দের ব্যবহার মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা গেলেও বাংলা গদ্যের প্রথম পর্যায় অথবা ইংরেজি বাইবেল কিংবা 'দি পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্' গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের মতো 'এবং' দিয়ে বাক্য আরম্ভ করার পৌনঃপৌনিক প্রবণতা দেখা যায় না।

[৪] ইংরেজি বাক্যের পদসজ্জার সাধারণ রীতির অনুসরণে পূর্ববর্তী যুগের গদ্যকারগণ কখনো কখনো কর্তা ও কর্মের মাঝখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহার করেছেন।[৪] এই প্রবণতা, আলোচ্য পর্যায়ে সম্পূর্ণ পরিহার করা হয়। ইংরেজি

২. তদেব, পৃ ৪৬।
৩. বর্তমান গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়, পৃ ৪৩।
৪. তদেব, পৃ ৪২।

বাক্যের পদসজ্জার এই রীতি অবশ্য বিংশ শতাব্দীতে আবার ফিরে এসেছে: 'তিনি বাড়ীতে গেলেন' এর পরিবর্তে আমরা অনেক সময় লিখি 'তিনি গেলেন বাড়ীতে'।

খ. রক্ষণ

পূর্ববর্তী পর্যায়ে বাংলা গদ্যের অবয়বে ইংরেজি বাক্যগঠন-রীতির প্রভাবের যে সমস্ত চিহ্ন লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেগুলির কোন কোনটি এই পর্যায়ে রক্ষিত হল।

১. সমুচ্চয়ী অব্যয়ের ব্যবহার:

ইংরেজি বাক্যের গঠন রীতির প্রভাবে, প্রথম পর্যায়ের মতো,[৫০] প্রত্যয়ের ব্যবহার না করে সমুচ্চয়ী অব্যয় 'এবং'-এর ব্যবহার করা হয়েছে, এই পর্যায়ে। ইংরেজি থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে পূর্ববর্তী পর্যায়ে তারিণীচরণ মিত্র এই ধরণের ব্যবহার খুব বেশী পরিমাণে করেছিলেন।

এই প্রসংগে বিদ্যাসাগর এবং তারাশঙ্কর তর্করত্নের রচনা থেকে আলোচ্য পর্যায়ে এই ধরণের ব্যবহার সম্পর্কিত উদাহরণ উদ্ধৃত করছি। ইংরেজি থেকে অনূদিত গ্রন্থে এই ধরণের ব্যবহার খুব বেশী:

[১] · কাটোয়ায় উপস্থিত হইলেন 'এবং' পরদিন দুর্গ আক্রমণ 'ও' অধিকার করিলেন।

(বিদ্যাসাগর. বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ২য় অধ্যায়)

[২] · পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 'এবং' ভূতলে পতিত হইলেন।

(তদেব)

[৩] ··· তাহাকে নানাপ্রকার বুঝাইত 'এবং' পুনর্বার আমোদে প্রমোদে তাঁহার প্রীতি জন্মাইবার চেষ্টা পাইত।

(তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রাসেলাস, ১ম সংস্করণ, পৃ ১৮)

সাধারণভাবে সংযোজক বা সমুচ্চয়ী অব্যয় হিসাবে 'এবং' শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহারও এই পর্যায়ের অনেক গদ্য রচনায় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের রচনা থেকে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি:

---

৫০. তদেব, পৃ ৪৩।

[৪] ··· সন্নিহিত সমস্তলোক মোহিত 'ও' চমৎকৃত হইলেন 'এবং' সম্রাটের দয়া, সৌজন্য 'ও' সদ্বিবেচনার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

(বিদ্যাসাগর, আখ্যানমঞ্জরী, ২য় ভাগ, দয়া ও সদ্বিবেচনা)

২. খণ্ড বাক্য সজ্জার রীতি :

ইংরেজি খণ্ডবাক্য সজ্জার রীতি অনুসরণ পূর্ববর্তী পর্যায়ে শুরু হয়েছিল। এই পর্যায়েও এই প্রবণতা অব্যাহত থাকে। এই যুগের বিভিন্ন ধরণের বাংলা রচনা থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত করছি :

মূল বাক্যাংশ	অধীন খণ্ড ব্যক্য
ডিরেক্টরেরা স্থির করিযাছিলেন	যে মহম্মদ রেজা খাঁর অসৎ আচরণ দ্বারাই বাঙ্গালার রাজস্বের ক্ষতি হইয়াছে। (বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায়)
তিনি দেখিতে পাইলেন	একটি বালক পথের ধারে কর্দ্দমে পতিত হইয়া আছে। (বিদ্যাসাগর, আখ্যানমঞ্জরী, ১ম ভাগ, প্রত্যুপকার)
পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে	যে রেশম কীট পদার্থ। (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শিল্পিক দর্শন, ১ম সংস্করণ, পৃ ৩৫)
সকলেই বলিতেছে	যে তাড়াতাড়ি কতকগুলি মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও মৃত ব্যক্তির সহিত এক গাড়িতে নিক্ষেপ কারয়া পদ্মায় বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে। (এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৫)
আমাদের বোধহয়	পৃথিবী একস্থানে স্থির হইয়া আছে। (অক্ষয়কুমার, চারুপাঠ, ২য় ভাগ, ২য় সংস্করণ, পৃ ১৬)
রাজা ও রাজতনয় ইহা স্থির করিলেন	যে রাজ্য একজন শাসনকর্ত্তার অধীনস্থ··· (কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহু পালিতোপাখ্যান, ১ম সংস্করণ, পৃ ২)

অধীন খণ্ডবাক্য	মূল বাক্যাংশ
প্রভাত ও সন্ধ্যা কাহাকে বলে	তাহা সকলেই জানে। (বিদ্যাসাগর, বোধোদয়, কাল)
সম্পাদক মহাশয় কি জন্ত আপনার নামটি গ্রহণ করিয়াছেন	তাহা জানিতে পারিলাম না। (সংবাদ প্রভাকর, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৮)
যেখানে আমোদ প্রমোদ হইত, যেখানে পাঁচজন আসিয়া একত্রে বসিত	তিনি আর তথায় যাইতে ভালবাসিতেন না। (তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রাসেলাস, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৮)
যে ব্যক্তি আহ্নিক, মাসিক অথবা বার্ষিক নিয়মে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের কর্ম করে	তাহাকে ভৃত্য বলে। (বিদ্যাসাগর, নীতিবোধ, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার)

'প্যারেনথিটিক্ ক্লজ'-এর ব্যবহার প্রথম পর্যায়ের মতো দ্বিতীয় পর্যায়েও ইংরেজি আদর্শের প্রভাবে ব্যবহৃত হযেছে। এই পর্যায়ের প্রধান গদ্যশিল্পীদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বাক্যের এই ধরণের সজ্জায় উৎসাহ বোধ না করলেও বিদ্যাসাগর উৎসাহের সংগে এই ধরণের সজ্জা অব্যাহত রেখেছিলেন। খণ্ড বাক্যের এই ধরণের সজ্জার ক্ষেত্রে 'ড্যাস্' অথবা 'কমা'র যথাযোগ্য ব্যবহার প্রয়োজন। যতিচিহ্নাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে উনিশ শতকের ইংরেজ লেখকদের আদর্শ তিনি অনুসরণ করেছিলেন। যাই হোক, বিদ্যাসাগরের রচনায় 'প্যারেনথিটিক ক্লজ'-এর চমৎকার সজ্জা লক্ষ্য করা যায়। মার্শম্যান-এর 'আউট লাইন হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল' গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে ইংরেজির প্রভাবে তিনি এই ধরণের খণ্ডবাক্য সজ্জায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কতিপয় উদাহরণ উপস্থিত করছি: (পর পৃষ্ঠায়)

মূল বাক্য	প্যারেনথিটিক রুজ	মূল বাক্য
মীরকাশিম,	ইংরেজদিগের অগোচরে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত,	মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। (বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ৪র্থ অধ্যায়)
লর্ড উইলিয়ম,	এই ধর্ম্ম রহিত করিবার বহুবিধ প্রবল যুক্তির প্রদর্শনপূর্ব্বক,	তাঁহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। (তদেব, ৯ম অধ্যায়)
তাঁহারাও,	অবিচারে নবকুমারের প্রাণদণ্ড দেখিয়া,	যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ ও বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।' (তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়)
রায়দুর্লভও,	কেবল ইংরেজদিগের শরণাগত হইয়া,	সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইলেন। (তদেব, ৩য় অধ্যায়)
নজমউদ্দৌলা,	১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে,	নবাব হইয়াছিলেন। (তদেব, ৫ম অধ্যায়)

৩. পরস্পরসম্বন্ধী অব্যয় (Correlatives) :

পরস্পরসম্বন্ধী বা নিত্য সম্বন্ধী অব্যয় অথবা 'কোরিলেটিভ্' ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষারীতির প্রভাব প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায়। এই ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের রচনায় এই জাতীয় ব্যবহার লক্ষিতব্য। ইংরেজি গ্রন্থাদির অনুবাদ করতে গিয়েই বিদ্যাসাগর এই ধরণের প্রকাশভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছিলেন :

'Neither' my husband 'nor' the slave return'd.

(Shakespeare, The Comedy of Errors, Act II, Sc. I)

ইংরেজিতে 'when'-এর পর 'then'-এর ব্যবহার উহ্য থাকে। কিন্তু, বাংলা বাক্যে 'যখন' এর পর 'তখন' ব্যবহৃত হয়। বিদ্যাসাগর ইংরেজি রীতি অনুসরণ করে কখনো কখনো 'তখন' শব্দটির ব্যবহার উহ্য রেখেছেন :

যখন' সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত হয়, রায়দুর্লভই

চক্রান্তকারীদিগের নিকট প্রস্তাব করেন যে, মীরজাফরকে নবাব করা উচিত।

(বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ৩য় অধ্যায়)

৪ যতিচিহ্নাদির ব্যবহার :

প্রথম পর্যায়ের ভাষারীতি আলোচনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি যে ইংরেজি রীতির প্রভাবে মিশনারিগণ বাংলা গদ্যে প্রায় সর্বপ্রকার যতিচিহ্ন ব্যবহারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু, আলোচ্য পর্যায়ে এসে বাঙালী গদ্যকারেরা পূর্ণচ্ছেদ এবং পদচ্ছেদের চিহ্ন ব্যবহার করলেও অর্ধচ্ছেদের চিহ্ন ব্যবহার করেননি :

উদয়াচলে দিবাকর রক্তিমবর্ণ হইয়া উদিত হইলেন, জল হইতে তাঁহার স্বর্ণ কিরণ দৃষ্ট হইতে লাগিল, রাজকুমারের কপোলদেশে ঐ আভা লাগিবাতে বোধ হইল বুঝি সূর্যদেব দয়া করিয়া রাজপুত্রের শরীরের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মুদ্রিত চক্ষু উন্মীলন হইল না।

(মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, মরমেত, ১ম সংস্করণ, পৃ ২৬)

এখানে অর্ধচ্ছেদ চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল ; কিন্তু,লেখক সেদিকে দৃষ্টি দেননি।

তবে, এই পর্যায়ের গদ্যশিল্পীদের মধ্যে বিদ্যাসাগরই সর্ববিধ যতিচিহ্নের ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বিদ্যাসাগর প্রথম অবস্থায় কেবল মাত্র পূর্ণচ্ছেদেরই ব্যবহার করেছেন :

তাঁহার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোন বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ নাই। কিন্তু যতদিন যাইতে থাকে, তিনি অনুভব করেন যে, রচনা সহজবোধ্য করিতে হইলে সকল প্রকার বিরাম চিহ্নের বহুল প্রয়োগ আবশ্যক ; এবিষয়ে তিনি ঊনবিংশ শতকের ইংরেজ লেখকদের অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন।[৬]

বিদ্যাসাগরের মুদ্রিত প্রথম পুস্তক 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) বহু পরিমার্জনার পর দশম সংস্করণে (১৮৭৬) ইংরেজি যতিচিহ্নের সর্বপ্রকার ব্যবহার যথাযথ অনুসৃত হয়েছে বলে বিদ্যাসাগর গ্রন্থটির 'বিজ্ঞাপনে' ঘোষণা করেছিলেন :

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, ১ম সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ ।/০।

বেতাল পঞ্চবিংশতি দশম বার প্রচারিত হইল। এই পুস্তক, এতদিন বাঙ্গালা ভাষার প্রণালী অনুসারে মুদ্রিত হইয়াছিল; সুতরাং ইঙ্গরেজী পুস্তকে যে সকল বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হইযা থাকে···এই সংস্করণে সে সমস্ত সন্নিবেশিত হইল।

অবশ্য উল্লিখিত গ্রন্থটির দশম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পূর্বেই বিদ্যাসাগর অন্যান্য গ্রন্থে ইংরেজি ধারা অনুসরণে বিভিন্ন বিরামচিহ্নের সম্যক ব্যবহার শুরু করেন: উদাহরণ স্বরূপ, 'আখ্যানমঞ্জরী' (তৃতীয় ভাগ) গ্রন্থের ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

বস্তুতঃ, এরিযানার মৃত্যু হয নাই; তিনি, সবিনস ও অলিন্দার মনের ভাব পরীক্ষার্থে, ছলনা করিযা ঐ লোককে ঐরূপ কহিতে পাঠাইয়া দেন।

ইংরেজি ধারা অনুসরণে মিশনারিগণ প্রথম পর্যায়েই বিভিন্ন ধরণের যতিচিহ্ন ব্যবহারের প্রথম এবং সার্থক চেষ্টা করেছিলেন। আর, আলোচ্য পর্যায়ে বিদ্যাসাগর প্রথমে সর্বপ্রকার যতিচিহ্নের ব্যবহার সম্বন্ধে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেও অল্পকালের মধ্যেই বিভিন্ন বিরামচিহ্ন ব্যবহারে অগ্রসর হয়েছিলেন। সুতরাং বাংলা গদ্যরচনায বিভিন্ন বিরামচিহ্নের প্রথম প্রবর্তক হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ করার আগে উনিশ শতকের প্রথম চল্লিশ বছরের মধ্যে মিশনারিদের বাংলা রচনায় বিভিন্ন যতিচিহ্নের ব্যবহার লক্ষ্যণীয।

আলোচ্য পর্যায়ে বিভিন্ন যতিচিহ্নের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে উদ্ধার চিহ্নের প্রযোগ করা হয়নি: শুধু একটা পদচ্ছেদ বা 'কমা' চিহ্ন ব্যবহৃত হযেছে।

গ. নূতন গ্রহণ

ভাষার সাহিত্যিক গুণ বৃদ্ধির জন্য আলোচ্য পর্যায়ে সর্বপ্রথম ইংরেজি অলংকার বা 'রেটরিক'-এর অনুসরণে বাঙালী গদ্যকারেরা অগ্রসর হয়েছিলেন। এই প্রসংগে দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি:

[১] ··· আপনি যে তিরস্কার, যে অপমান বা যে শাস্তি প্রদান করিবেন, ···।

—ইংরেজি 'ক্লাইম্যাক্স'-এর প্রভাব।

(বিদ্যাসাগর, আখ্যানমঞ্জরী, ৩য় ভাগ, দস্যু ও দিগ্বিজয়ী)

[২] তোমরা অমুক দিন, অমুক সময়, অমুক ভবনে উপস্থিত হইবে।

—ক্লাইম্যাক্স-এর প্রভাব।

(তদেব, নৃশংসতার চূড়ান্ত)

[৩] ঘটী অপেক্ষা কলসী বড়; বিড়াল অপেক্ষা গরু বড়; শিশু অপেক্ষা যুবা বড। —ক্লাইম্যাক্স-এর প্রভাব।

(বিদ্যাসাগর, বোধোদয়, বস্তুর আকার ও পরিমাণ)

[৪] 'তুমি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম।

(মধুসূদন-কে লেখা ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর পত্র, এডুকেশন গেজেট, ২৬শে এপ্রিল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত)

ইংরেজি অলংকার 'এ্যান্টিথিসিস্'-এর প্রভাব।

[৫] ···সমস্ত লোক মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং সম্রাটের দয়া, সৌজন্য ও সদ্বিবেচনার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ইংরেজি পলিসিণ্ডেটন'-এর প্রভাবে 'এবং'-এর অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ভাষার শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

(বিদ্যাসাগর, আখ্যানমঞ্জরী, ২য় ভাগ, মাতৃভক্তির পুরস্কার)

ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে কিছু কিছু ইংরেজি প্রকাশরীতির প্রভাব, আলোচ্য পর্যাযে, বাংলা গদ্যে লক্ষ্য করা যায়:

চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে (to throw dust into eyes-এর প্রভাব)—রামকমল ভট্টাচার্য, বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ, ১ম সংস্করণ, পৃ ৪১।

নিঃশ্বাস আকর্ষণ করিবার আশায় (to catch a breath-এর অনুসরণ), কর্ণ দিতে ইচ্ছা (to give ears-এর অনুসরণ)।

—বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ২য় অধ্যায়।

তিন

ক. শব্দ চয়ন:

প্রয়োজনের পথ অনুসরণ করে পূর্ববর্তী পর্যায়ের মতোই এই পর্যায়েও বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে ইংরেজি শব্দ যথেষ্ট পরিমাণে গৃহীত হয়েছে। এই যুগের কোন কোন বাংলা গ্রন্থে আইন আদালত বা সরকারি দপ্তরখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন

ইংরেজি শব্দের প্রবেশ ঘটেছে। যেখানে কোন ইংরেজি গ্রন্থের অনুসরণে কোন বিদেশী কাহিনী বা বিদেশীদের জীবন চরিত (যেমন বিদ্যাসাগরের 'আখ্যান-মঞ্জরী' বা 'চরিতাবলী' অথবা 'জীবন চরিত') বাংলা গদ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন সেখানেও ইংরেজি পরিবেশের সংগে যুক্ত কোন কোন শব্দ গৃহীত হয়েছে (যেমন, বিদ্যাসাগরেব 'আখ্যানমঞ্জরী'-তে : স্থপ / পিলের বাক্স / গিনি / মেডাল / পিনেস ইত্যাদি—দেবেন্দ্রনাথ 'স্বরচিত জীবন চরিত' গ্রন্থে লিখেছিলেন 'পিনিস') আর ইংরেজি দর্শন বিজ্ঞান গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা যেমন পরিলক্ষিত হযেছে তেমনি আবার সরাসরি ইংরেজি শব্দও গ্রহণ করা হয়েছে।

যাই হোক, প্রয়োজনের বাইরে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার না হলেও আমাদের ঘর ও বাইরের পরিবেশ ক্রমশঃ ইংরেজির সংগে অধিক সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের পরিমাণ, আলোচ্য পর্যায়ে, অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই পর্যায়ে প্রকাশিত কতিপয় গ্রন্থে এবং পত্র-পত্রিকায় ইংরেজি শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার দেখা যায়। এই প্রসংগে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নক্শা' ও প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে কিছু নমুনা সংকলিত করছি :

সংবাদ প্রভাকর :

'চাটারের' মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে

(সংবাদ প্রভাকর, জানুয়ারী, ১৮৫২)

'ট্যাক্স' আইনে আছে .. ..

(তদেব, জুলাই, ১৮৫২)

'মিকনিক' বিদ্যার অনুশীলন...(তদেব, ডিসেম্বর, ১৮৫৩)

'লিমিটেড লায়েবিলিটি' আইন কিছু অংশে... (তদেব, ডিসেম্বর, ১৮৬৩)

'সিবিলিযানদের' দলে মিশিয়া.. (তদেব, মার্চ, ১৮৫৩)

'পারসেণ্টের' হিং 'পোষ্টবিল' এবং ডৈরক্টর্সদিগের' (তদেব ৯ এপ্রিল, ১৮৪৭)। 'হৌস সকল 'ফেইল' হওরাতে ; 'কমিস্তনর' মহাশয়ের ; নানাবিধ প্রকার 'টেক্সের' (তদেব, ৩ এপ্রিল ১৮৪৮)। হস্ত ধরিয়া 'সেকেহান' করেন। (তদেব, ২ মার্চ, ১৮৪৮)। 'সিবিলদিগের' গর্ভেই যায়, এতদ্ভিন্ন 'মিলিটরী' ; পরন্তু 'ষ্ট্যাম্পের' কর (তদেব, ১ মে, ১৮৫০)। 'এডিটরী' কাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক (তদেব, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫১)। 'কমিস্তন' দিবার নিয়ম (তদেব, ২১

শ্রাবণ ১২৫৮)। 'স্কালার-সিপের' নিমিত্ত (তদেব, ১২ অগ্রহায়ণ, ১২৫৮)। এরূপে 'লাল্ঠন্' জ্বালাইতে হইবে (তাদেব ১৯ আষাঢ় ১২৫৯)। 'সুপেরে-ণ্টেণ্ডেণ্টের' পদ ধারণ (তদেব, ২ নভেম্বর ১৮৫৯)। 'প্রেমিস্বরি নোটের' অর্থ 'ফোর পরসেণ্ট ফাইভ পবসেণ্ট' খুলিযা বসিতেছেন (তদেব; ২৬ ফাল্গুন ১২৫৯) কাহার ভাগ্যে 'ডিসমিস' উঠে; প্রতি 'মেইল' দ্বারা তথা হইতে (তদেব, ৩০ ফাল্গুন, ১২৫৯)। 'ইলেকট্রিক' নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে (তদেব, ১৮ কার্তিক ১২৬০)। 'বেঙ্কের সেক্রেটারি', 'নেবিগেশন কোম্পানী'; 'হোটেল কোম্পানী' (তদেব, ২৬ চৈত্র, ১২৬৩)। 'বজেট' অর্থাৎ আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (তদেব, ১৪ চৈত্র, ১২৯৮)। 'এসাইনি অফিসের' গোলযোগ, দেববাবু 'ওযারিণ' দ্বারা (তদেব, ২৪ বৈশাখ ১২৫৫)। বিলাতের 'হৌস অব কমন্স' নামক (তদেব, ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৬)। 'প্রবিকৌন্সেলে' জয়ী হইয়াছেন (তদেব, ২১ অগ্রহায়ণ, ১২৫৮)। 'গস্পেলান্তর্গত' বচনের ন্যায, 'টৌয়ারে' (Tower) যাত্রা করেন (তদেব, ২৬ ফাল্গুন ১২৫৮)। কলিকাতা নগরেব 'পুলিস' ও 'কান্সরবেন্সির' নিয়ম (তদেব, ১২ চৈত্র, ১২৫৮)। গাড়ি ধরিযা 'ষ্টেসিয়ানে' লইয়া (তদেব, ২৩ আশ্বিন ১২৫৯)। 'পার্লিয়ামেণ্টের' বিজ্ঞতম 'মেম্বর' মহাশয়দিগের (তদেব, ১২ বৈশাখ ১২৬১)। 'টিচারি' অর্থাৎ শিক্ষকের কার্য্যে (তদেব ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৬১)। 'কোর্ট মার্সাল' বিধির অধীনে (তদেব, ১৫ শ্রাবণ, ১২৬৫)। বিলাতে 'ইউনিবর্সিটি' নামক (তদেব, ৬ পৌষ ১২৫৪)। ইত্যাদি।

প্যারীচাঁদ মিত্র:

'ডিক্সনেরি' দেখ। 'ডিগ্রি ডিসমিস' হইতেছে। না হয 'কৌনসেল' পর্য্যন্ত যাব। 'জস্টিস্ অব পীস'। দুই-একজন 'টযে'-বাঁধা (টাই বাঁধা)। ইংরাজিওযালা 'পুলিশের' যাবতীয় লোক। 'বেঞ্চের' উপর বসিয়া 'মাষ্টারি' কর্ম্ম করিয়া।

(আলালের ঘরের দুলাল)

কালীপ্রসন্ন সিংহ:

'মেকাবি ক্লাকে'। রুমালে 'বোকো' মেখে। 'গ্যাসের' আলো। 'মটন চাপ্সের' ভার নিয়ে চলেছে। 'পুলিসের' রাতকানা 'সার্জ্জন'। 'পকেট' পরিপূর্ণ। 'সুপারিনটেনডেন্ট' সাহেব সাদা লোক। চারপাঁচ জন 'ফ্রেণ্ড' নিরন্তর কাছে থাকে। 'হারমোনিয়ম' ও 'পাইনো' বাজিয়ে। আমহুজ্যের

বেভোরা 'মর্নিং ওয়াকে' বেরুচ্ছেন। 'সেকসন' লেখা কেরাণির দল। 'বুকিং ক্লার্ক' দেখা দিলেন। 'অফিস' বন্ধ। চারবার 'ইন্‌সালভেন্ট'। 'থিয়েটারের আমেতিওর'। কেউ 'সিভিলিজেসনের' অনুরোধে চড়ক 'হেট' করেন। 'জগে' করা জল। 'ডিকানটরে ব্রাণ্ডী'। কাচের 'গ্লাসে'। 'পলিটিক্‌স্' ও 'বেস্ট নিউজ অব দি ডে' নিয়েই সবদা আন্দোলন। 'হেড' কেরাণি। তিন চারিটি 'ইকুটী' দুটা 'কমন লা' আদালতে ঝুলছে। 'শমন'। 'ওয়ারিণ'। 'কলরওয়ালা' কামিজ। রুপোর 'বগলস্' আঁটা। 'সাইনিং লেদর'। কারো 'ইণ্ডিয়া রবর' আর 'চাইনা কোট' হাতে 'ইষ্টিক'। অমনি 'মার্শল ল' জারী হল। ইংরেজদের 'কপি' করেন।

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা)

প্রয়োজনের পথ-বাহিত হয়ে এ যুগে বাংলা গদ্যে ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ যুগের গদ্যকারদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ সর্বাধিক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর' বহু ইংরেজি শব্দ স্থান দিয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত গদ্যকারগণও প্রয়োজনের বাইরে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারে অগ্রসর হন নি। কলকাতার চালচিত্র পরিস্ফুটনে কালীপ্রসন্ন সে যুগের নব্য বাঙালী সম্প্রদায়ের মুখে মুখে প্রচলিত শব্দগুলি তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। নব্য বাঙালী বাবুর চরিত্র চিত্রিত করতে গিয়ে প্যারীচাঁদ মাঝে মাঝে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর, বিদ্যাসাগরও ইংরেজ অধিকৃত বাংলার ইতিহাস বর্ণনা প্রসংগে অথবা বিজ্ঞানমূলক রচনায় কিংবা প্রতীচ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন চরিত রূপায়ণে, প্রয়োজনের বশবর্তী হয়ে, অনেক সময় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাসাগরের যে সমস্ত রচনা এ দেশীয় পরিবেশ অবলম্বনে গড়ে উঠেছে সে সমস্ত রচনায় বিদ্যাসাগর একটি ইংরেজি শব্দও গ্রহণ করেননি (যেমন সীতার বনবাস, বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি)। এমন কি তিনি যখন শেক্সপীয়র—বিরচিত 'The Comedy of Errors'—এর বাংলা অনুবাদ করেছেন তখন তিনি 'ভ্রান্তিবিলাস' গ্রন্থে সমস্ত বিদেশী চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন এবং কোন ইংরেজি শব্দ তিনি এখানে ব্যবহার করেননি। অথচ, এই বিদ্যাসাগরই প্রয়োজনের তাগিদে কম ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেননি। উদাহরণ স্বরূপ, 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয় ভাগ) গ্রন্থটির ছোট তিনটি অনুচ্ছেদে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার রয়েছে যথেষ্ট :

...'কৌন্সিলের' অধিকাংশ 'মেম্বার' এই নিয়োগ বিষয়ে বিস্তর আপত্তি করিলেন ; কহিলেন, গুরুদাস নিতান্ত বালক, তাহাকে নিযুক্ত করায়, তাহার পিতাকে কখনও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। 'হেষ্টিংস' তাহাদের পরামর্শ না শুনিয়া, গুরুদাসকেই নিযুক্ত করিলেন।

এই সময় 'ইংলণ্ডে' 'কোম্পানির' বিষয়কর্ম্ম অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছিল। ১৭৭৬ সালে 'হেষ্টিংসের' নিয়োগ পর্য্যন্ত, পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষে যেমন ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, 'ইংলণ্ডে ডিরেক্টরদিগের' কাজও তেমনই বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। যৎকালে 'কোম্পানির' দেউলিয়া হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাদৃশ সময়ে 'ডিরেক্টরেরা' মূলধনের অধিকারীদিগকে, শতকরা সাড়ে বার টাকা হিসাবে, মুনাফার অংশ দিলেন। যদি তাঁহাদের বিলক্ষণ উন্নতি থাকিত, তথাপি, তদ্রূপ মুনাফা দেওয়া, কোনও মতে উচিত হইত না। যাহা হউক, এইরূপ পাগলামি করিয়া, 'ডিরেক্টরেরা' দেখিলেন ধনাগারে এক কপর্দ্দকও সম্বল নাই। তখন তাহাদিগকে, 'ইংলণ্ডের' 'বেঙ্কে' প্রথমতঃ চল্লিশ লক্ষ, তৎপরে আর বিশ লক্ষ টাকা ধার করিতে হইল। পরিশেষে, রাজমন্ত্রীর নিকটে গিয়া, তাঁহাদিগকে এক কোটি টাকা ধার চাহিতে হইয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত, 'পার্লিমেণ্টের' অধ্যক্ষেরা, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু, এক্ষণে 'কোম্পানির' বিষয়কর্ম্মের এবম্প্রকার দুরবস্থা প্রকাশিত হওয়াতে, তাঁহারা সমুদায় ব্যাপার আপনাদের হস্তে আনিতে মনন করিলেন। 'কোম্পানির' শাসনে যে সকল অন্যায় আচরণ হইয়াছিল, তাহার পরীক্ষার্থে এক 'কমিটী' নিয়োজিত হইল। ঐ 'কমিটী' বিজ্ঞাপনী প্রদান করিলে, রাজমন্ত্রীরা বুঝিতে পারিলেন, সম্পূর্ণরূপে নিয়মপরিবর্ত্ত না হইলে, 'কোম্পানির' পরিত্রাণের উপায় নাই। তাহারা সমস্ত দোষের সংশোধনার্থে, 'পার্লিমেণ্টে' নানা প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। 'ডিরেক্টরেরা' তদ্বিষয়ে, যতদূর পারেন, আপত্তি করিলেন ; কিন্তু, তাঁহাদের অসদাচরণ এত স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল, ও তাহাতে মনুষ্য মাত্রেরই এমন ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে, 'পার্লিমেণ্টের' অধ্যক্ষেরা, তাহাদের সমস্ত আপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া, রাজমন্ত্রীর প্রস্তাবিত প্রণালীরই পোষকতা করিলেন।

(বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যাদি পরিবেশনে অক্ষয়কুমারের লেখনী সর্বাধিক সক্রিয় থাকলেও, ইংরেজি শব্দের ব্যবহার বর্জনে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। একমাত্র বিদেশী স্থানের নাম, ব্যক্তির নাম এবং গ্রন্থের নাম ব্যতীত তিনি

ইংরেজি শব্দ ব্যবহারে উৎসাহ বোধ করেননি। বরং বিজ্ঞান, দর্শনে ব্যবহৃত নানা ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রতি তিনি অধিক আগ্রহশীল ছিলেন। বিদ্যাসাগর অবশ্য যেমন ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন, তেমনি বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সক্রিয় থেকেছেন।

পূর্ববর্তী পর্যায়ের মতোই, আলোচ্য যুগে, বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে শব্দ গ্রহণের ক্ষেত্রে দুই ধরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়: অবিকলভাবে ইংরেজি শব্দ গ্রহণ (তৎসম জাতীয় শব্দ) এবং বিকৃত উচ্চারণে বা আকারে ইংরেজি শব্দ গ্রহণ (অর্ধ বা ভগ্ন তৎসম জাতীয় শব্দ): এই অধ্যায়ে প্রদর্শিত উদাহরণ থেকে এই দুই ধরণের কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করছি:

তৎসম জাতীয় শব্দ:

Committee—কমিটি।
Pinnace—পিনেস।
Electric—ইলেকট্রিক।
Telegraph—টেলিগ্রাফ।
Telegram—টেলিগ্রাম।
Police—পুলিশ।
Civilisation—সিভিলিজেসন।
Municipality—মিউনিসিপ্যালিটি।
Politics—পলিটিক্স্।
Medal—মেডাল।
Right—রাইট।
Deposit—ডিপোজিট।
Report—রিপোর্ট।
Harmonium—হারমনিয়ম।

ভগ্ন বা অর্ধ তৎসম জাতীয় শব্দ:

Sergeant—সার্জন
Warrant—ওয়ারেণ।
Lantern—লাল্ঠন্।
Shake hand—সেকেহ্যান।
Hydrogen—হযড্রজন।
Amateur—আমেতিওর।
Sheriff—সরিফ।
Captain—কাপ্তেন।
Magistrate—মেজষ্টর।
Buckles—বগলস।
Piano—পাইনো।
Tower—টোয়ার।
Summon—সমন।
Directors—ডৈরকটর্স।

এই ভাবে কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ বংগীয় রূপ লাভ করেছে। আবার, কোন কোন ইংরেজি শব্দ ভাষাতত্ত্বের স্বরাগম (Prothesis)-এর রীতি অনুসরণ করে

বাংলা শব্দভাণ্ডারে স্থান লাভ করেছে। এই যুগে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরছি :

Stick—ইষ্টিক। Station—ইস্টেশন।
Stocking—ইস্টকিং Stamp—ইস্টাম্প।
Steamer—ইষ্টিমার ইত্যাদি।

কিছু কিছু সঙ্কর শব্দ (Hybrid) এর ব্যবহারও এযুগে লক্ষ্য করা যায় :

হেডকেরাণি / জজপণ্ডিত / জেলখালাসি ইত্যাদি।

সুতরাং অতিথি হিসাবে এসব আগন্তুক শব্দকে কিছুদিনের মতো বাংলার শব্দ ভাণ্ডারে ভিন্ন মর্যাদার আসন না দিযে বরং অবয়বের পরিবর্তন করে চির দিনের মতো বাংলা শব্দ-জগতের অধিবাসীতে পরিণত করবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয। বিদ্যাসাগরের 'শব্দ সংগ্রহে' তাই বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি শব্দও সংগৃহীত হযেছে।

বিভিন্ন ইংরেজি শব্দ ঠিক এই কারণেই বাংলা ব্যাকরণের নিযম অনুসরণ করে ব্যবহার করা হযেছে।

ইংরেজি শব্দের সংগে বাংলা শব্দের সন্ধি :

Gospel+অন্তর্গত=গস্পেলান্তর্গত।
Christ (খ্রীষ্ট)+উপদিষ্ট=খ্রীষ্টোপদিষ্ট।
England (ইংলণ্ড)+ঈশ্বর=ইংলণ্ডেশ্বর।

ইংরেজি শব্দ+বাংলা প্রত্যয :

ব্রিটেন+ঈয=ব্রিটেনীয। টিচার+ই=টিচারি।
কালেজ+ই=কালেজি। এডিটর+ঈ=এডিটরী।
খ্রীষ্ট+ঈয=খ্রীষ্টীয। গবর্নর+ঈ=গবর্নরী ইত্যাদি।
ডাক্তার+ই=ডাক্তারি।

ইংরেজি শব্দ+বাংলা বিভক্তির চিহ্ন :

একবচন	বহুবচন
প্রথমা মেম্বর / ডিরেক্টর ইত্যাদি	মেম্বরেরা (মেম্বর+এরা) ডিরেক্টরেরা (ডিরেক্টর+এরা) ইত্যাদি।

একবচন বহুবচন

দ্বিতীয়া মেম্বরদিগকে [মেম্বর+দিগকে]
ডিরেক্টরদিগের [ডিরেক্টর+দিগের]
ইত্যাদি।

ষষ্ঠী কোম্পানির (কোম্পানি+র)
পিলের (পিল+এর)
বেঞ্চের (বেঞ্চ+এর)
ইত্যাদি

সপ্তমী বোর্ডে (বোর্ড+এ)
ব্রিটেনে (ব্রিটেন+এ)
স্টেশিয়ানে (স্টেশিয়ান+এ)

বাংলায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধির সংগে সংগে কালক্রমে ইংরেজি শব্দের সংগে বাংলার সর্ব প্রকার বিভক্তই যুক্ত হয়েছে। আলোচ্য যুগে যে বিভক্তিগুলি মূলতঃ ব্যবহৃত হযেছে সেগুলিই নমুনা স্বরূপ উপরে উদ্ধৃত হযেছে।

খ. পরিভাষা :

বিভিন্ন ইংরেজি 'term'-এর বাংলা পরিভাষা অন্বেষণ পূর্ববর্তী যুগেই শুরু হয়েছিল। এ যুগে পরিভাষার অন্বেষণ ব্যাপকতর হয়ে ওঠে এবং বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের মতো প্রতিভাবান গদ্যশিল্পী এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকারও অবদান কম ছিল না। যে কোন ভাষার স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ অগ্রগতির জন্য পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন। আমাদের গদ্যশিল্পীরা এই প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রেখে পরিভাষা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ যুগে ব্যবহৃত মূল্যবান পরিভাষাসমূহ উৎকলিত করছি :

বিদ্যাসাগর :

Steam. Navigation=বাষ্পনাবিক কর্ম।

(বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ)

Republic=সর্ব্বতন্ত্র (আখ্যানমঞ্জরী, তৃতীয় ভাগ)

Microscope=অনুবীক্ষণ (বোধোদয়)

Arithmetic of Infinites = অস্থিত পাটীগণিত।

Botany = উদ্ভিদ বিদ্যা।

Focal Distance = আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি।

Colonial = ঔপনিবেশিক।

Perverted = অযথাভূত।

Orbit = কক্ষ।

Centre = কেন্দ্র।

Mathematics = গণিতশ

Planetary Nebulae = গ্রহনীহারিকা।

Museum = চিত্রশালিকা।

Milky way = ছায়াপথ।

National Law = জাতীয় বিধান।

Astronomy = জ্যোতির্বিদ্যা।

Optics = দৃষ্টিবিজ্ঞান।

Telescope = দূরবীক্ষণ।

Heavenly Bodies = জ্যোতিষ্ক।

Numismatics = টঙ্কবিজ্ঞান।

Species Planterum = উদ্ভিদ-সংবিভাগ।

Mineralogy = ধাতুবিদ্যা।

Astrology = নক্ষত্রবিদ্যা।

Equator = নাড়ীমণ্ডল/বিষুবরেখা।

Natural Law = নৈসর্গিক বিধান।

Natural Philosophy = পদার্থবিদ্যা

Observation = পর্য্যবেক্ষণ।

Satellite = পারিপার্শ্বিক/উপগ্রহ।

Ticket = প্রবেশিকা।

State = মণ্ডল/প্রদেশ/রাজ্য।

Axis = মেরুদণ্ড।

Theatre = রঙ্গভূমি।

Science = বিজ্ঞান।

Report = বিজ্ঞাপনী।

Law = ব্যবহার শাস্ত্র/ব্যবস্থা শাস্ত্র।

Lawyer = ব্যবহারাজীব।

Index = শঙ্কু।

Mixed Mathematics = বিমিশ্র গণিত।

Pure Mathematics = বিশুদ্ধ গণিত।

Elasticity = স্থিতিস্থাপকতা।

University = বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।

[জীবন চরিত]

অক্ষয়কুমার দত্ত :

Aurora Polaris = মেরুজ্যোতি।
Hydrogen = হযগ্রজন।

[চারুপাঠ, ২য় ভাগ]

Pistil/Stigma = গর্ভকেশর।
Stamen = পরাগকেশর।
Ovary/Seed-Vessel = বীজকোষ।
Hippopotamus = সিন্ধুঘোটক।

[চারুপাঠ, ১ম ভাগ]

Inertia of Motion = গতিজাড্য। Inertia of Rest = স্থিতিজাড্য।
Density = ঘনত্ব।
Relative Velocity = অপেক্ষক গতি।
Circular Motion = চক্রাবর্ত গতি। Radiation = বিকিরণ।
Conduction / Convection = পরিচালকতা। [পদার্থবিদ্যা]

Geology = ভূতত্ব। Mesmerism = মৈস্মরবাদ।
Physical = ভৌতিক। Organic = শারীরিক।
Faculty of time = কালানুভাবকতা। Firm = বাণিজ্যাগার।
Equilibrium = সমসংস্থান।
Eventuality = ঘটনাভাবুকতা।
Constructiveness = নির্মিৎসা।
Inhibitiveness = বিবৎসা।
Vaccination = গোমসূর্য্যাধান।

[বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ১ম ভাগ]

Monopoly=একচেটিয়া বাণিজ্য।

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ, ১৭৭৩]

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়[১] :

Peninsula = প্রায় দ্বীপ। Pass = শৈলবর্ত্ম।
Table land = প্রস্থ। Isthmus = সংযোগভূমি।

১. কৃষ্ণমোহনের পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনা : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩০২, পৃ ৭৭।

Rood = সিন্ধুবর্ত্ম (সমুদ্রের যে অংশে জাহাজ নির্ভরে থাকিতে পারে)।

Channel = সুঁতি। Source of River = নদীর নির্গম।

Bed of River = নদীর তল। Red Sea = লাল সমুদ্র।

Black Sea = অসিতসাগর। [বিদ্যাকল্পদ্রুম, ৮ম খণ্ড]

রামকমল ভট্টাচার্য :

Judicature = ব্যবহার দর্শন।

প্রসন্ন সর্বাধিকারীর পাটিগণিত গ্রন্থের জন্য রামকমল ভট্টাচার্য এই পরিভাষা-গুলি রচনা করেছিলেন—

[রামকমল ভট্টাচার্য, বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ]

Square = বর্গ / Square Root = বর্গমূল / Surd = করণী।

Decimal = ভগ্নাংশ। Rule of Three = ত্রৈরাশিক।

Highest Common Factor = গরিষ্ঠ সাধারণ গুননীয়ক।

Lowest Common Factor = লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক।

[বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, বিশ্বভারতী সংস্করণ, পৃ ২১ দ্রষ্টব্য]

Oral Examination = বাচনিক পরীক্ষা[৮]।

[হিন্দু কলেজ ফাইল : প্রেসিডেন্সী কলেজে রক্ষিত]

সংবাদ প্রভাকর : প্রাত্যহিক পত্র

Administration = শাসনযন্ত্র (২০ বৈশাখ, ১২৫৭)।

Monopoly = একচেটিয়া ব্যবসা (তদেব)।

Foreign Trade = বহির্বাণিজ্য (১২ মাঘ, ১২৫৮)।

Legislative Council = ব্যবস্থাপক সভা (৩০ আষাঢ়, ১২৬৯)।

Economy = ব্যয়সঙ্কোচ (৪ চৈত্র, ১২৬৫)।

৮. বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্য মেডিকেল কলেজে একটা সংক্ষিপ্ত কোর্স চালু করা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, এই সম্পর্কে বিভিন্ন কলেজে যে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল সে নোটিশ ছিল বাংলা ভাষায় লিখিত। ঐ নোটিশ থেকেই 'বাচনিক' শব্দটি উদ্ধৃত করেছি। আরো একটু অংশ তুলে ধরছি : 'ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় এনাটমি, মেটিরিয়া মেডিকা এবং মেটিরিয়া মেডিকাতে কেমিষ্ট্রির যে যে অংশ আবশ্যক এবং মেডিসিন ও সর্জরি ; চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত এই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইবেক।'—Hindu College Letters Received, 1852-54, Circular No. 7, Proc. 26 Feb., 1853, Para 24.

Limited Liability Act=দায়িত্বের পরিমাণ নিরূপক আইন
(১২ পৌষ, ১২৭০)।

Import Tax=আমদানি শুল্ক (২৯ ফাল্গুন, ১২৮৫)।
Proceedings=কার্য্যবিবরণী (২১ মাঘ, ১২৫৮)।
Standard=মান (২১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৪)।
Proclamation=ঘোষণাপত্র (২১ কার্তিক, ১২৬৫)।
Press=মুদ্রাযন্ত্র (২৯ পৌষ, ১২৬৫)।
House of Commons=প্রজাদিগের সাধারণ সভা
(২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৬)।

Petition=আবেদন পত্র (৪ চৈত্র, ১২৫৮)।
University=মহাবিদ্যালয় (৭ শ্রাবণ ১২৬০)।
[বিদ্যাসাগরের পরিভাষায়, 'বিশ্ববিদ্যালয়' এই শব্দটি
সুপ্রযুক্ত বলে অদ্যাবধি প্রচলিত]।

পাণ্ডুলেখ্য=Notice (?) (৪ চৈত্র, ১২৫৮)।
Ditto=ঐ (১১ ফাল্গুন ১২৫৯)।
Editor=সম্পাদক।
Editorial=সম্পাদকীয়।
['সংবাদ প্রভাকরে' এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে বহুল ব্যবহৃত—
শব্দগুলি এখনও একই অর্থে প্রচলিত আছে]

পরিভাষার যে তালিকা উপস্থিত করা হল সেই তালিকার অন্তর্গত বিভিন্ন পরিভাষা সে যুগের মানদণ্ডে সত্যিই প্রশংসনীয়। কিছু কিছু পরিভাষার উন্নত পরিবর্তন পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই সম্ভব হয়েছে, কিন্তু, কয়েকটি পরিভাষা যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত টিকে রয়েছে। প্রসংগক্রমে কয়েকটি পরিভাষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

আমদানি শুল্ক / শাসনযন্ত্র / একচেটিয়া ব্যবসা বা বাণিজ্য / কার্য্যবিবরণী / সম্পাদক / সম্পাদকীয় / বিশ্ববিদ্যালয় / ভূতত্ত্ব / বাণিজ্যাগার / গর্ভকেশর / পরাগকেশর / বীজকোষ / বিশুদ্ধ গণিত / বিমিশ্র গণিত / উদ্ভিদবিদ্যা / দূরবীক্ষণ / অণুবীক্ষণ / ঔপনিবেশিক ইত্যাদি।

একথা অবশ্যই স্মরণীয় যে, এ যুগের পরিভাষা সৃষ্টির এই উদ্যম উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর হাতে[৯] ব্যাপক পরিণতি লাভ করেছিল। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এই প্রচেষ্টার মূল্যবান স্বাক্ষর রয়েছে (অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) :

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা করাও অনেক চিন্তা ও চেষ্টার কাজ…বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।[১০]

চার

আলোচ্য পর্যায়ে, ইংরেজি ভাষারীতির প্রভাব বাংলা গদ্যের ভাষারীতির ওপর আরো ব্যাপক হয়ে দেখা দিল। এই ব্যাপকতা বাংলায় অনূদিত গ্রন্থগুলির মধ্যেই অধিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত সময়ের (১৮৪৩-১৮৭২) ব্যবধান মোটামুটি ত্রিশ বছর। এই ত্রিশ বছরের মধ্যেই ইংরেজি প্রভাবের ফলে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং তার সংগে সংগে ভাষারীতি বিশেষ উন্নতি লাভ করেছে।

প্রসংগক্রমে স্মরণীয়, বাংলায় অনূদিত গ্রন্থের ভাষা প্রথম পর্যায়ে ছিল অনেকটা আক্ষরিক, স্বচ্ছন্দ নয় ; কিন্তু, আলোচ্য পর্যায়ের অনুবাদ সেই তুলনায় অনেক পরিমাণে স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের অনুবাদের নমুনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছি। এখানে, তারাশঙ্কর তর্করত্নের অনুবাদের নমুনা উদ্ধৃত করছি :

তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্ত দেখিয়া সঙ্গিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার বুঝাইত এবং পুনর্বার আমোদ-প্রমোদে তাঁহার প্রীতি জন্মাইবার চেষ্টা পাইত ; কিন্তু তিনি তাহাদিগের প্রবোধ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিদিন নদীতীরে উপস্থিত হইতেন, তরুতলের ছায়ায় বসিয়া, কখন বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পক্ষিগণের মধুর কলরব শুনিতেন, কখন বা জলে মৎস্য সকল সাঁতার দিয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতে দেখিতেন, কখন বা হঠাৎ মাঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চতুর্দ্দিকে পশুসকল চরিতেছে, কোন কোন পশু শয়ন করিয়া বিশ্রাম

৯. বর্ত্তমান গ্রন্থের ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১০. রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ৫০৪।

করিতেছে, কেহ বা ঘাস খাইতেছে, কেহ বা দৌড়িতেছে, নিমেষশূন্য লোচনে অবলোকন করিতেন।

(তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রাসেলাস, ৪র্থ সংস্করণ পৃ ১৯).

ইংরেজি অংশ :

[His attendants observed the change, and endeavoured to renew his love of pleasure ; he neglected their officiousness repulsed their invitations, and spent day after day on the banks of the rivulets sheltered with trees, where he sometimes listened to the birds in the branches, sometimes observed the fish playing in the stream, and anon cast his eyes upon the pastures and mountains filled with animals, of which some were biting the herbage, and some sleeping among the bushes.]

(Rasselas : Prince of Abyssinia, Ch. II, The Discontent of Rasselas in the Happy Valley).

অবশ্য, বিদ্যাসাগরের মতো স্বচ্ছন্দ অনুবাদের আদর্শ আলোচ্য পর্যায়ে কোন গদ্যকারই প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।

সপ্তম অধ্যায়

বিষয়বস্তু (১৮৭২-১৯০০)

গদ্যশিল্পী ভূদেব, কালীপ্রসন্ন, অক্ষয়চন্দ্র, রমেশচন্দ্র, বিবেকানন্দ, বলেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, চন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ এবং অন্যান্য

এক

উনিশ শতকের শুরু থেকে সুদীর্ঘ বাহাত্তর বছর ধরে বাংলা সাহিত্য, বিষয়বস্তু এবং ভাষারীতির ক্ষেত্রে, অনেক পরিমাণে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। বিষয়বস্তু ও ভাষারীতি—একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে প্রভাবের দুই পর্যায় বা ধাপ অতিক্রম করে যখন তৃতীয় পর্যায়ে (১৮৭২-১৯০০) উপনীত হল তখন বাংলা গদ্য সাহিত্যের আকাশে প্রতিভা-দীপ্ত প্রবন্ধশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের উদয় হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য সাহিত্য-সাধক ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবকে যথার্থ ভাবের সাহিত্য বর্ণনে কার্যকরী করে তুলতে সমর্থ হলেন, এই পর্যায়ে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। এইসময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণায়-নির্দেশনায় বাংলা গদ্য সাহিত্য অতি দ্রুত যৌবনসুলভ শক্তি ও সুষমা লাভ করেছিল। কবিগুরুর ভাষায়:

> কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গ ভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।
>
> (রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক সাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্র)

আলোচ্য পর্যায়ে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের আসরে ছিলেন উজ্জ্বল মধ্য-মণিস্বরূপ। সেদিনকার সমস্ত সাহিত্যিকই তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবর্তিত হয়েছেন:

> তখন (১৮৮৪) কলিকাতার কলুটোলায় বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সম্রাটরূপে বিরাজমান। তাঁহার বৈঠকখানায় প্রতি রবিবার সাহিত্যসভা হইত। উপস্থিত থাকিতেন—চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মজুমদার প্রভৃতি। মধ্যে মধ্যে আসিতেন বারাসত হইতে তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমানের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও চট্টগ্রামের নবীনচন্দ্র সেন। অক্ষয়চন্দ্র নিয়মিতভাবে প্রতি রবিবার অপরাহ্নে তো বটেই এবং অন্যদিন অন্যসময়েও বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘিরিয়া সে এক অভূতপূর্ব মজ্‌লিস্।[১]

'বাংলার লেখকদিগের গুরু', 'বাংলার পাঠকদিগের সুহৃদ' বাংলার সাহিত্য-নায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা পরবর্তী একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে আলোচ্য পর্যায়ের অন্যান্য সাহিত্যিকদের গদ্য রচনায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব আলোচিত হবে।

আলোচ্য পর্যায়ের ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা গদ্য সাহিত্যেও জ্ঞানের সাহিত্য এবং ভাবের সাহিত্য এই দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। তৃতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানমূলক রচনা এবং সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতিমূলক রচনা জ্ঞানের সাহিত্যের ধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। প্রতীচ্য বিজ্ঞান চিন্তার প্রভাবে পূর্ববর্তী দু'টি পর্যায়ে বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ/অনুসরণের মাধ্যমে মিশনারিগণ এবং অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর বিজ্ঞানমূলক আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন।

বর্তমান পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম হাক্সলীর আদর্শ অনুসরণে জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ **Popular Scientific Essays** রচনার সূত্রপাত করেছিলেন।[২] বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ করে কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি অনেকেই এই ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর অবশ্য এই ধারার সর্বোৎকৃষ্ট লেখক ছিলেন। তাঁর বিজ্ঞানমূলক নিবন্ধাদির ব্যাপ্তি ও গভীরতা অনেক বেশী। যাই হোক বিজ্ঞানমূলক এই সমস্ত রচনায় পাশ্চাত্যের অনেক বৈজ্ঞানিকের প্রভাবই ছিল সক্রিয়।

এই পর্যায়ের বিজ্ঞানমূলক রচনাদি একদিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনভিত্তিক সংকীর্ণ সীমা থেকে ক্রমশঃ মুক্তি পেয়েছে, অপরদিকে বাংলা গদ্যের প্রকাশ ক্ষমতার ক্রমিক উৎকর্ষের ফলে রচনা-সৌকর্যের গুণে অনেক সময় ভাবের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে (রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানমূলক নিবন্ধাদি স্মরণীয়)।

সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতিমূলক আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল পূর্ববর্তী পর্যায়ে। কিন্তু, আলোচ্য পর্যায়ে, এই ধরণের আলোচনা হয়ে উঠেছে ব্যাপ্ত

১. কালিদাস রায় সম্পাদিত, অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার, ভূমিকা, পৃ ১৩।

২. বর্তমান গ্রন্থের ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এবং গভীর। প্রতীচ্যের অনেক সমাজ-বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের রচনাবলীর প্রভাব এই ধরণের নিবন্ধে লক্ষ্য করা যায়। এই ধারার পরিপুষ্টি সাধনে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, কালীপ্রসন্ন, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম স্মরণীয়।

বাংলা গদ্যে ভাবের সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব অনুসরণ করে, এই পর্যায়ে, রম্য রচনা ও আত্মভাবনামূলক রচনা, সাহিত্য সমালোচনা, পত্র সাহিত্য এবং চরিত সাহিত্যের ধারায় প্রসারতা লাভ করেছিল। তাছাড়া, ভাবের সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা উপন্যাসের স্বর্ণ যুগের সূত্রপাত ঘটে এই পর্যায়ে। তবে, উপন্যাসের আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের সুযোগ-বহির্ভূত।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের এই সমুদয় ধারাই ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের ফলে গড়ে উঠেছিল। অবশ্য, এই সমস্ত ধারার মধ্যে চরিত সাহিত্যের ধারাটি ষোড়শ শতাব্দীতেই পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। কিন্তু, ইংরেজি আদর্শের অনুপ্রেরণায় ধর্ম ও অলৌকিকতার নির্মোক থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক আলো হাওয়ার মুক্ত পরিবেশে বাংলা জীবন-চরিত সাহিত্য নতুন করে গড়ে উঠল, উনিশ শতকে। মধ্যযুগের ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে ধর্ম-বহির্ভূত দৃষ্টিভঙ্গি আশা করা যায় না :

> একথা অবশ্য স্বীকার্য, যে প্রদীপ্ত, মানবপন্থী (humanistic) দৃষ্টি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রণয়ন করেছিলেন সে দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগের ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে আশা করা দুরাশামাত্র। তাঁদের পক্ষে ফরাসী পজিটিভিস্ট কঁৎ (Comte) ও তাঁর অনুগামী জন স্টুয়ার্ট মিলের শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতো লোকাচার ও দেশাচারের উর্ধ্বে উঠে বলা কি সম্ভব ছিল ?[৩]

ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের ধারা আলোচ্য পর্যায়েও সক্রিয় ছিল। কিন্তু, অনুবাদের ধারা মৌলিক রচনার তুলনায় ছিল অনেকটা শীর্ণকায়। সাময়িক পত্রের ধারা এই যুগে যথার্থ পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। সাহিত্যধর্মী নানা ধরণের রচনা 'বঙ্গদর্শন', 'নবজীবন', 'সাধারণী', 'সাধনা', 'ভারতী', 'বান্ধব', 'বালক', প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বাংলা গদ্যে ভাবের সাহিত্যের সমৃদ্ধি দান করেছিল। এই পর্যায়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সমস্ত রচনাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ে, স্বতন্ত্র ধারায় সাময়িক পত্রের আলোচনা না করে বিভিন্ন গদ্য-

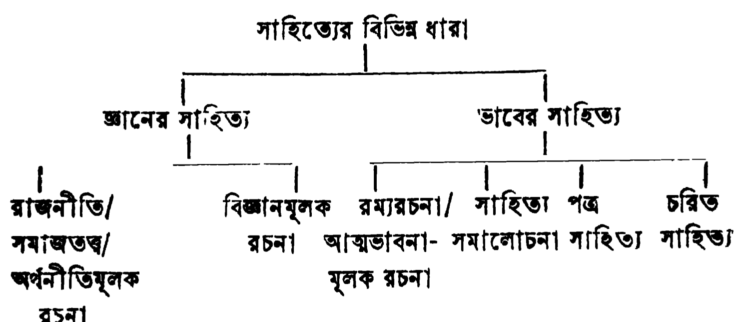
৩. দেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা চরিত সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, পৃ ৩৭।

শিল্পীর রচনাবলীর আলোচনা প্রসংগে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর প্রসংগ স্থান পেয়েছে।

আলোচ্য পর্যায়ে জ্ঞানের সাহিত্যে অনুবাদ ও অনুসরণ এবং ভাবের সাহিত্যে মৌলিক রচনার আধিপত্য প্রেক্ষণীয়।

তৃতীয় পর্যায় (১৮৭২—১৯০০)

ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা জ্ঞানের সাহিত্য ও ভাবের সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা



দুই

জ্ঞানের সাহিত্য

ক. রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতিমূলক রচনা :

ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯৪) বাংলা ভাষায় লেখা সমাজতত্ত্ব এবং রাজনীতি বিষয়ক একটি আদর্শ গ্রন্থ, অথচ আজও অবহেলিত :

> সামাজিক প্রবন্ধের ন্যায় গ্রন্থ ইউরোপীয় কোন প্রধান ভাষায় লিখিত হইলে বিশ্বব্যাপী খ্যাতিলাভ করিত, বাংলা ভাষায় অনূদিত হইত এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হইত। বাংলা ভাষায় লিখিত বলিয়াই কি বাঙালীর সমাদরে বঞ্চিত থাকিবে এই বঙ্গগৌরব গ্রন্থখানি ?
>
> (প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, ভূদেব রচনা সম্ভার, ৩য় সংস্করণ, ভূমিকা পৃ ১).

ভূদেবের এই গ্রন্থটি অনুবাদ নয়, ইংরেজি অথবা প্রতীচ্য কোন গ্রন্থবিশেষের অনুসরণও নয়। এই গ্রন্থের পশ্চাতে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে এই পর্যায়ের দুই প্রধান প্রবন্ধশিল্পী, বঙ্কিমচন্দ্র এবং ভূদেব, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে একদিকে যেমন বৈপরীত্য লক্ষ্য করেছেন তেমনি এই বৈপরীত্যের মধ্যে সমন্বয়-সূত্র

অন্বেষণে সক্রিয় থেকেছেন। ইংরেজি তথা প্রতীচ্যের প্রভাব অনুসরণের ক্ষেত্রে এই ধরণের প্রবণতা আলোচ্য সময়ে লক্ষ্য করা যায়।

রাজনীতি তথা রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে ভূদেবের আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় অনেকটা বিস্তৃত এবং ধারাবাহিক। আর, ভূদেব পাশ্চাত্য দর্শন অনুসরণ করে বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথম কয়েকটি বিষয়ে সার্থক আলোচনার সূত্রপাত করেন।

'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থটির শুরু হয়েছে জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তা সংবর্ধনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা দিয়ে। জাতীয়তাবাদ (Nationalism) সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে ভূদেবের ওপর জন স্টুয়ার্ট মিল-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দার্শনিক লেকি-র দ্বারাও তিনি কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। ভূদেব যে লেকি-র রচনার সংগে সুপরিচিত ছিলেন তা জানা যায় কুমারদেব মুখোপাধ্যায়-বিরচিত 'ভূদেব চরিত' গ্রন্থের ষড়বিংশ অধ্যায়ে সংগৃহীত ভূদেব কর্তৃক লিখিত পত্রাবলী থেকে।

ভূদেব বলেছেন,

> জাতীয়ভাব বর্ণাত্মকতাতেই নিবদ্ধ নয় লোক সকলের মধ্যে সকলপ্রকার বিচ্ছেদ নষ্ট করিয়া সম্মিলন ও একতা জন্মাইবার অমোঘ উপায় এক রাজার শাসন এবং শাসন পদ্ধতি—এই উপায়ের দ্বারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন বর্ণ সম্ভূত জনগণের মধ্যেও জাতীয়ভাব জন্মে, কারণ এক শাসন পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ফল জনগণের সমসুখদুঃখতা বা সহানুভূতি, এবং তাহাই জাতীয় ভাব জন্মিবার সর্বপ্রকার কারণ এবং ঐ ভাবের সর্বপ্রধান লক্ষণ।
>
> (প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, ভূদেব রচনা সম্ভার, ৩য় সংস্করণ, পৃ ৯-১০)

জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন :

> **A portion of mankind may be said to constitute a nationality if they are united among themselves by common sympathies...**[৪]

মিল যাকে বলেছেন 'common sympathies' ভূদেব তাকে বলেছেন "সমসুখদুঃখতা'। ভূদেব বলেছেন যে 'জাতীয় ভাব বর্ণাত্মকতাতেই নিবদ্ধ নয়।"

৪. Garner, Political Science.

তাই তিনি লেকি সাহেবের সংগে সুর মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত বলেছেন যে ভাষা এবং উচ্চারণ সাদৃশ্য জাতীয় ভাব সৃষ্টির একটি প্রধান উপাদান হলেও বিভিন্ন বর্ণের লোকের মধ্যে জাতীয় ভাব জাগ্রত হবার সম্ভাবনা অস্বীকার করা চলে না। লেকি সাহেবও এ ধরণের বক্তব্য রেখেছিলেন :

'Community of race and community of language are undoubtedly the most important of these elements, but it is necessary to recognise that neither is absolutely essential .. many existing races are mixed in character.'[৫]

ধর্মভেদ যে জাতীযভাবের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না, ভূদেব এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত :

বর্তমানে ভারতবর্ষে জাতীযভাব সৃষ্টির প্রতিবন্ধক ধর্ম নয়, ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর বিভেদ সৃষ্টিকারী মনোভাব।

(প্রমথনাথ বিশী, সম্পাদিত, ভূদেব রচনা সম্ভার, ৩য় সংস্করণ, সামাজিক প্রবন্ধ, পৃ ১৩ ।)

প্রসংগক্রমে স্মরণীয়, আমাদের জাতীয়ভাব সংবর্ধনের প্রশ্নে ধর্মের প্রতিবন্ধকতা তথা হিন্দু-মুসলমান সমস্যার ওপর ভূদেবই সর্বপ্রথম আলোকপাত করেছেন এবং এই দিক থেকে 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'জাতীয় ভাব—ভারতবর্ষে মুসলমান' শীর্ষক রচনাটি রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তরে'র অন্তর্গত হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির পূর্বসূরি।

সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে ভূদেব হার্বার্ট স্পেনসার[৬] এর জৈব মতবাদ কিছুটা সমালোচনা করেছেন :

ইউরোপের অতি বড নব্য পণ্ডিতেরাও[৭] অনেক সময সমাজ শরীরকে

৫. Ibid.

৬. হার্বার্ট স্পেনসার উনিশ শতকের বাঙালীর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। যদুনাথ রায় হার্বার্ট স্পেনসারের প্রবন্ধাবলীর কিছুটা অনুবাদ করেন 'শিক্ষাবিচার'' (১৮৭০) গ্রন্থে। কয়েক বৎসর পর শ্যামলাল গোস্বামী হার্বার্ট স্পেনসারের 'এডুকেশন' গ্রন্থটির বাংলায় অনুবাদ করেন। পরে বিবেকানন্দও এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে স্পেনসারের প্রসংগ উল্লেখ করেছেন।

৭. সর্বপ্রথম প্লেটো (Plató) এবং সিসেরো (Cicero)-র রচনায় জৈব মতবাদের সূত্র পাওয়া যায়। পরে হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ-ও (Comte) এই মতবাদ সমর্থন করেন।

প্রাণি শরীরের সহিত তুলনা করেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে প্রাণি শরীর যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুসকলের সমষ্টি—সমাজ শরীরও তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুল পরিবারের সমষ্টি।...তাঁহারা দেখিয়াছেন, যেমন প্রাণিশরীর হইতে অনুসকল নিরন্তর বিচ্ছিন্ন হইয়া বহির্গত হইয়া যাইতেছে, এবং নূতন অনুসকল আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতেছে, সেইরূপ সমাজ শরীর হইতেও লোক সকল মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে, আবার নূতন লোক-সকল জন্মিয়া সমাজের পোষণ করিতেছে।

(প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, ভূদেব রচনা সম্ভার, ৩য় সংস্করণ পৃ ৪৮)

ভূদেব এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন :

ফলতঃ যদি উপমার দ্বারাই বুঝিতে হয়, তবে সমাজ শরীরকে প্রাণি শরীর না ভাবিয়া উহাকে দেব শরীর মনে করাই শ্রেয়ঃ। দেব শরীরের আরম্ভ নাই, তেমনি, কোন সমাজ পৃথিবীতে কোন সময়ে আবির্ভাব হইয়াছে তাহারও নিশ্চয়তা নাই।...দেব শরীর আপনা হইতে নষ্ট হয় না; সমাজও আপনা হইতে মরে না। (তদেব)

এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে লেখক পাশ্চাত্যের দার্শনিক ভ্যাটেল (Vattel)-এর উক্তি৮ উদ্ধৃত করেছেন।

রাজার সমাজ প্রতিভূত্ব সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে ভূদেব পাশ্চাত্যের সামাজিক চুক্তি মতবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর মতে ভারতবর্ষে এই ধরণের চুক্তির পরিকল্পনা কদাপি হয়নি। এর কারণ, ভারতবর্ষে রাজশক্তিকে দমিত রাখতে প্রবলতর ধর্মশাসন বিদ্যমান ছিল। এই মতবাদকে তিনি নিছক কাল্পনিক এবং ইউরোপ খণ্ডে বহু বিপ্লব ও রক্তপাতের কারণ হিসাবে গণ্য করেছেন। অবশ্য, ভারতীয় ও ইউরোপীয় মনোভাবের মধ্যে তিনি শেষ পর্যন্ত একটা ঐক্য লক্ষ্য করেছিলেন :

কিন্তু যাহাই হউক ভারতবর্ষীয়েরা বিধি প্রতিপালনকেই যেমন ধর্ম ব্যবহারের নিদানভূত জ্ঞান করেন, ইউরোপীয়েরা চুক্তি অনুসরণ করাকেও প্রায় সেই চক্ষে দেখেন। এই জন্যই রাজা ও প্রজার মধ্যে চুক্তি কল্পনা ইউরোপীয়দিগের মনে উদিত হইয়াছিল। এই কাল্পনিক মতবাদ স্থায়ী হয়

৮. 'Society is a moral individual essentially different from a physical individual'—Vattel.

নাই বটে, কিন্তু ইউরোপীয় রাজ্যগুলিতে যে ক্রমে ক্রমে রাজ্যের শারীরিক বিধির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে এবং রাজাগণ সেই ব্যবস্থানুযায়ী হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পূর্বেই ঐ চুক্তি সম্বন্ধীয় মতের বহুল প্রচার হইয়াছিল। ফলতঃ পূর্বের কল্পনাটিই কার্য্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে এবং রাজা সমাজের প্রতিভূমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—স্বকীয় অধিকারের ভাব তিরোহিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষেও ধর্মশাসনের স্বতন্ত্রতা থাকায় প্রকৃত প্রস্তাবে রাজার সমাজ প্রতিভূত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল ; তবে ইউরোপের ন্যায় এখানে সামাজিক চুক্তির কল্পনার অথবা পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্র বিপ্লবান্তে নূতন করিয়া শারীরিক ব্যবস্থা প্রণয়ণের প্রয়োজন হয় নাই।

(প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, ভূদেব রচনা সম্ভার, ৩য় সংস্করণ, পৃ ১২২-১২৩)

ভূদেব সাম্যবাদ (Socialism) এর আলোচনা করেছেন তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে। সাম্যবাদের বাস্তবতা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। আদর্শ হিসাবে সাম্যবাদ নিঃসন্দেহে কাম্য বলে তিনি মনে করেছেন। কিন্তু, প্রাকৃতিক জগতে যেমন সাম্য নেই, তেমনি মানবিক জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলে তিনি বিবেচনা করেছেন :

মানুষে মানুষে সমান, এই ভাব হইতে পরপীড়ন হ্রাস পাইয়াছে, সাধারণের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে···সাম্যবাদের যে কতকটা ঐরূপ শুভ ফল আছে তদ্বিষযে সংশয় নাই এবং উহার ঐ সকল শুভ ফল আছে বলিয়াই দুঃখজীবী জনসাধারণের কর্ণে সাম্যবাদ বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়।···

মুখে যিনি যাহাই বলুন, সামান্যতঃ মানুষ মানুষের অপেক্ষা বড় হইতে চায়। অতএব একপক্ষে সাম্যধর্ম পালন, পক্ষান্তরে অন্য মানুষ অপেক্ষা আপনি বড় হইবার প্রয়াস, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য ঘটিয়া উঠে না। সাম্যবাদটা কথায় মাত্র থাকে, ব্যবহারে বড়ই বৈষম্য উপস্থিত হয়।

(তদেব)

ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্যের মানুষের কাছেও সাম্যবাদ ছিল সম্পূর্ণ এক নতুন দর্শন। প্রচলিত দার্শনিক তথা রাজনৈতিক চিন্তাধারার মর্মমূলে আঘাত করেছিল এই দর্শন। আমাদের মতো দেশেও সে যুগে নবোদ্ভূত মতবাদ সম্বন্ধে কম আগ্রহ দেখা যায় নি।

ভূদেব বিপ্লব (revolution) অপেক্ষা বিবর্তন (evolution)-এর প্রতি অধিক আস্থাবান ছিলেন। তাঁর মতে :

সময় সময় সমাজের কোন কোন নিয়ম পরিবর্তিত হইয়া যায় বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়মের সহিত মানুষের পরিধেয় বস্ত্রের কোন সাদৃশ্য নাই। নিয়মগুলি অন্তর্ভুক্ত বস্তু, পরিধেয় বস্ত্রের মত বাহির হইতে আনীত বস্তু নয়। উপমার দ্বারা উহাদের প্রকৃতি বুঝিতে হইলেও ঐগুলিকে সমাজরূপ গৃহের কড়ি, বর্গা, ইস্টকাদির ন্যায় মনে করা যাইতে পারে। কোনটি মচকাইলে বা ক্ষত হইলে বা লোনা ধরিলে বদলাইতে হয়…আর বদল করিবার সময়ও খুব সাবধানে ঠেকো দিয়া এবং কোনরূপ বিভ্রাট না ঘটে তাহার উপায় করিয়া বদলাইতে হয়।

(প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, ভূদেব রচনা সম্ভার, ৩য় সংস্করণ, পৃ ৪৭)

ঠিক এই কারণেই ফরাসী বিপ্লব এবং ইউরোপের অন্যান্য বিপ্লব অনেকটা অহেতুক রক্তারক্তি আহ্বান করেছিল বলে ভূদেব মনে করেছেন। এই ধরণের মনোভাবের[৯] ক্ষেত্রে ভূদেব সম্ভবতঃ তাঁর প্রিয় দার্শনিক এমারসন এবং কার্লাইল-এর 'The French Revolution' গ্রন্থের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন।

প্রবন্ধশিল্পী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য মন্ময়তা হলেও, প্রতীচ্য চিন্তা জগৎ অনুসরণ করে তিনি অর্থনীতি এবং রাজনীতি বিষয়ক কতিপয় মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন :

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও আহার্য্য সংস্থান /[১০] অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ [১১]/ অভিব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর /[১২] রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল তত্ত্বের প্রযোগ /[১৩] সশস্ত্র যুরোপ /[১৪] ইত্যাদি।

'লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ও আহার্য্য সংস্থান' প্রবন্ধে লেখক ম্যালথাস-তত্ত্বের

৯. 'Society can be maintained without artificial restraints.' (The Complete Works of R. W. Emerson, Centenary Edition, Vol III, p 220)

১০. সাধনা, শ্রাবণ, ১৩০০।

১১. তদেব, চৈত্র, ১২৯৮।

১২. তদেব, বৈশাখ, ১২৯৯।

১৩. তদেব, চৈত্র, ১২৯৮।

১৪. তদেব, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০।

ওপর নির্ভর করে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন। এই প্রবন্ধ রচনার কিছুকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় কথোপকথনের মাধ্যমে ম্যালথাস-এর তত্ত্ব সহজভাবে তুলে ধরেছিলেন। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি অনেক তথ্য সমৃদ্ধ। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আহার্য উৎপাদনের অনুপাত তিনি 'প্রগ্রেশন'-এর মাধ্যমে পরিস্ফুট করেছেন। তিনি ম্যালথাস-তত্ত্বের ওপর সমসাময়িক যুগে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছিল, তার সংগেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধে লেং সাহেব প্রণীত অনুপাতের তালিকা উদ্ধৃত করা হয়েছে :

লোকসংখ্যা	২	৪	৮	১৬	৩২	৬৪	১২৮...
আহার্য্য	২	১২	২২	৩২	৪২	৫২	৬২...

'অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ' এবং 'অভিব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর' নিবন্ধ দু'টিতে বলেন্দ্রনাথ ডারউইন সাহেবের বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি কিছুটা নৃতত্ত্ব এবং কিছু প্রাণীতত্ত্ব-র সংমিশ্রণে রচিত। ডারউইন-এর তত্ত্ব উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন নিবন্ধে ডারউইন-এর উল্লেখ আছে। বলেন্দ্রনাথের নিবন্ধে অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে ডারউইন ছাড়াও অন্যান্যদের বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে। এই প্রসংগে তিনি রোমানিস্[১৫] গুলিক[১৬] এবং লে কঁৎ[১৭] প্রভৃতির বক্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ডারউইন-এর অভিব্যক্তি-বাদ সম্বন্ধে এ ধরণের একটি তথ্যপূর্ণ ও স্বচ্ছ আলোচনা সে যুগে বাংলা গদ্যে দেখা যায়নি।

'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রিমিন্যাল তত্ত্বের প্রযোগ' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক

১৫. জর্জ জন রোমানিস্ : ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কানাডায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে দেহত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন 'ফিজিওলজি'-র অধ্যাপক এবং চার্লস্ ডারউইনের বন্ধু। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'The Philosophy of Natural History Before and After Darwin (১৮৮৮) [Ed. Barnhart Clarence, The New Century Cyclopaedia, Vol III, p 3334 দ্রষ্টব্য]

১৬. জন টমাস গুলিক : (১৮৩২-১৯২৩) : একজন মিশনারি এবং জীববিদ্যাবিশারদ। উনিশ শতকে প্রকাশিত তাঁর দুটি গ্রন্থ : 'The Divergity of Evolution under one set of External Conditions' (1872) এবং Divergent Evolution through Cumulative Segregation' (1887)। Ibid, Vol II, p 1864.

১৭. Le Comte-র 'Evolution' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে।

'এ্যানার্কিজম্'-এর ওপর কটাক্ষপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'লম্‌ব্রোজো[১৮] সাহেব দেখাইতে চাহেন যে, এ্যানার্কিষ্ট সম্প্রদায়ের চেহারা ক্রিমিনালদিগের হইতে বিশেষ তফাৎ নহে।' অবশ্য, কোন কোন উৎসর্গীকৃত প্রাণ দেশ-প্রেমিকের ক্ষেত্রে তিনি ক্রিমিন্যাল আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন।

লেখকের আন্তর্জাতিক রাজনীতির চেতনা প্রকাশ পেয়েছে 'সশস্ত্র য়ুরোপ' শীর্ষক প্রবন্ধে। ভিয়েনা কংগ্রেসের পর থেকে য়ুরোপের ক্রমবর্ধমান অস্ত্রসজ্জার চিত্র তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। এই সমস্ত রচনার মাধ্যমে বাংলা গদ্যে প্রতীচ্যের চিন্তাজগৎ বলেন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন।

প্রতীচ্যের ধারা অনুসরণ করে রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজিতে 'দি ইকনমিক্ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন। অর্থনীতির ওপর এই ধরণের একটি মূল্যবান গ্রন্থ আমাদের দেশে ইতিপূর্বে রচিত হয়নি। এই ধরণের অর্থনীতি এবং রাজনীতি বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ রমেশচন্দ্র বাংলায় রচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি ছিল অনেকটা রিপোর্ট জাতীয়। নানা তথ্য ও পরিসংখ্যান এই সমস্ত প্রবন্ধে তিনি উপস্থিত করেছেন। কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করছি :

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি / ভারতীয় দুর্ভিক্ষ / বঙ্গদেশের রাজস্ব বন্দোবস্ত / ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল / ভারতবাসীদিগের দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের কারণ / প্রভৃতি ॥

কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'নিভৃত চিন্তা' শীর্ষক গ্রন্থের কোন কোন প্রবন্ধে (বিরাট পুরুষ / অমৃত) য়ুরোপীয় বিভিন্ন দার্শনিকদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। 'বিরাট পুরুষ' শীর্ষক প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন ঘোষ পজিটিভিস্টদের প্রসংগ উত্থাপন করেছেন এবং কোঁৎ-এর 'Etre Supreme' অথবা 'The Grand Etre'-র সংগে বৈদিক সাহিত্যে চিত্রিত বিরাট পুরুষের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। 'অমৃত' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি প্রসংগক্রমে হার্বার্ট স্পেনসার, এমার্সন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এবং কার্লাইল-এর রচনা থেকে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

১৮. সীজার লম্‌ব্রোজো : (১৮৩৬-১৯০৯)—Criminal Anthropology-র অধ্যাপক—বিখ্যাত গ্রন্থ ; Le' Vono Delinquente (1876), La Pellagra in Italia (1885), L' umodigenic (1838) ইত্যাদি। [Everyman's Encyclopaedia. Vol VII, p 30]

খ. বিজ্ঞানমূলক রচনা :

আলোচ্য যুগে ইংরেজি ধারা অনুসরণ করে আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা নিবন্ধ বাংলা গদ্যের ভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে। এই ধারাটি এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞান রহস্য' দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং পরিণতি লাভ করেছিল বিজ্ঞান-তাপস রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর হাতে। বিজ্ঞানমূলক রচনার ক্ষেত্রে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ডারউইন-এর অভিব্যক্তিবাদ[১৯]-এর আলোচনা করেছেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ডারউইন-এর তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করেছেন 'নিভৃত চিন্তা' শীর্ষক গ্রন্থে :

> ...ইংরেজিতে যাহাকে ইদানীং 'Theory of Evolution' বলে, পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে, এবং মহাজন কবিদিগের বাঙ্গালায় তাদৃশ দার্শনিক মতকেই যে বিবর্ত্তবাদ বলিত, ইহারও আভাস পাওয়া যায়। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে, 'এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি'। 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ' এই নামটিও এই কথারই নিদর্শন। Evolution বলিলেও তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে না বুঝায় এমন নহে।
>
> (কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নিভৃত চিন্তা, ১ম সংস্করণ, পৃ ১৭)

বলেন্দ্রনাথ ডারউইন-এর তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন, কিন্তু, বৈজ্ঞানিক ভিত্তির জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাচীন ভারতে ও বাংলাদেশে যে ডারউইন-এর বক্তব্যের সূত্র পাওয়া যায় সেই আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। এখানে তাঁর উগ্র হিন্দুত্ববোধই প্রকট হয়ে উঠেছে, যে উৎকট হিন্দুত্ব সমন্বয়ের আদর্শ বর্জনে অগ্রসর হয়েছিল।

এই একই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকারও 'পৌরাণিক অবতারত্ব' শীর্ষক নিবন্ধে জীব-বিকাশের সন্ধিস্থলে মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি পৌরাণিক অবতারের আবির্ভাব সম্পর্কিত প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সংগে ডারউইন সাহেবের 'থিয়োরি অব ইভোলিউশন'—এর সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।

হিন্দু রক্ষণশীল মনোভাবের দ্বারা উপরি উল্লিখিত প্রবন্ধটি লিখিত হলেও, জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনার ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন ইংরেজি আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। তাঁর 'নিশীথ চিন্তা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'তারা আর ফুল' একটি বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ। লেখক অক্ষয়কুমার এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই হার্শেল, প্রোক্টর,

১৯. বলেন্দ্রনাথ বলেছেন, এই পরিভাষাটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে ব্যবহার করেন।

-লকিয়ার, স্যার রবার্ট বল, মিচেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্যের অনুসরণ করেছেন। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক উনিশ শতকের বাঙালীর বিজ্ঞান চিন্তা উদ্দীপ্ত করেছিলেন।

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনার ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ইংরেজিতে লিখিত বিভিন্ন বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুসরণে তিনিই সর্বপ্রথম বিস্তৃত আকারে এবং গভীরভাবে বিজ্ঞান-আলোচনা শুরু করেন। উনবিংশ এবং বিংশ এই উভয় শতাব্দীতেই তিনি লেখনী সঞ্চালন করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে তিনি যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনামা উল্লেখ করছি :

আকাশ তরঙ্গ[২০] / পৃথিবীর বয়স[২১] / প্রলয়[২২] / প্রাচীন জ্যোতিষ[২৩] / প্রকৃতির মূর্তি[২৪] / মাধ্যাকর্ষণ[২৫] / নিয়মের রাজত্ব[২৬] / বর্ণতত্ত্ব[২৭] / উত্তাপের অপচয়[২৮] ইত্যাদি।

এই প্রবন্ধগুলি পরবর্তীকালে 'প্রকৃতি' এবং 'জিজ্ঞাসা' এই দু'টি গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল।

প্রসংগক্রমে রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একটি প্রবন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করছি। 'প্রলয়' শীর্ষক প্রবন্ধে সূর্যের ক্রমাগত উত্তাপ ক্ষয়ের জন্য পৃথিবীর বুকে প্রলয় ঘনিয়ে আসবার অনিবার্যতা সম্বন্ধে লেখক আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধটিতে রামেন্দ্রসুন্দর হেলম্‌হোলৎজ, কেল্‌বিন এবং লাপ্লাস-এর বক্তব্যের সামঞ্জস্য বিধান করে বলেছেন :

> সূর্য্যের পরিধি বৎসরে প্রায় আশী হাত খাট হইতেছে। দু-দশ হাজার বৎসর আমরা অবশ্য তাহা টের পাই না ; কিন্তু অর্দ্ধ কোটি বৎসরের মধ্যে সূর্যের আকার বর্ত্তমানের আট ভাগ অর্থাৎ দুই আনা মাত্র দাঁড়াইবে।

২০. সাধনা, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।
২১. দাসী, আগষ্ট, ১৮৯৫।
২২. সাধনা, বৈশাখ, ১৩০১।
২৩. সাধনা, ভাদ্র, ১৩০১।
২৪. সাহিত্য, কার্ত্তিক, ১৩০০।
২৫. সাহিত্য, পৌষ, ১৩০৩।
২৬. ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩০৬।
২৭. ভারতী, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩০৪।
২৮. ভারতী, ফাল্গুন, ১৩০৫।

এমন দিন আসিবে যেদিন ভাস্কর প্রভাহীন হইবেন। গগন প্রদেশ অনুসন্ধান করিয়া এমন নির্ব্বাপিত সূর্যমণ্ডল দুই একটার খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সূর্য্যেরও সেই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী।

'ভাস্কর প্রভাহীন হইবেন' এই তত্ত্ব নিয়ে কিছুকাল পরে, বিংশ শতকে, জেমস্ জীন্স্ 'দি মিষ্টিরিয়াস ইউনিভার্স' গ্রন্থে (১৯৩০) আলোচনা করেছেন। বহু পূর্বে রচিত (১৮৯৪) হলেও, রামেন্দ্রসুন্দরের 'প্রলয়' "popular scientific essay' হিসাবে প্রশংসনীয়। বাংলা গদ্যে এই ধরণের আলোচনার সার্থক প্রয়াসের জন্য রামেন্দ্রসুন্দর নিঃসন্দেহে প্রশংসাভাজন।

উপরের দু'টি পর্যায়ে জ্ঞানের সাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন রচনার প্রসংগ উত্থাপিত হয়েছে। এই সমস্ত রচনা বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুসরণে রচিত হয়েছিল।

ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদের ধারাটি তৃতীয় পর্যায়ে ক্ষীণ হলেও কতিপয় ইংরেজি দর্শনমূলক গ্রন্থের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

স্পেন্সার উনিশ শতকের বাঙালীর একজন প্রিয় দার্শনিক ছিলেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রসংগক্রমে হার্বার্ট স্পেনসার-এর বক্তব্য ঐ যুগের অনেক বাঙালী স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'-তে স্পেনসার-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৯] ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হার্বার্ট স্পেনসার-এর 'এডুকেশন' গ্রন্থটির অনুবাদ করেছিলেন যদুনাথ রায়। আর, ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে শ্যামলাল গোস্বামী 'শিক্ষা' শিরোনামায় একই গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দও স্পেনসার-এর উক্ত গ্রন্থটির অনুবাদ করেন।

ফ্রান্সিস বেকন-এর বিভিন্ন গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ পূর্ববর্তী পর্যায়ে করা হয়েছিল। এই যুগে 'প্রবন্ধাবলী' (১৮৭৪) শিরোনামায় বেকন-এর 'এসেস' গ্রন্থটির বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন ধর্মদাস অধিকারী।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জ্যাক্সন্-এর 'অগস্ত কোঁৎ, দি পাজিটিভিস্ট' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'ধ্রুববাদী অগস্ত কোম্ত' শিরোনামায়। গ্রন্থটির অনুবাদক হিসাবে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের নাম কেউ কেউ স্মরণ করেছেন। কোঁৎ-এর রচনাবলী উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর চিন্তাজগৎ বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল।

২৯. রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, পৃ ১৫২-১৫৩।

তিন

ভাবের সাহিত্য :

ক রম্য রচনা / আত্মভাবনামূলক রচনা :

ইংরেজি প্রবন্ধ সাহিত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা গদ্যে আত্মভাবনামূলক নিবন্ধ (Personal Essay) এবং রম্য রচনা (belles lettres)-র ধারা সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া এই পর্যায়ে এ ধরণের নিবন্ধ রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি। এই ধরণের রচনায় হ্যাজলিট, ষ্টিভেন্‌সন্‌, রাস্‌কিন্‌ প্রভৃতির পরোক্ষ প্রভাব সক্রিয় ছিল।

আত্মভাবনামূলক রচনায় লেখকের ব্যক্তিসত্তা বিশেষ প্রকট হয়ে ওঠে। এই কারণেই এ জাতীয় রচনা মন্ময়ধর্মী। রম্য রচনা এক ধরণের লঘু রসসিক্ত নিবন্ধ। আত্মভাবনামূলক রচনাও লঘু রসে সিক্ত হয়ে রম্যরচনায় পরিণত হতে পারে। এই দুই ধরণের কয়েকটি আদর্শ নিবন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করছি।

এই ধরণের প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীতে বলেন্দ্রনাথ অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। বাংলা গদ্য ভাবের সাহিত্যে যাঁরা উন্নীত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। আত্মগত ভাবনা কামনার পক্ষ নির্ভর করে তিনি রোমান্টিকতার আকাশে ডানা মেলে দিয়েছিলেন। একদিকে ইংরেজ রোমান্টিক কবি কীট্‌স্‌ (John Keats)-এর তীব্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি, অপরদিকে ইংরেজ রোমান্টিক কবি সাহিত্যিকের সাধারণ ধর্ম অতীতচারিতা বলেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল।

বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সন্ধানী কবি-মানস পরিভ্রমণ করেছে ভারতবর্ষের তীর্থে-পথে। তিনি অবগাহন করেছেন সৌন্দর্য সায়রে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। পথিপার্শ্বে পত্র-পল্লব এবং লতাবিতানের বিধুনন, বনপথে আলো-আঁধারের আলিংগন তাঁর সৌন্দর্য-কাতর চিত্ত স্পর্শ করেছে।

সৌন্দর্যের সন্ধানে বলেন্দ্রনাথের রোমান্টিক্‌ কবি-মানস দৃষ্টি ফিরিয়েছিল অতীতের দিকে। 'খণ্ডগিরি', 'প্রাচীন উড়িষ্যা', 'কণারক', 'লাহোরের বর্ণনা' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর প্রাচীনত্বের প্রতি মোহ প্রকটিত। প্রাচীন উড়িষ্যার শিল্প-ঐশ্বর্যের মধ্যে, কণারকের ভগ্নপ্রায় সুপ্রাচীন সূর্যমন্দিরে তিনি রোমান্টিক

অভিসারে যাত্রা করেছেন। অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনের মধ্যে তাঁর এই রোমান্টিকতা প্রকাশিত। লাহোরের বর্তমান দৃশ্যপটের অন্তরালবর্তী প্রাচীন যুগের ছায়াস্মৃতি প্রকটিত হয়েছে বলেন্দ্রনাথের চিত্রে :

পাঞ্জাবের আতপ্ত আকাশপটে লাহোর শহরটি যেন আরব্যোপন্যাসের প্রাচীন খলিফাদিগের একটি পুরাতন, পরিত্যক্ত রাজধানী। হারুণ-অল-রসিদ শাসিত বোগদাদের সে নিত্যোৎসবময় পুরাতন সমারোহ এখানে এখন দুর্লভ—রাজপথে ছদ্মবেশে খলিফারাও ভ্রমণ করেন না এবং নিত্য নিশীথে নূতন নূতন উপন্যাস সুলভ ঘটনাও সংঘটিত হয় না—কিন্তু তথাপি ইহার গম্বুজে, মিনারে, তোরণে, প্রাচীরে, গৃহদ্বারে, অলিন্দে; বাইরে সম্মুখের বিচিত্র খোদিত গোল বারান্দায়, বাতায়নে, গবাক্ষে, ইহার আঁকাবাঁকা অসংখ্য রাজপথ ও গলিপথে এবং এই সকল পথের সেই বিচিত্র বেণী জনতায়—সেই খলিফী বোগদাদের কাহিনী মনে পড়ে এবং নিরন্তর উৎক্ষিপ্ত ধূলিজালে ও অবাধ প্রচুর সূর্যকিরণে মনে মনে আরব্য মরীচিকার ছায়া ঘনাইয়া আসে।

(লাহোরের বর্ণনা)

বলেন্দ্রনাথের কিছু কিছু আত্মলীন রচনা গীতি কবিতার আমেজ সৃষ্টি করে :

মেঘের উপর মেঘের রেখা পড়িয়া ধীরে ধীরে বিজয়া কাটিয়া গেল। বিজয়ার পরে আরো কতদিন কাটিয়া গিয়াছে—সন্ধ্যার শুভ্র মেঘগুলির কোমল বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া কতদিনকার শেষ সূর্যকিরণগুলি ঢেউয়ের মতো মিলাইয়া গেল। (যাত্রা)

ভাষার চিত্রধর্মিতার ক্ষেত্রে বলেন্দ্রনাথ যেন উনিশ শতকের প্রাক্-র‍্যাফেলীয় (**Pre-Raphaelite**) কবি-গোষ্ঠীর অন্যতম। তাঁর বর্ণনামূলক রচনা সামান্য দুই একটি তুলির কাজে, সামান্য দুই-একটি রেখায় রঙে-রসে সজীব ও প্রাণময় হয়ে ওঠে :

সরসী তীরে শ্যাম তরুচ্ছায়ে তৃণশয্যোপরি সুখসুপ্ত রমণী, শাখা-পল্লবের মধ্য দিয়া…শ্রান্ত জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। আলুথালু বসনপ্রান্তে অর্দ্ধ অনাবৃত চারু যৌবন চারু চন্দ্রালোকে মৃদু চঞ্চল। কোমল পদ পল্লব রজতধৌত শ্যাম শিলাখণ্ডের উপর রক্ষিত। দূরে জ্যোৎস্নাসিক্ত একখানি গ্রাম-অস্পষ্ট ধোঁয়া গোলাঘর, কুটীর-বেড়া, প্রাঙ্গণে দীর্ঘ তরুছায়া, দেয়াল বাহিয়া লতা। (দেয়ালের চিত্র)

বলেন্দ্রনাথের 'বনপ্রান্ত', 'যাত্রা', 'একরাত্রি' সম্পূর্ণতঃ মন্ময় এবং লিরিকধর্মী। এই আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধগুলি রাস্‌কিন-এর 'এ ব্লেড অব্ গ্রাস', ষ্টিভেনসন-এর 'ভার্জিনিবাস্ পিউযেরিস্ক' এবং 'এ্যান ইনল্যাণ্ড ভযেজ : ট্র্যাভেল্‌স্ উইথ এ ডাঙ্কি' প্রভৃতি রচনা স্মরণ করিযে দেয। প্রকৃত প্রবন্ধ সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রেই গীতিকাব্যধর্মী ব্যক্তিনিষ্ঠ রচনা এবং আত্মস্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সাহিত্য।

ব্যক্তিনিষ্ঠ লিরিকধর্মী রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিযেছিলেন :

> কারিগর লোক প্রাযই একটু খামখেযালী হয, কেহ বদমেজাজের উপর খামখেযালী, আবার কেহ বা রসক্ষেপার উপর খামখেযালী। কিন্তু গগন পটোর মত খামখেযালী রসক্ষেপালোক আর দুনিযায নাই। সে যদি কখনো কাহারও ফরমাস মতো চিত্র করিল। আপনাব মনে আপনার ঝোঁকে আঁকিতেছে আব পুঁছিতেছে, কিন্তু যখন যেটা দাঁড় করাইবে, সেটা একেবারে চূড়ান্ত। যেমন রং আর তেমনি শেড। যেমন ভাব-ভঙ্গি তেমনি অঙ্গ-সৌষ্ঠব।
>
> (গগন পটো)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অন্তর্গত অক্ষযচন্দ্র সরকার-লিখিত 'চন্দ্রালোক' শীর্ষক রচনাটিও এই প্রসংগে স্মরণীয।

আত্মনিষ্ঠ নয, তথ্যধর্মী এবং চিন্তামূলক রচনার ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয দিযেছেন। এদিক থেকে হাক্সলী এবং ম্যাথ্যু আর্নল্ড এর আদর্শ তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন।

এই ধরণের রচনার মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাত চিন্তা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ভালবাসা', 'লোকারণ্য', 'অভিমান' প্রভৃতি প্রবন্ধ স্মরণীয। অবশ্য, কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নিশীথ চিন্তা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'রাত্রিকাল', 'নদীর জল', 'দুঃখে-সুখে' রচনাগুলি কিছুটা পরিমাণে আত্মধর্মী। রামেন্দ্রসুন্দরের এই ধরণের রচনার মধ্যে 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সুখ না দুঃখ' রচনাটি স্মরণীয।

রামেন্দ্রসুন্দরের 'সৌন্দর্যবুদ্ধি'[৩০] এবং 'সৌন্দর্যতত্ত্ব'[৩১] প্রবন্ধদ্বয বিশেষ মূল্যবান। বাংলায় নন্দন তত্ত্ব (aesthetics)-এর আলোচনা ইতিপূর্বে হয়নি।

৩০. প্রদীপ, মাঘ, ১৩০৭।

৩১. সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩০০।

সে যুগের মানদণ্ডে আলোচনাদ্বয় বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং তথ্যমূলক। তিনি এই আলোচনার ক্ষেত্রে প্রতীচ্যের মতবাদ দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন।

'সৌন্দর্যবুদ্ধি' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন: 'ইংরেজীতে যাহাকে ইসথেটিক বৃত্তি বলে, বঙ্কিমবাবু যাহার চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি নাম দিয়াছেন তাহারই সহিত এই সৌন্দর্যের কারবার।' সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে লেখক, প্রতীচ্যের আধুনিক চিন্তা অনুসরণে, যৌন নির্বাচনের সংগে সৌন্দর্যের সম্পর্ক অন্বেষণ করেছেন। 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে সৌন্দর্য তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে সৌন্দর্যের নৈতিক ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির কথা স্মরণ করেও তিনি মনে করেছেন যে 'সৌন্দর্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহার উপভোগে কেবল তৃপ্তিমাত্র, সুখমাত্র…তাহার সংগে উপকারিতার সম্পর্ক নাই।' এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে লেখক সৌন্দর্য সম্বন্ধে কীট্স্-এর দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন—'A thing of beauty is a joy forever.' (Keats, Endymion, first line)

খ সাহিত্য সমালোচনা:

ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করে পূর্ববর্তী পর্যায়ে সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত লক্ষ্য করেছি। আলোচ্য যুগে বঙ্কিমচন্দ্র তথা 'বঙ্গদর্শন'-এর আবির্ভাবে বাংলা সমালোচনা সাহিত্য পরিণত রূপ পেল। বাংলা সাহিত্যের এই ধারাটিও ইংরেজি প্রভাবে গড়ে উঠেছে:

> বাঙ্গালা সাহিত্য যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্যের জীবনীরসের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে সেইরূপ ইহার সমালোচনাও বৈদেশিক বিচার পদ্ধতির মূল সূত্রগুলিকে আত্মসাৎ করিতে ও ব্যবহারিক প্রয়োগ করিতে যে সাধনা করিয়াছে তাহা বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয়। বাঙ্গালী সাহিত্যিক একদিকে যেমন নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে সেইরূপ বাঙ্গালী সমালোচকও এই নবজাত সাহিত্যের রসাস্বাদন এবং মূল্য নির্ধারণের জন্য যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত বৈদেশিক প্রভাবে অনুপ্রাণিত নূতন মানদণ্ড উদ্ভাবন করিয়াছে।[৩২]

সিডনি, কোলরীজ, শেলী এবং ম্যাথ্যু আর্নল্ড-এর আদর্শে সে যুগের বাঙালী সমালোচকেরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আমাদের প্রাচীন আলংকারিক বিশ্বনাথ, মমটভট্ট প্রভৃতির আদর্শ সে যুগের বাঙালী সমালোচকদের বিশেষ অনুপ্রাণিত করতে পারেনি।

৩২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত, সমালোচনা সাহিত্য, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিমযুগের কয়েকজন সাহিত্য সমালোচকের রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করছি। বলেন্দ্রনাথ এ যুগের একজন বিশিষ্ট সমালোচক। 'সাধনা', 'ভারতী', 'বালক' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বলেন্দ্রনাথের সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

কালিদাসের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা / মৃচ্ছকটিক / উত্তরচরিত / জয়দেব / কাব্যে প্রকৃতি / কুন্দনন্দিনী ও সূর্য্যমুখী / কৃত্তিবাস ও কাশীদাস / মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী / ভারতচন্দ্র রায / বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস / মেঘদূত / প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য-ইত্যাদি॥

বলেন্দ্রনাথ মূলতঃ তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (Analytical Method) অনুসরণ করেছেন। সমালোচক বলেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি ছিলেন নির্ভেজাল সৌন্দর্য সাধক। সমালোচনার তীব্র, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ততটা আগ্রহী ছিলেন না ; ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবি সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মধ্যে যেন বেশী করে প্রকাশিত : 'We murder to dissect'।[৩৩] তাঁর সমালোচনা অনেক সময় কবিসুলভ ভাবুকতা এবং সৌন্দর্যলিপ্সার পরিচয় বহন করে। তাই, তিনি যখন প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনায় অগ্রসর হয়েছেন তখন শুধুমাত্র নীরস তত্ত্ব এবং শুষ্ক বিশ্লেষণের অবতারণা করেননি। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধনিচয়ের মতো সেগুলো যেন মন্ময়তার পথ ধরে নবসৃষ্টি ও সৌন্দর্যের আলয়ে পাঠকদের পৌঁছে দেয।

'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ সমালোচক হিসাবে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি মূলতঃ তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। বিভিন্ন বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা প্রসংগে কোথায় কোথায় ইংরেজি ছায়াপাত হয়েছে, সেই দিকটি তিনি কোন কোন প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি 'পাষাণ প্রতিমা' গ্রন্থটির আলোচনা প্রসংগে, গ্রন্থের নায়ক চরিত্রের ওপর একাধারে Don Juan, Bobadil এবং Falstaff-এর প্রভাব অন্বেষণ করেছেন।

নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের সমালোচনা প্রসংগে কালীপ্রসন্ন মন্তব্য করেছেন :

নবীনবাবুও অনুকরণের অপবাদ হইতে নির্মুক্ত নহেন। সিরাজদ্দৌল্লার

৩৩. Wordsworth, William, The Tables Turned.

বিকট স্বপ্নদর্শনে সেক্সপীয়রের তৃতীয় রিচার্ড নামক নাটকের স্বপ্নদর্শন স্পষ্ট প্রতিভাত রহিয়াছে, চাইল্ড হেরোল্ডের তৃতীয় কাণ্ডস্থ কতিপয় কবিতায় নৃত্যগীতের সদৃশ বর্ণনা আছে, পলাশীর যুদ্ধে কোন কোন কবিতায় তাহার ছায়া পড়িয়াছে, এবং বায়রণ ও স্কটকে আরও অনেক স্থলে অনুকরণ করা হইয়াছে। ইহাকে আমরা দোষ বলি না।'

সমালোচনার বিষয় ছাড়া এখানে আর একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেটা ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণ ও প্রভাবের দিক। কালীপ্রসন্নের আলোচনা অনুসরণ করে দেখা যায় যে, আলোচিত দুটি গ্রন্থই বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের চরিত্র, ঘটনা ও বর্ণনার দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত।

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্কিমচন্দ্র তথা ইংরেজি ধারার অনুবর্তনে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু কোন কোন সমালোচনার ক্ষেত্রে হয় হিন্দুত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠায়, না হয় সাহিত্য ক্ষেত্রে সুনীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠার দিকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে প্যাটার্ণের ক্ষেত্রে ইংরেজি সমালোচনা-রীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলেও এই রীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠার তাগিদে সমালোচক হিসাবে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে অক্ষম হয়েছেন। উনিশ শতকে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্রের কতিপয় বিখ্যাত সমালোচনামূলক প্রবন্ধের উল্লেখ করছি :

কাব্য ও গদ্য ৩৪ / নাটক ৩৫ / শ্যেন কপোত ও শাইলকের কথা ৩৬ / কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও তাহার কাব্য ৩৭ / কাব্য সমালোচনা ৩৮ / জয়দেব ৩৯ / ম্যাকবেথ ও হ্যামলেট ৪০ ইত্যাদি॥

সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র যে সমস্ত আলোচনায় অতি ভারতীয় এবং অতি হিন্দুত্বের বিকৃত বুদ্ধির মোহের বশবর্তী হয়েছেন সেখানেই সাহিত্য রসের

৩৪. সাধারণী, চৈত্র, ১২৮৩।
৩৫. বান্ধব, শ্রাবণ/ভাদ্র, ১২৮৩।
৩৬. নবজীবন, প্রথম ভাগ, ১২৯১।
৩৭. নবজীবন, ভাদ্র/আশ্বিন, ১২৯২।
৩৮. নবজীবন, অগ্রহায়ণ, ১২৯৩।
৩৯. নবজীবন, চৈত্র, ১২৯৩।
৪০. নবজীবন. ৪র্থ ও ৫ম ভাগ, ১২৯৪, '৯৫, '৯৬।

বিচারে তিনি কৃতকার্যতা লাভ করেননি। এই দিক থেকে 'শ্যেন কপোতের কথা' এবং 'ম্যাকবেথ ও হ্যামলেট' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটি লক্ষ্য করছি। দু'টি প্রবন্ধ প্রায় একই সুরে বাঁধা। এক উদ্ভট দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি প্রথম প্রবন্ধটিতে সেক্সপীয়র-এর 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস্'-এর আলোচনা করেছেন। তিনি ভারতীয় ত্যাগের আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করে সেক্সপীয়র এর নাটকটির হীন আদর্শ উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হয়েছেন। নাটকের রসবিচারের দিকে অগ্রসর না হয়ে, তিনি সেক্সপীয়র-এর নাটকটির ভোগের আদর্শের সংগে আমাদের পৌরাণিক শ্যেন কপোতের উপাখ্যানের ত্যাগের আদর্শের তুলনা করে হীন আদর্শ পরিপোষণ করবার জন্য সেক্সপীয়রকে নিন্দা করেছেন :

ইউরোপ আপন দেহ হইতে মাংস কাটিয়া দিতে পরিল না—তত কষ্ট, তত যন্ত্রণা কি সওয়া যায়? ইউরোপ ঔশীনরের আপনার দেহের মাংস কাটিয়া দেওয়ার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। আর ভাবিল এমন কি পরোপকার যে তজ্জন্য এত কষ্ট এত যন্ত্রণা সহিতে হইবে·· ইউরোপ ঔশীনরের কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিল। মাংস কাটিয়া প্রাণ নষ্ট করিবার ভয়ে আইনের একটা কূটতর্ক তুলিয়া মাংস কাটিবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, আর পাছে সেই ভীরুতা এবং আত্মপ্রিয়তার জন্য লোকে নিন্দা করে সেইজন্য আপনার কলঙ্কের ডালিটা একটা নির্বিবোধ ইহুদীর মাথায় চাপাইয়া দিল।

(শ্যেন কপোত ও শাইলকের কথা)

এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নাটক বিচার নিঃসন্দেহে সুস্থতার পরিচায়ক নয়। এখানে ইংরেজি শিক্ষিত অক্ষয়চন্দ্র, সেক্সপীয়র-এর একজন ভক্ত পাঠক [৪১] হয়েও, উগ্র হিন্দুত্ব এবং নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই ধরণের বিকৃত মন্তব্য করেছেন।

৪১. অক্ষয়চন্দ্র যে সেক্সপীয়রের কম ভক্ত ছিলেন না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লিখিত একটি পত্র থেকে :

'...Shakespeare নিজে নিজে পড়িবে। প্রথমে ভাল লাগিবে না এখানটা সেখানটা পড়িবে·· ভাল লাগিবেই হইবে। কোনটা কাহার ভাল লাগিবে বলা যায় না, কিন্তু কোনটা ভাল লাগিবেই হইবে। Try first second class plays—Julius Caesar, Romeo & Juliet, Antony & Cleopetra,'

—কালিদাস নাগ, সম্পাদিত, অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার, ১ম খণ্ড, পরিচিতি, পৃ. ৪৫ ৮

'ম্যাকবেথ ও হ্যামলেট' শীর্ষক সমালোচনায় অক্ষয়চন্দ্র এই একই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। সমালোচক নাটক দুটির মর্মকথা উদ্‌ঘাটনে বিশ্লেষণাত্মক এবং তুলনামূলক পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। একটি নক্‌শার সাহায্যে তিনি দুইটি নাটকের ঘটনার গতি নির্ধারণে অগ্রসর হয়েছেন :

ম্যাকবেথ { পাপের উৎপত্তি, পরিপুষ্টি, আধিপত্য }

{ দুঃখজনকতা, সংক্রমণ, পবিমাণ } হ্যামলেট

তিনি সাহিত্যের রসবিচার অপেক্ষা এখানে পাপ-পুণ্য বোধের দ্বারাই অধিক চালিত হয়েছেন। 'সুখের হাট এবং সৌন্দর্যের মেলা'[৪২] শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি ভারতীয ও ইউরোপীয 'এসথেটিক' বিদ্যা সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই তুলনার ক্ষেত্রে তিনি এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর মতে আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে ইউরোপ অনেকটা নিকৃষ্ট বলে, এই বিদ্যার চর্চায প্রতীচ্য অধিক মনোনিবেশ করেছে ; অপরদিকে, ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবাদের প্রাবল্য হেতু 'এস্‌থেটিক্‌' বিদ্যা পরমার্থ বিদ্যায লীন হয়েছে।

অবশ্য অক্ষযচন্দ্রের কযেকটি সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সুস্থ আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এই প্রসংগে 'কবি ঈশ্বরগুপ্ত ও তাহার কাব্য' এবং 'নাটক' প্রবন্ধদ্বয উল্লেখযোগ্য।

অক্ষযচন্দ্র সরকারের পাশাপাশি চন্দ্রনাথ বসুর সমালোচনামূলক প্রবন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করছি। তিনিও উগ্র জাতীযতাবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে 'শকুন্তলা তত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে কালিদাসের একটি প্রথম শ্রেণীর নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌'-এর সংগে সেক্সপীযর-এর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক 'রোমিও জুলিয়েট'-এর অসম তুলনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 'শিল্প প্রতিভায় সেক্সপীযরও কালিদাসের সমকক্ষ নয়।' প্রকৃত প্রস্তাবে, 'চন্দ্রনাথ বসু সুপণ্ডিত ...কিন্তু তাঁহার নীতি ও ধর্ম বিষয়ক মতে ও বিশ্বাসে সংযম নাই...তিনি সাহিত্যের যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা এত একদেশদর্শী যে উহাকে

৪২. নবজীবন, পৌষ, ১২৯২।

সাহিত্য সমালোচনাই বলা যায় না। এ জাতীয় গোঁড়ামি তখনকার দিনের সাহিত্য চর্চাকে বিকৃত করিয়া দিয়াছিল'।[৪৩]

এ যুগের আরো দুইজন সাহিত্য সমালোচক উগ্র জাতীয়তাবোধ এবং নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে রসবোধের পরিচয় প্রদানে অক্ষম হয়েছেন। পূর্ণচন্দ্র বসু 'সাহিত্যে খুন' শীর্ষক প্রবন্ধে সেক্সপীয়র-এর 'Othello' নাটকটিকে আঘাত করেছেন। এই আঘাতের পশ্চাতেও ছিল সেই ভারতীয় নীতিবোধ :

> আমাদের দেশে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে যেরূপ উচ্চ আদর্শ পাওয়া যায়, তাহা হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়।...ইউরোপ সে আদর্শ কোথায় পাইবে ?

ঠিক এই একই মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ইংরেজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়েও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' প্রবন্ধে এই দুই নাট্যকারের তুলনা প্রসংগে কালিদাসকে 'সুন্দরের কবি' এবং সেক্সপীয়রকে 'অসুন্দরের কবি' বলে অভিহিত করেছেন।

ইংরেজি সমালোচনার আদর্শ অনুসরণ করে যাঁরা সুস্থ জীবনাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রমেশচন্দ্র দত্তের নাম স্মরণীয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর 'মৃচ্ছকটিক' শীর্ষক প্রবন্ধটি সাহিত্য বিচারের এক নবদিগন্ত উদ্‌ঘাটিত করেছিল। এখানে তিনি উচ্চাংগের সাহিত্যাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। সে যুগের মানদণ্ডে চারুদত্ত চরিত্রের বিশ্লেষণ অনবদ্য।

রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে রসজ্ঞ এবং গভীর আলোচনা করেছিলেন তাঁর ইংরেজিতে লেখা 'লিটারেচার অব বেঙ্গল' গ্রন্থে। অবশ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বাংলায় লেখা সাহিত্য সমালোচনা মাঝে মাঝে স্থান পেয়েছে। এদিক থেকে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্র এবং আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য সমালোচক হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি :

৪৩. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বাংলা সমালোচনা পরিচয়, ১ম সংস্করণ, পৃ ১০৩।

বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি[৪৪] / কালিদাস ও সেক্ষপীয়র[৪৫] / বাঙ্গালা ভাষার পরিণতি[৪৬] / বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য[৪৭] / প্রভৃতি।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' শীর্ষক রচনায় হরপ্রসাদ কিছুটা নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত হলেও অন্যত্র তাঁর এই মনোভাবের প্রকাশ পায় নি। তিনি 'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র' প্রবন্ধে দুই দিক থেকে দুই মহাকবির কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে কালিদাসের 'মনুষ্য হৃদয়ের সূক্ষ্ম অংশ' উদ্‌ঘাটনের কৃতিত্ব ছিল; আর সেক্সপীয়রের 'অসুন্দরকে সুন্দর করিবার' ক্ষমতা ছিল। ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বাংলা সাহিত্যের উন্নতির সম্ভাবনা যে উজ্জ্বল হয়েছে এ সম্পর্কে 'বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন:

> এই বিপ্লবের প্রধান কারণ ইংরেজি শিক্ষা, ইহার ফল সমাজ-উন্নতি ও সাহিত্য-উৎপত্তি।

এই প্রবন্ধেরই আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন:

> …ইংরেজি পড়ার দরুন আমাদের সাহিত্যের যে উন্নতি সম্ভাবনা, তাহা একপ্রকার চিরস্থায়ী বলিতে হইবে।

ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটেছিল এবং বঙ্কিম যুগে এই ধারাটি যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে হিন্দুত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠার আতিশয্যে ইংরেজি আদর্শকে আঘাত করবার অহেতুক প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের মান অনেকটা নিম্নমুখী হয়েছে।

গ. পত্র সাহিত্য:

ব্যক্তিগত পত্র যে রচনার গুণে সাহিত্যধর্মী হয়ে ওঠে তার আদর্শ ইংরেজি থেকে অনুবাদের মাধ্যমে, প্রথম পর্যায়ে বাংলা গদ্যে উপস্থিত হয়েছিল। এই প্রসংগে 'চেষ্টারফিল্ড লেটার্স'-এর বাংলা অনুবাদ স্মরণ করতে পারি[৪৮]।

৪৪. বঙ্গদর্শন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৌষ, ১২৮৫।
৪৫. তদেব, বৈশাখ, ১২৮৫।
৪৬. তদেব, ৮ম খণ্ড, শ্রাবণ, ১২৮৮।
৪৭. তদেব, ৭ম খণ্ড, ফাল্গুন, ১২৮৭।
৪৮. বর্তমান গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়, পৃ ২৪।

মধুসূদনের পত্রাদি ছিল সাহিত্যধর্মী। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলি ইংরেজি ভাষায় বিরচিত। বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিদ্যাসাগরের পত্রাবলী সাহিত্যধর্মী নয়। ভূদেব এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পত্রাবলী কিছুটা সাহিত্যগুণসম্পন্ন। ভূদেবের অনেকগুলি পত্র থেকে ভূদেবের ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার স্বচ্ছ ধারণা করা যায়।[৪৯]

তবে, ব্যক্তিগত পত্র রচনা যে সাহিত্যকর্ম হয়ে ওঠে তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলীতে। দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্রের মধ্যে পিতার এই বিশেষ ক্ষমতা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে লিখিত মহর্ষির পত্রগুলিতে উপদেশ ও সাহিত্যের অপূর্ব মিশ্রণ মাঝে মাঝে ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি পত্রের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করছি:

> …তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অনেক ভুল হয়—বিদ্যারত্নকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিবে। হাতে লয়ে দীপ অগণন, আবার চৈত্র মাসের পত্রিকাতে ছাপাইয়া তাহার অসম্পূর্ণতা দোষ পরিহার করিবে। হিমালয়েও আমার স্বাস্থ্য নাই; এই গ্রীষ্মালয়েও আমার স্বাস্থ্য নাই; আমার স্বাস্থ্য সেই অতীত স্থানে, যেখান হইতে রবি ও শশী প্রভা ও সুধা লাভ করে। আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।[৫০]

বিবেকানন্দও পত্র রচনার আদর্শ সৃষ্টি করেছিলেন বাংলা গদ্য সাহিত্যে। এই প্রসংগে তাঁর 'পত্রাবলী' গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে বিধৃত পত্রগুলির কথা স্মরণ করতে পারি।

খ. চরিত সাহিত্য:

ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণে বাংলা জীবনী সাহিত্য একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল। পূর্ববর্তী পর্যায়ে জীবন-চরিত রচনার আদর্শ সৃষ্টি করেছিলেন বিদ্যাসাগর, তাঁর 'জীবনচরিত', 'চরিতাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে। জীবনী সাহিত্য পূর্ববর্তী পর্যায়েই মানবিক হয়ে উঠেছিল। এই পর্যায়েও মানবিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকল। তবে বিদেশীদের জীবনী অপেক্ষা স্বদেশীদের জীবনচরিত রচনার দিকে বাঙালী গদ্যকারেরা আলোচ্য পর্যায়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন।

---

৪৯. কুমারদেব মুখোপাধ্যায় বিরচিত 'ভূদেব চরিত' গ্রন্থের ষড়বিংশ অধ্যায়ে ভূদেবের পত্রাবলী মুদ্রিত হয়েছে।

৫০. রবীন্দ্রনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পত্রাবলী, পৃ ১৯৭।

এই প্রসংগে এই পর্যায়ে প্রকাশিত কতিপয় চরিত-গ্রন্থের শিরোনামা উল্লেখ করছি: যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবন বৃত্ত' (১৮৭৭), 'গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' (১৮৮৭), কালীময় ঘটকের 'চরিতাষ্টক' (আটজন প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালীর জীবনী), যোগীন্দ্রনাথ বসু-র 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত', (১৮৮৮), রজনীকান্ত গুপ্তের 'জয়দেব চরিত' (১৮৭৫), সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিত' (১৮৯৫) 'মহারাজ নন্দকুমার' (১৮৯৯), মহেন্দ্রনাথ রায়ের 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৮৫), বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫), নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' (১৮৮১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আর আলোচ্য পর্যায়ের উৎকৃষ্ট আত্মজীবনী রচনার নিদর্শন হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বরচিত জীবনচরিত' (১৮৯৮) গ্রন্থের নাম বিশেষ স্মরণীয়। এই পর্যায়ের শেষভাগে নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' (পাঁচ খণ্ড) প্রকাশিত হতে থাকে।

চার

আলোচ্য তৃতীয় পর্যায়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যের উপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের ক্ষেত্রে কতিপয় নতুনত্ব প্রেক্ষণীয়। দীর্ঘ বাহাত্তর বছর ধরে ইংরেজি প্রভাবে পরিপুষ্ট বাংলা গদ্য সাহিত্য এবার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনেকটা পরিমাণে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠবার চেষ্টা করল।

প্রথমতঃ, এই পর্যায়ের ইংরেজি অনুবাদ, এমন কি অনুসরণমূলক গ্রন্থ রচনা অপেক্ষা মৌলিক গ্রন্থাদি রচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলা গদ্য সাহিত্য যতই অগ্রসর হয়েছে ততই বিষয়-বস্তুর ক্ষেত্রে স্বাধীন হয়ে ওঠার তাগিদে মৌলিক রচনার ভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে চেয়েছে। অবশ্য, একথা অনস্বীকার্য যে সর্বদেশে, সর্বকালে সাহিত্যের উন্নতির জন্য বিদেশী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রয়োজন। ইংরেজির মতো একটি উন্নত সাহিত্যও বিভিন্ন বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদে নিরন্তর নিরলস। কিন্তু, মৌলিক সাহিত্যের তুলনায় অনুবাদ সাহিত্য নিশ্চয়ই প্রাধান্য লাভ করে না। বাংলা গদ্য সাহিত্যও, আলোচ্য পর্যায়ে, যখন মৌলিক রচনায় স্ফীতকায় হয়ে উঠতে লাগল তখন মৌলিক

রচনার পশ্চাতে প্রযোজনমতো অনুবাদের ধারাটিও প্রবহমান রইল।

দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য সময়ে একদিকে আমাদের দেশে শিক্ষিত বাঙালীর কাছে খ্রীষ্টধর্মের আবেদন যেমন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হযেছিল তেমনি ব্রাহ্মধর্মের জোযারও কতকটা শ্লথবেগ হযে আসছিল। অপরদিকে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান এবং উগ্র স্বাজাত্যবোধ প্রকট হযে উঠতে লাগল। একদিকে হিন্দুত্বের অতি প্রাধান্য, অপরদিকে স্বাদেশিকতা উন্মেষের প্রথম উচ্ছ্বাসে সমাজে ও সাহিত্যে ক্রমশঃ ইংরেজ এবং ইংরেজি সাহিত্য বিরোধী মনোভাব কিছুটা পরিমাণে দেখা দিল।

বঙ্কিমচন্দ্রেব মতো প্রখর মেধাসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যেও এই ধরণের প্রবণতা ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ কবেছিল। যে বঙ্কিমচন্দ্র একসময জন স্টুয়ার্ট মিল-এর মৃত্যুতে লিখেছিলেন :

আমাদিগের মনে হইতেছে যেন আমাদিগের কোন পরম আত্মীযের সহিত চির বিচ্ছেদ হইযাছে।৫১

—সেই বঙ্কিমচন্দ্রই পরবর্তীকালে 'সীতারাম' (১২৯১) গ্রন্থে বলেছিলেন :

সীতা ছাড়িযা মিল পড়ি আর উড়িষ্যার প্রস্তর শিল্প ছাড়িযা সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিযা দেখি।

কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে শেষ জীবনে হিন্দুত্ব এবং জাত্যভিমান বিশেষ প্রকট হযে উঠলেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার মধ্যে সমন্বয় সন্ধানের চেষ্টা থেকে তিনি বিরত হননি।

উগ্র হিন্দুপ্রীতি এবং অহেতুক প্রতীচ্য-বিদ্বেষের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন কোন গদ্যশিল্পী রচনাকার্যে অগ্রসর হলেও (উদাহরণস্বরূপ অক্ষযচন্দ্র সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ) সাধারণভাবে এই যুগের অনেক গদ্যশিল্পীই নিছক ইংরেজি অনুকরণের বিরুদ্ধে দাঁড়িযে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাবধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনায অগ্রসর হযেছিলেন। এই প্রসংগে বলেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতির নাম স্মরণীয। এই সমন্বয় আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হযে তাঁরা ইংরেজি বিষয়বস্তু প্রতীচ্যের ধারার সংগে মিলিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ' এই প্রবণতার অন্যতম উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

তৃতীয়তঃ, এই সমন্বয়ধর্মী আদর্শে পরিচালিত হয়ে অনেক গদ্যশিল্পী

---

৫১. [illegible], ১২৮০।

প্রত্যক্ষভাবে কোন ইংরেজি গ্রন্থ অনুসরণ না করে বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের বিষয়বস্তু স্বদেশীয় আলোকে উদ্ভাসিত করে গ্রহণ করেছেন।

চতুর্থতঃ, নিছক ইংরেজি অনুকরণের মনোভাব হ্রাস পাবার জন্য প্রত্যক্ষপ্রভাবে কোন ইংরেজি গ্রন্থ অনুসরণের প্রবণতা পরিত্যাগ করে সাধারণভাবে ইংরেজি চিন্তাজগতের ফসল স্বদেশীয় রূপে-রসে সঞ্জীবিত করে বাংলা গদ্যের বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা বাংলা গদ্য সাহিত্যে দেখা গেল। এরই ফলে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা পরোক্ষ প্রভাবের সক্রিয়তা এই পর্যায়ে লক্ষিত।

পঞ্চমতঃ, মৌলিক রচনার দিকে প্রবণতা বৃদ্ধি পাবার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব অপেক্ষা কেবল মাত্র আংগিকের ক্ষেত্রে ইংরেজি প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, রম্য রচনা বা আত্মধর্মী রচনা কিংবা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র আংগিকের মধ্যে টিকে থাকল।

ষষ্ঠতঃ, এই পর্যায়ের গদ্য সাহিত্যে পূর্ববর্তী দুটি পর্যায়ের তুলনায় বাংলা গদ্যের সাহিত্যধর্মিতা অনেক বৃদ্ধি পেল। বিভিন্ন সাহিত্যধর্মী বিষয়বস্তু পরিবেশনের প্রয়োজনে গদ্যকারেরা ইংরেজি বাক্যের সাধারণ গঠনরীতি অনুসরণের সংগে সংগে ভাষার সাহিত্যগুণ বৃদ্ধির জন্য ইংরেজি সাহিত্যে ব্যবহৃত অলংকারাদি অনুসরণে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে, এই পর্যায়ে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভাষারীতি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

অষ্টম অধ্যায়

তৃতীয় পর্যায় (১৮৭২-১৯০০)

ভাষারীতি

এক

দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাষারীতির ওপর ইংরেজি প্রভাবের আলোচনা প্রসংগে ইংরেজি ভাষারীতি থেকে গ্রহণ-বর্জন সম্বন্ধে বিভিন্ন উদাহরণ লক্ষ্য করেছি। প্রথম পর্যায়ে বাংলা গদ্য অতি দ্রুত কার্যকরী রূপ লাভের প্রয়োজনে অনেক সময়ই নির্বিচারে ইংরেজি বাক্যের গঠন-রীতি অনুসরণে অগ্রসর হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ইংরেজি গ্রহণের পরিমাণ বাক্য গঠন এবং শব্দ চয়ন উভয় ক্ষেত্রেই যে হ্রাস পেল তা নয়। কিন্তু, বাংলা গদ্য তখন নাবালকত্বের সীমা উত্তীর্ণ হয়েছে; তাই, প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের প্রজ্ঞা অর্জন করে, তার নিজস্ব কাঠামো বজায় রেখে, উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষারীতির দিকে হাত বাড়িয়েছে।

আলোচ্য পর্যায়েও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবণতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধিকন্তু, বাংলা গদ্যের বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় অধিক সাহিত্যধর্মী হয়ে ওঠার দরুণ ক্রমশঃ নতুন নতুন ইংরেজি শব্দের ব্যবহারে ভাষা যেমন সক্রিয় হয়ে উঠেছে তেমনি ভাষার সাহিত্যগুণ বৃদ্ধির জন্য ইংরেজি সাহিত্যের অলংকারের দিকে হস্ত প্রসারিত করেছে। বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই সময় নবোদ্যম দেখা দিয়েছে।

দুই

বাক্য গঠনে ইংরেজি প্রভাব

ক. বর্জন-রক্ষণ

আলোচ্য পর্যায়ে, দ্বিতীয় পর্যায়ের মতোই, বাংলা গদ্যের নিজস্ব গঠন ও [illegible] বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে বর্তমান কালে 'হওয়া' ক্রিয়ার ব্যবহার বর্জন করা

হল।[১] বর্জন করা হল কর্তা এবং কর্মের মাঝখানে ক্রিয়া পদের ব্যবহার। 'রিলেটিভ ক্লজ' বা উপাদান বাক্যের পূর্বে 'এ্যান্টিসিডেন্ট' বা সাপেক্ষ সর্বনামের ব্যবহার লোপ পেল এবং প্রত্যয়ের পরিবর্তে সমুচ্চয়ী অব্যয়-এর ব্যবহার হ্রাস পেল।

বাংলা বাক্যের গঠনে, আলোচ্য পর্যায়ে যে সমস্ত রীতি টিকে রইলো সেগুলো বাংলা গদ্যে স্থায়ী আসন করে নিল।

আলোচ্য পর্যায়ে ইংরেজি খণ্ড বাক্য সজ্জার রীতি টিকে থাকল। খণ্ডবাক্য সজ্জার কতিপয় উদাহরণ এই পর্যায়ের রচনা থেকে উৎকলিত করছি :

[১]

প্রধান খণ্ডবাক্য	অধীন খণ্ডবাক্য
তিনি বলিলেন,	স্বাধীনতা হারাইয়া জাতীয় ভাব পরিবর্দ্ধনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। (ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ, জাতীয় ভাব)
আমরা জানি,	যে মনুষ্যের দোষগুণ অনেকটাই তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে অর্জ্জিত। (তদেব, ইংরাজাধিকার, ইংরাজের বৈদেশিক ভাব)

[২]

অধীন খণ্ডবাক্য	প্রধান খণ্ডবাক্য
যে মানুষটা বলে আমার শেখবার নেই,	সে মরতে বসেছে। (বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)
সদুপদেশ এবং সুশিক্ষার বিশেষ ফল না পাইলে,	আমরা কেহই বিনা উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিতে চাই না। (ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ, জাতীয় ভাব—ঐতিহাসিক প্রকৃতিভেদ)

১. অবশ্য, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনায় দুই একটি ক্ষেত্রে বর্তমান কালে 'হওয়া' ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ্য করেছি : 'আরও একটি কথা বিবেচ্য আছে'।
[illegible]

[৩]

মূল খণ্ডবাক্য	প্যারেনথিটিক ক্লজ	মূল খণ্ডবাক্য
এই অনন্ত জগৎ,	তাঁহার আত্মায় সেই অপরিজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয় অনন্তের উদ্দীপন করিয়া,	তাঁহাকে উচ্চতর হইতে উচ্চতর সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়া তুলে। (কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নিভৃত চিন্তা, অমৃত)
দ্বিতীয় কথা এই,	আপনার প্রতিবাসী হউন বা শ্রুতনামা যে কোন স্বজাতীয় ব্যক্তি হউন,	যাঁহাকে সম্মানার্হ দেখিতে পাও, তাহাকেই সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হও। (ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ, কর্ত্তব্য নির্ণয়—নেতৃ প্রতীক্ষা)

ইংরেজি রীতি অনুসারে 'এবং' শব্দ দিয়ে বাক্য শুরু করবার প্রবণতা দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্জন করা হয়েছিল।[২] এই পর্যায়ে 'এবং' দিয়ে বাক্যের শুরু বিশেষ দেখা যায় না। তবে, ভূদেবের রচনায় এই ধরণের অতিরিক্ত ব্যবহার আবার ফিরে আসে। কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি :

[১] ··। এবং ইহার ভিতর হইতেই· ·।

(সামাজিক প্রবন্ধ, ভারতবর্ষের কথা, আর্থিক বিষয়ে)

[২] ···। এবং ৬৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক যত লোক···।

(তদেব)

[৩] ···। এবং দেখা যাইতেছে যে···।

(তদেব, জাতীয় ভাব—ভারতবর্ষে মুসলমান)

[৪] ···এবং সেইজন্য ইউরোপীয় সমাজের সূত্র ধরিয়া···।

(তদেব, উপসংহার)

[৫] ···। এবং কোথাও কোথাও প্রায় অর্দ্ধাংশ লোক···।

(তদেব, ইংরাজাধিকার—ইংরাজের বৈদেশিক ভাব)

পূর্ববর্তী দুটি পর্যায়ে সর্বপ্রকার যতি চিহ্নের ব্যবহার ইংরেজি অনুসরণে শুরু

২. বর্তমান [illegible] অধ্যায়, পৃ. [illegible]।

হয়েছিল। আলোচ্য পর্যায়ে ঐ ধারারই সম্যক রক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তবে, কষি বা 'ড্যাশ' চিহ্নের ব্যবহার পূর্ববর্তী পর্যায়ে খুব বিরল ছিল। এই পর্যায়ে, কষি-র ব্যবহার নিয়মিত হয়ে আসে। ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রভৃতি গ্রন্থে কষি ব্যবহারের অধিক প্রবণতা দৃষ্ট হয়। বিবেকানন্দ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতির রচনাতেও এই ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়:

[১] কিন্তু তাহা কেহ জানিতেও পারে নাই—দৌরাত্ম্য নাই
—কাতরোক্তি নাই—আপনার কর্ত্তব্য পালনে যথাশক্তি ক্রটিও নাই।
(ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সামাজিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রকৃতি, হিন্দু সমাজ)

[২] সে সভাগৃহ—সে সিংহাসন—সে রাজা—সে রাজপুত্র
—সে রাজমন্ত্রিবর্গ—সকলই গিয়াছে।
(তদেব, পুষ্পাঞ্জলি, ৫ম অধ্যায়)

[৩] কেবল ধূ ধূ বালি—রাজপুতানার ভাব—বৃক্ষহীন তৃণহীন পাহাড়।
(বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক)

[৪] আর প্রজাগুলো ত সেইখানেই মারা গেল,—
হে রাম! চমকে যেওনা, ভাঁওতায় ভুল না।
(বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য)।

খ. নূতন গ্রহণ

তৃতীয় পর্যায়ে নতুন গ্রহণের ক্ষেত্রে ইংরেজি অলংকার বা 'রেটরিকে'র প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। নানাধরণের ইংরেজি অলংকারের ব্যবহারের ফলে বাংলা গদ্য সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। অলংকার ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।

অলংকার:

ইংরেজি 'পলিসিণ্ডেটন' অলংকার অনুসরণে বাক্য গঠনের প্রবণতা এই সময় পরিলক্ষিত হয়। বলেন্দ্রনাথ ও ভূদেবের রচনা থেকে দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

[১] ইহার আঁকাবাঁকা অসংখ্য রাজপথ 'এবং' গলিপথে 'এবং' এইসকল পথের…।
(বলেন্দ্রনাথ, লাহোরের বর্ণনা)

[২] তিনি আপনার আইন 'এবং' ভাষা 'এবং' ধর্ম্মপ্রণালী…।
(ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ, ইংরাজাধিকার—ইংরাজের বৈদেশিক ভাব)

[৩] ....আকাশ এবং পৃথিবী—পিতা এবং মাতা—পুরুষ এবং প্রকৃতি।

(ভূদেব, পুষ্পাঞ্জলি, ৭ম অধ্যায়)

এ্যাসিণ্ডেটন অলংকারের ব্যবহার :

[১] ...কিন্তু তথাপি ইহার গম্বুজে, মিনারে, তোরণে, প্রাচীরে, গৃহদ্বারে অলিন্দে, বাইরের সম্মুখে বিচিত্র খোদিত গোল বারান্দায়, বাতায়নে গবাক্ষে ।

(বলেন্দ্রনাথ, লাহোরের বর্ণনা)

[২] .. দূরে জ্যোৎস্নাসিক্ত একখানি গ্রাম—অস্পষ্ট ধোঁয়া গোলাঘর, কুটীর-বেড়া, প্রাঙ্গণে দীর্ঘছায়া, দেয়াল বাহিয়া লতা।

(বলেন্দ্রনাথ, দেয়ালের চিত্র)

[৩] লাল পবদা অবধি দ্বাররক্ষক, কাহারী, চোবদারী, রাজাদারী ইত্যাদি সকলেই ।

(যদুনাথ সর্বাধিকারী, রোজনামচা)

[৪] · ক্ষেত্রে, গৃহে, উপত্যকায় বা পর্বতশৃঙ্গে... ।

(রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, ৪র্থ অধ্যায়)

এ্যান্টিক্লাইম্যাক্স :

[১] শতদেব, শতদেবী, নবগ্রহ, নবরস, অযুত নরনারী, বিচিত্র পত্রপুষ্প, যৌবনবিলাস কলা পাষাণে চিরমুদ্রিত হইয়া· ·।

[২] ফরাসীদিগের বারুদের পিপায় বালি এবং কয়লা, ময়দার সিন্দুকে খড়ি এবং করাতের গুঁড়া, জুতার চামড়ার তলে পেস্টবোর্ড।

(ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ, পাশ্চাত্য ভাব—তাহার উপসংহার)

ক্লাইম্যাক্স :

[১] তিনি যথার্থ ভাবুক, তিনি যথার্থ প্রেমিক, তাঁহার গুণের সীমা নাই, তিনি জগতে অতুল্য।

(অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভালবাসা)

[২] ভোট ব্যালট, মেজরিটি সব দেখলুম··· ।

(বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

[৩] আহা-হা। কি প্যাচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ !

(বিবেকানন্দ, ভাববার কথা)

[৪] ইহারা দেশী হাতচালা ছাড়িয়া বিলাতী হাতচালা ধরিয়াছেন, ইহারা দেশী ভূত ছাড়িয়া বিলাতী ভূত লইয়াছেন, ইহারা দেশী অবতার ত্যাগ করিয়া বিলাতী অবতার গ্রহণ করিতে উদ্যত···।

(ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ, পাশ্চাত্য ভাব—বৈজ্ঞানিকতা)

[৫] দৌরাত্ম্য নাই—কাতরোক্তি নাই—আপনার কর্ত্তব্য পালনে যথাশক্তি ত্রুটি নাই।

(ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রকৃতি)

এ্যান্টিথিসিস :

[১] কলের ব্যবহার বাড়িলেই মজুরের কাজ কমে, কাজ কমিলেই মজুরের দর বাড়িয়া যায়।

(ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ, ভবিষ্যবিচার—ইউরোপের কথা)

[২] এই সম্মিলিত-সংযত-দৃঢ়ীভূত, আবার বিচ্ছিন্ন-বিভাজিত-বিলীন।

(ভূদেব, পুষ্পাঞ্জলি, চতুর্থ অধ্যায়)

[৩] উহার এক কার্য্যের নাম সংকলন, অপর কার্য্যের নাম বিকলন।

(ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ, কর্ত্তব্য নির্ণয়—নেতৃ প্রতীক্ষা)

[৪] আপনার জীবন আপনি পাঠ করিতে কেহ সমর্থ হয় না, পরের জীবন কিরূপে পাঠ করিবে?

(কালীপ্রসন্ন ঘোষ, প্রভাতচিন্তা, মনুষ্যের জীবনচরিত)

[৫] স্বার্থত্যাগে ভালবাসার আরম্ভ, আত্মদানে তাহার পূর্ণ বিকাশ।

(অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভালবাসা)

এপিগ্রাম :

[১] পরকালকে মাথায় রাখিয়া উহারা ইহকাল ভোগ করিতে চায়।

(ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ, ভবিষ্যবিচার—ইউরোপের কথা)

[২] জগতে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সাম্য নাই।

(ভূদেব, পাশ্চাত্য ভাব, সাম্য)

[৩] স্থূল দেহের কোন অনিষ্ট হলেই সূক্ষ্ম শরীরে আঘাত লাগে, আর স্থূল শরীরের ধ্বংস হলেই সূক্ষ্ম শরীরের একান্ত নাশ···।

(বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক)

[৪] বাধাই ত সিদ্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ।

(ভূদেব)

বিবিধ প্রভাব :

পক্ষান্তরে = On the contrary

ভূদেবের রচনায় এই ধরণের ব্যবহার সর্বাধিক। বিশেষতঃ, 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থটিতে 'পক্ষান্তরে' শব্দটি প্রায়শঃই ব্যবহৃত হয়েছে :

[১] পক্ষান্তরে, রোমীয় প্রাচীন ব্যবস্থানুসারে…।

(ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রকৃতি)

[২] পক্ষান্তরে, জর্মণ জাতীয় পণ্ডিতেরা ।

(ভূদেব, ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা)

[৩] পক্ষান্তরে, ভারতবাসীর মন অপর সকল…।

(ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ, কর্ত্তব্য নির্ণয়, নেতৃ প্রতীক্ষা)

অন্যান্য উদাহরণ :

[১] আমার বোধহয় যে…(It seems to me that এর প্রভাব)।

(তদেব)

[২] চাযের পেযালার উপর কথার ফুৎকার…।

(Storm in a tea cup-এব অনুসরণ)

(বলেন্দ্রনাথ, নিমন্ত্রণ সভা)

[৩] সে যদি কখনো কাহারো ফরমাস মত চিত্র করিল (ইংরেজি Subjunctive Mood-এর অনুসরণ)

(অক্ষয়চন্দ্র সরকার, গগন-পটো)

[৪] ভালবাসা একটি মহাযজ্ঞ।

—ইংরেজি Indefinite Article (অনির্দেশক অব্যয়) এর ব্যবহার।

(অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভালবাসা)

[৫] পাছে স্বার্থপরতা আসে ।

(Lest selfishness comes)

(বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক)।

[৬] দেখিলেন, স্থানটি অতি ভয়ানক।

(ভূদেব, সফল-স্বপ্ন)

—ইংরেজি রীতির অনুসরণ : ক্রিয়াপদকে সম্মুখে আনার প্রবণতা অ্যাংলো-আইরিশ সাহিত্যে অবশ্য বেশী দেখা যায়।৩

[৭] ইংরেজি প্রবন্ধাদির আদর্শ অনুসরণে কোন ব্যক্তির নাম গোপন রাখবার জন্য নামের আদ্যাক্ষরের পর কষি-র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় : 'তু—'।

(বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক)

তিন

ইংরেজি শব্দ চয়ন :

আলোচ্য পর্যায়ের একজন প্রখ্যাত গদ্যশিল্পী ইংরেজি শব্দচয়ন প্রসংগে মন্তব্য করেছেন :

ইংরেজি শব্দ অনেক আসিয়াছে, আরও অনেক আসিবে। ইউরোপের নূতন নূতন দ্রব্যাদির নাম আর আইন ও ব্যবহারঘটিত এবং বিজ্ঞানঘটিত অনেকানেক পারিভাষিক শব্দ, আর জাতিবাচক এবং গুণবাচক কতক শব্দ অবশ্যই আমাদের ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া স্বর সামঞ্জস্যের নিয়মানুসারে অপভ্রষ্ট হইয়া চলিত হইবে।

(ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ)

সুতরাং, নানা সূত্রে ইংরেজি শব্দ সেই প্রথম পর্যায় থেকেই বাংলায় গৃহীত হয়েছে। বাংলা গদ্যে নতুন বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রয়োজনে অনেক ইংরেজি শব্দের নতুন প্রবেশ ঘটেছে। আলোচ্য পর্যায়ে গৃহীত নতুন কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করছি :

মেজরিটি | সেনেট |
এক্সপ্রেস | কনস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ | সি সিক্‌নেস্‌
ক্রিটিসিজম্‌ | ট্রাম | এমিগ্রাণ্ট | মেস্‌ |

(বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক)

এপ্রেণ্টিস্‌ | ড্রেনেজ | বজেট | পাম্পিং |

(সংবাদ প্রভাকর, প্রাত্যহিক পত্র)

৩. Price, Alan, Riders to the Sea & The Playboy of the Western World. first edition. p 41.

হেয়ার-ওয়াশ | ডিনার | স্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ |
ক্রিমিন্যাল | টেক্‌নিক | গ্যালান্ট্রী ইত্যাদি।
(বলেন্দ্রনাথ)

ইংরেজি শব্দের সংগে বাংলা শব্দের সমাস করে এই পর্যায়ে অনেক সময় বিভিন্ন ইংরেজি শব্দ বাংলা গদ্যে আপন করে নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি চমৎকার উদাহরণ বলেন্দ্রনাথের রচনা থেকে উদ্ধৃত করছি :

ডিনার আসনে | জীবন-ট্রাজেডি |
ড্রয়িংরুমবীরেরা | কমপ্লিমেণ্টমুখে | ষ্টীম-লাঙ্গল |
কৌচকেবিনকণ্টকিত ইত্যাদি।

বাংলা বাক্যে বিভিন্ন ইংরেজি শব্দ এইভাবে অনায়াসে অত্যন্ত আপন হয়ে উঠছে। ইংরেজি শব্দ বাংলা বাক্যে আগন্তুক বলে মনে হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ :

রুমাল কুড়ানো 'ডিগ্রী' পাওয়া 'গ্যালাণ্ট্রী' তখনও এদেশে আমদানী হয় নাই।

(বলেন্দ্রনাথ, নিমন্ত্রণ সভা)

সাহসী 'ড্রইংরুমবীরেরা' চিরভ্যস্ত সনাতন 'কম্প্লিমেণ্টমুখে' 'পিয়ানোর' একটু নিকটে ঘেঁসিয়া আসেন।

(তদেব)

এই 'ফেসানানুসারী' রহস্যদলই বর্ত্তমান বাঙ্গালায় 'সেণ্টিমেণ্টাল' পদবাচ্য।

(বলেন্দ্রনাথ, কবি ও সেণ্টামেণ্টাল)

ক্রমশঃ আমাদের উৎসবগুলি 'আপিসী'-ছাঁচে গড়িয়া উঠিতেছে।

(বলেন্দ্রনাথ, শুভ উৎসব)

ওপরে, পল্টনের 'ব্যারাক'। সামনে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি 'হোটেল'।

(বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক)

'কাপ্তেন' বললেন, "এইখানটা 'মনসুনের' কেন্দ্র · ···।"

(তদেব)

'পার্লামেন্ট' হেথায় চলবে না।

(তদেব)

একরাত্রি 'কারণটাইনে' থেকে সকালবেলা নামবার হুকুম এলো।

(তদেব)

'রুবীযান' জাহাজে 'ক্রুর' উপর 'ফাস্ট' ক্লাশ'।

(তদেব)

এই সমস্ত বাক্যে যেভাবে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে কথনোই খুব একটা কানে লাগে না। ইংরেজি শব্দ বাংলা বাক্যে এমনভাবে মিলে-জুলে রয়েছে যে বাংলা বাক্যের স্বতঃস্ফূর্ততা বিদেশী চেহারায় বিনষ্ট হয়নি। তবে, কোন কোন ক্ষেত্রে, অবশ্য প্রয়োজনের বশবর্তী হয়ে অপ্রচলিত বিদেশি শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এদিক থেকে বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি থেকে দুই একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি :

> এই 'ক্লাসিক' 'গ্রীক' শিল্পের সম্প্রদায়, প্রথম 'আটিক', দ্বিতীয় 'পিলোপনেসিয়েন'। 'আটিক' সম্প্রদায়ে আবার দুইপ্রকার ভাব—প্রথমে মহাশিল্পী 'ফিডিয়াসের' প্রতিভাবল ; "অপূর্ব সৌন্দর্য্য মহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব, যাহা কোনকালে মানব মনে আপন অধিকার হারাইবে না"—এই বলে যাকে জনৈক ফরাসী পণ্ডিত নির্দেশ করেছেন। 'স্কোপাস' আর 'প্র্যাক্সিটেল' আটিক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাবের প্রধান শিক্ষক।...
> 'ক্লাসিক' 'গ্রীক' শিল্পের 'পিলোপনেসিয়ন সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষক 'পলিক্লেট' এবং 'লিসিপ্স'।

(তদেব)

> দ্বিতীয় দিন 'ওলিম্পিয়ান' 'জুপিটারের' মন্দির, থিয়েটার 'ডাইওনিষিয়াস' ইত্যাদি সমুদ্রতট পর্য্যন্ত দেখা গেল।

(তদেব)

চার

পরিভাষা :

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও দর্শন বাংলা গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের গদ্যশিল্পীরা পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেরই আন্তরিক বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। মূলতঃ, দুটি ধারায় এই প্রচেষ্টা প্রবাহিত :

(১) দর্শনমূলক (রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন) পরিভাষা
(২) বিজ্ঞানমূলক পরিভাষা

দর্শনমূলক পরিভাষা :

এই ধরণের পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর বিরচিত 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থটি সবিশেষ স্মরণীয়। উল্লিখিত গ্রন্থটিতে প্রতীচ্যের রাজনীতি-সমাজনীতি প্রভৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজি কোন 'টার্ম'-এর ব্যবহার না করে তার বাংলা কোন সমার্থক শব্দ তৈরী করে ব্যবহার করতে প্রযত্ন নিয়েছেন। ইংরেজি 'term'-এর টানে সে সময়ে যে সমস্ত বাংলা শব্দ বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যবহৃত হল তার অনেকগুলিই অদ্যাবধি তাদের বিশেষ পারিভাষিক অর্থ নিয়ে বাংলা ভাষায় টিকে রয়েছে। আর যে সমস্ত শব্দ বর্তমান যুগে পরিভাষা হিসাবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে সেগুলোও আধুনিক পরিভাষার রাজ্যে নিঃসন্দেহে পথ প্রদর্শকের কাজ করেছে। ভূদেব-সৃষ্ট কতিপয় পরিভাষা উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করছি। এই সমস্ত পরিভাষা তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' থেকে উৎকলিত হয়েছে :

Nihilist = বিধ্বস্তা।
Economic Inequality = আর্থিক বৈষম্য।
Foreign Debt = বৈদেশিক মান।
Capital = মূলধন।
Capitalist = মূলধনী।
Law = ব্যবস্থাশাস্ত্র।
Exchange = বিনিয়োগ।
Journalism = বার্তাশাস্ত্র।
Stone Age = প্রস্তর যুগ।
Division of Labour = শ্রমবিভাগ।
Socialism = সাম্যবাদ।
Individualism = স্বাতন্ত্রিকতা।
Geometry = রেখাগণিত।
Hypothesis = অনুমান।
Chemical Analysis = রাসায়নিক পরীক্ষাবিধান।
Fine Arts = সুকুমার শিল্প।
Copper Sulphate = তুঁতে।
Solvent = দ্রাবক।
Social Contract Theory = সামাজিক চুক্তিবাদ।
Positivism = হিতবাদ।
Colony = উপনিবেশ।
Inland Trade = অন্তর্বাণিজ্য।
Statistics = আদমসুমারী।
Foreign Trade = বহির্বাণিজ্য।
Wage = মজুরের দর।

Ethics = নীতিশাস্ত্র।

Balance of Power = শক্তি সামঞ্জস্য।

Papacy = যাজক তন্ত্র।

Politics = রাজনীতি শাস্ত্র।

ভূদেব সৃষ্ট পরিভাষাসমূহ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অনেকগুলি পরিভাষা-ই (যথা বৈদেশিক ঋণ, মূলধন, বিনিযোগ, শ্রমবিভাগ, অনুমান, দ্রাবক) আধুনিক যুগেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন কোনটি আবার সামান্য পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন—ভূদেব ব্যবহৃত 'সামাজিক চুক্তিবাদ' আধুনিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রন্থে হয়েছে 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ'।

এ যুগের আরো কয়েকটি পরিভাষার দিকে লক্ষ্য করছি, যেগুলো তর্কশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। অনেকে এই পরিভাষাগুলি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের রচনা বলে মনে করেছেন।[৪]

Deductive = অনুমিতক। Inductive = আন্বীক্ষিক।

Hypothesis = প্রকল্পনা। Subjective = প্রমাতৃগত।

Objective = প্রমেয়গত।

বিবেকানন্দও কিছু পরিভাষা রচনা করেছেন :[৫]

Inscription = শিলালেখ। Red Sea = লোহিত সমুদ্র।

Mediterranean Sea = ভূমধ্যসাগর।

Funeral Service = শ্রাদ্ধমন্ত্র।

Merchant ship = পণ্যপোত।

বলেন্দ্রনাথ[৬] Evolution-এর বাংলা করেছিলেন অভিব্যক্তিবাদ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ আমাদের পুরানো আদর্শ অনুসরণ করে 'বিবর্তবাদ[৭]' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

৪. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ১২১।

৫. বিবেকানন্দের পরিভাষাগুলি 'পরিব্রাজক' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

৬: বলেন্দ্রনাথ 'অভিব্যক্তিবাদের নূতন অংগ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন যে, 'অভিব্যক্তিবাদ' শব্দটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছেন।

৭. কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র আলোচনা প্রসংগে উল্লেখ করেছেন (নিভৃত চিন্তা, ১ম সংস্করণ, পৃ ১৭।)

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা :

উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কয়েকজন বাঙালী অপরিসীম নিষ্ঠা এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের নিষ্ঠার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিস্মিত হতে হয় এবং প্রবং প্রশ্ন জাগে তাঁদের পরিশ্রমের এই মূল্যবান ফসলের দিকে লক্ষ্য না করে, গত অর্ধশতাব্দী কাল আমরা কেন ভেবেছি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা সম্ভবপর নয়।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রসংগে সেযুগে যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে তিনটি সবিশেষ স্মরণীয় :

রাসায়নিক পরিভাষা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।[৮]

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা : অপূর্বচন্দ্র দত্ত।[৯]

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা : যোগেশচন্দ্র রায়।[১০]

প্রবন্ধত্রয়ের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দীর্ঘায়ত প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি অত্যন্ত অনায়াসে পরিভাষা-সমস্যার স্বরূপ তুলে ধরেছেন এবং সমাধানের পন্থাও নির্দেশ করেছেন। যাঁরা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত আছেন তাঁদের কাছেও এই প্রবন্ধটি মূল্যবান পথ প্রদর্শনার কাজ করবে।

পরিভাষার 'উদ্দেশ্য নির্ণয়' অংশটিতে তিনি বলেছেন :

'পারিভাষিক শব্দের অভাবে বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচনা ও প্রচার দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়াছে।…

বলা বাহুল্য, উপযোগী পরিভাষার আশ্রয় না পাইলে কেবলমাত্র প্রচলিত ভাষার সাহায্যে কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রের সম্যক প্রচার বা সম্যক বিকাশের সম্ভাবনা নাই।…

আমাদের দেশে যদি কোন কালে ইংরাজি ভাষা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া মাতৃভাষার পাশাপাশি দাঁড়াইতে সমর্থ হয়, তখন বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষার আশ্রয় লওয়া আবশ্যক হইবে না।…কিন্তু ইংরাজি ভাষা সেরূপ লোকায়ত ভাষা হইয়া কখন এদেশে দাঁড়াইবে কিনা সন্দেহ, এইরূপ ঘটনা আমাদের স্বজাতির স্পৃহনীয় কিনা, সে বিষয়েও ঘোর সংশয় আছে।…

৮. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০২।

৯. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, [illegible] ভাগ, [illegible] সংখ্যা, ১৩০১।

১০. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, [illegible] ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১৩০৫

> বাঙ্গালায় রাসায়নিক পরিভাষা সঙ্কলনের কোন চেষ্টা অদ্যাপি হয় নাই বলিলে চলে, দুই চারিটি পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ হইয়াছে মাত্র। অধিকাংশ স্থানেই—ইংরেজি শব্দের যথাসাধ্য উচ্চারণ বহাল রাখিয়া অক্ষরান্তরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র।...উহাতে কোন ফলোদয় হইবে না।
>
> সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় বাঙালীর প্রকৃতির উপযোগী বিজ্ঞানের ভাষা সঙ্কলন করিতে হইবে।[১১]

যে যুক্তিক্রম অনুসারে ল্যাভয়শীয়র রাসায়নিক পরিভাষা রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন সেই ধরণের যুক্তিক্রম অনুসরণ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। এবং পরিভাষা সৃষ্টির পূর্বে কোন যুক্তি অনুসরণ করে পারিভাষিক শব্দ গঠন করেছেন, তার বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর প্রবন্ধে।[১২]

প্রবন্ধে 'মূল পদার্থের পরিভাষা' শীর্ষক অংশে রামেন্দ্রসুন্দর প্রত্যেকটি মূল পদার্থের নামকরণের ব্যুৎপত্তি অনুসরণ করে বাংলা পরিভাষা গঠন করেছেন। পরিভাষা গঠনের ক্ষেত্রে তিনি যে ধরণের যুক্তি অনুসরণ কবেছেন তার উল্লেখ করছি :

> Cerium—Ceres গ্রহের সহিত আবিষ্কার স্মরণার্থ। Ceres—শস্য সম্পত্তির দেবতা, আমাদের লক্ষ্মী বা শ্রী।
>
> Cerium=শ্রীক ধাতু বলিব।

রামেন্দ্রসুন্দর সমস্ত মূল পদার্থের বাংলা পরিভাষা এবং সাঙ্কেতিক নামের তালিকা উল্লিখিত প্রবন্ধের শেষে প্রকাশ করেছিলেন। এখানে কতিপয় উদ্ধৃত করছি :

ইংরেজি নাম	বাংলা পরিভাষা	সাঙ্কেতিক নাম
Hydrogen	অবুনক	অ
Chlorine	হরিণ	হ
Fluorine	দীপক	দী
Oxygen	দহক	দ
Sulphur	গন্ধক	গ
Boron	বেরিক	বে
Silicon	শিকতক	শি

১১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা, [illegible], পৃ [illegible]।
১২ [illegible], পৃ ১৫০-১৫১।

ইংরেজি নাম	বাংলা পরিভাষা	সাঙ্কেতিক নাম
Tin	রঙ্গ	র
Nitrogen	মরুতক	ম
Phosphorous	স্ফুরক	ক
Vanadium	বর্ণাটক	ব
Arsenic	তালক	ত
Antimony	অঞ্জনক	ঞ্জ
Bismuth	বিস্মিতক	স্ম
Lithium	লোহিতক	লো
Potassium	পত্রক	প
Rubidium	রূপদক	রূ
Silver	রজত	জ
Calcium	খটিক	খ
Barium	ভরক	ভ
Magnesium	মগ্নক	গ্ন
Mercury	পারদ	পা
Copper	তাম্র	তা
Beryllium	বিরলক	বি
Erbium	উবর্ব্বীক	উ
Trebium	তুবর্ব্বীক	র্ব
Thallium	স্থলক	স্থ
Gold	হেম	এ
Platinum	প্লাটিনক	প্ল
Iridium	হরিতক	হ
Rhodium	হ্রদক	হ্র
Chromium	ক্রোমক	ক্র
Manganese	মঙ্গলক	ঙ্গ
Iron	লৌহ (আয়স)	ল
Cobalt	[illegible]	[illegible]
Nickel	[illegible]	[illegible]

ইংরেজি নাম	বাংলা পরিভাষা	সাঙ্কেতিক নাম
Uranium	বরুণক	ণ
Cerium	শ্রীক	শ্র
Aluminium	ফটিক	ট
Thorium	থোরক	থো
Indium	সিন্ধুক	ন্ধ
Gallium	গলিক	লি
Helium	হেলিক	হে
Argon	আর্গন	আ

এই ধরণের রাসায়নিক পরিভাষা এবং তার সংগে সাঙ্কেতিক নামের ব্যবহার রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্বে কেউই করেননি। এখন, বাংলায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচিত হলেও পরিভাষা এবং সাঙ্কেতিক নামের ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দই ব্যবহার করা হয়।

এ ছাড়া, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বহু যৌগিক পদার্থ এবং লবণ (salt) এর নাম উদভাবন করেছিলেন। নমুনা স্বরূপ, কয়েকটি যৌগিক পদার্থের নাম উল্লেখ করছি :

N_2O	Nitrous Oxide	= উপদগ্ধ মরুত।
N_2O_2	Nitric Oxide	= আদগ্ধ মরুত।
N_2O_3	Nitrous Anhydride	= দগ্ধ মরুত।
N_2O_4	Nitric Peroxide	= আদগ্ধ মরুতক।
N_2O_5	Nitric Anhydride	= দগ্ধ মরুতক।

ইত্যাদি ॥

পাঁচ

বাংলা গদ্য সাহিত্য যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে ততই সে প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে অপ্রয়োজনের দিকে হাত বাড়িয়েছে—উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 'শত শত আনন্দের আয়োজনে'। প্রসংগ বা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সে

জ্ঞানের সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যেমন ভাবের সাহিত্যে উন্নীত হয়েছে, তেমনি ভাষারীতির ক্ষেত্রেও তার আটপৌরে কাজ-চলা পোষাক পরিত্যাগ করে বিচিত্র সৌখিন সাজে সজ্জিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী পর্যায়ে বাক্যের সাধারণ গঠনরীতির জন্য বাংলা গদ্য ইংরেজির দ্বারস্থ হয়েছিল। এই পর্যায়ে তার পাশাপাশি বাংলা গদ্য সাহিত্যধর্মিতা অর্জনের প্রেরণায় ইংরেজির উৎকৃষ্ট রচনা-শৈলী আয়ত্ত করার কাজে ব্যাপৃত হযেছিল। এই পর্যাযের রচনা শৈলীর উৎকর্ষ উদ্ধৃত ছোট ছোট বাক্যগুলি থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই প্রেরণা সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হব।

নবম অধ্যায়

বিষয়বস্তু ও ভাষারীতি

গদ্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র

এক

ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রান্তরে এবার এলো ফসল তোলার পালা। ইংরেজি সাহিত্য এবং ইংরেজি চিন্তাজগতের যে বীজ অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে নতুন যুগের নতুন বাঙালী কেবলই ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের নিঃস্ব প্রান্তরে, সে বীজ অবশেষে ফলে পুষ্পে প্রান্তর পূর্ণ করে দিল। আমাদের 'মনের খাদ্যে'র ফলন শুরু হল আমাদের 'ঘরের দ্বারে'। বীজ ছড়াবার কাজে, বাংলা সাহিত্যের উষাকালে, নায়ক ছিলেন রামমোহন, ফসল ফলাবার বেলায় নায়ক হিসাবে আবির্ভূত হলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

কবিগুরু বাংলা সাহিত্যের আসরে বঙ্কিমচন্দ্র তথা 'বঙ্গদর্শন'-এর আবির্ভাবকে (১৮৭২) আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনির্' ১ বলে কল্পনা করেছেন। কবিগুরুর ভাষায় 'মুষলধারে ভাববর্ষণে বাংলা সাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিম বাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দ বেগে ধাবিত হইল।'২ বাংলা সাহিত্যের এই যৌবনচাঞ্চল্য এবং পরিপূর্ণতার প্রকাশ নিঃসন্দেহে ঘটেছে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পর। বঙ্কিম ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণ করে রোমান্স ও উপন্যাসের সার্থক সূত্রপাত করেছেন বাংলা সাহিত্যে; তিনিই সমাজনীতি, রাজনীতি এবং ধর্মনীতি সম্পর্কিত প্রবন্ধ উন্নীত করলেন ভাবের সাহিত্যে; সমালোচনার সার্থক সূত্রপাত ঘটালেন 'বঙ্গদর্শন'-এর পাতায়। তাঁর 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের পূর্বসূরী হিসাবে দেখা দিল এবং একাংক নাটক (one-act play)-এর আগমন সম্ভাবনা৩ উজ্জ্বল করল 'লোকরহস্যে'র অন্তর্গত 'বসন্ত ও বিরহ', 'New year's day', বাংলা সাহিত্যের আদর' প্রভৃতি এবং

---

১. রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক সাহিত্য (বঙ্কিমচন্দ্র)।

২. তদেব।

৩. Ray, Apurba Kumar, edited & translated, Girisankar's One-act Plays, introduction.

'পুষ্প নাটক'৪। বঙ্কিমের প্রতিভাস্পর্শে বাংলা সাহিত্য নব সৃষ্টির পথ খুঁজে পেল। এই প্রথম বাংলা গদ্য সাহিত্য স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠল।

বঙ্কিমের গদ্য সাহিত্য বিষয়বস্তু এবং ভাষারীতির দিক থেকে প্রধানতঃ ইংরেজি তথা প্রতীচ্যের সাহিত্য ধারায় সবিশেষ প্রভাবিত। অবশ্য, বঙ্কিমের গদ্য সাহিত্যের ওপর প্রতীচ্য প্রভাব বিশেষ সক্রিয় থাকলেও তার বিশিষ্টতা এখানেই যে তিনি প্রতীচ্যের অন্ধ অনুকরণ করেননি। প্রাচ্য আদর্শের কষ্টি-পাথরে যাচাই করে গ্রহণ করেছেন সবকিছু। সমন্বয়ের আদর্শই তাঁর রচনায় প্রকট হয়ে উঠেছিল।

দুই

বিষয়বস্তু / বিজ্ঞান

সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি অনুসরণমূলক প্রবন্ধ দিয়ে আলোচনা শুরু করছি। এই সমস্ত প্রবন্ধে তিনি প্রধানতঃ হাক্স্‌লি, টিণ্ডল, প্রক্টর্, লাকিয়ার লায়েল. বাক্ প্রভৃতির বিভিন্ন প্রবন্ধের.অনুসরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব তিনি এখানে আপন আদর্শের আলোকে নতুন করে উদ্ভাসিত করতে অগ্রসর হননি, সেটা সম্ভবপরও ছিল না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিছক অনুসরণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন :

> এই প্রবন্ধ প্রধানতঃ হাক্স্‌লী, টিণ্ডল, প্রক্টর, লাকিয়ার, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোনটিই অনুবাদ নহে। তবে টিণ্ডল সাহেবের 'ডাস্ট এণ্ড ডিজিজ' নামক প্রবন্ধের সারমর্ম 'ধূলা', গ্লেসর সাহেবের গ্রন্থ হইতে 'গগন পর্য্যটন', হাক্স্‌লীর 'লে সার্‌মন্‌স্‌, হইতে 'জৈবনিক' এবং লায়েল সাহেবের "Antiquity of Man" হইতে 'কতকাল মনুষ্য' নামক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে।
>
> (বিজ্ঞান রহস্য, ১ম সংস্করণের বিজ্ঞাপন)

এই প্রবন্ধনিচয় জ্ঞানের সাহিত্য হিসাবে গ্রহণীয়।

আমরা জানি, রামমোহন একদা লর্ড আমহার্ষ্টকে পত্র মারফৎ এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তনের যে আবেদন জানিয়েছিলেন সে আবেদন পত্রে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব

৪. পুষ্প নাটক, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, পৃ ৯৯১-৯৯৩ দ্রষ্টব্য।

আরোপ করেছিলেন। শ্রীরামপুর মিশনে উইলিয়ম কেরির উত্তর সূরিগণ এবং রামমোহন প্রথম বাংলা ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কোন কোন তথ্য আমাদের দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করেছেন। বিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ রচনার ধারা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে অব্যাহত রইলো 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বঙ্গদর্শন' তথা অক্ষয়কুমার ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচেষ্টায়। বঙ্কিমের উল্লিখিত প্রবন্ধনিচয় এই ধারারই পরিপুষ্টি সাধন করেছে। দেশের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যের বাহুবিজ্ঞান চর্চা ও আলোচনার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করেন :

> অনেকে বলেন, ইউরোপীয়েরা কেবল বাহুবলে এই ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। বাহুবলই বলুন, আর যাহা বলুন সে কথা কতদূর সত্য, তাহার অল্পমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথাটিও অত্যুক্তি দোষে দূষিত কখনই বলা যাইতে পারে না যে ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞান বলে এই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, বিজ্ঞান বলেই ইহা রক্ষা করিতেছেন।
>
> (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৭৯)

সুতরাং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এ প্রবন্ধগুলিই একত্রে গ্রথিত হয়ে 'বিজ্ঞান রহস্য' নামে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তথ্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিম এখানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল হলেও উপস্থাপনার গুণে প্রবন্ধগুলি পরিণত হয়েছে মৌলিক সৃষ্টিতে। সমন্বয় যুগের কর্ণধার বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনীশীল প্রতিভার স্বাক্ষর এ সমস্ত প্রবন্ধও অনেকাংশে বহন করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'জৈবনিক' প্রবন্ধটি হাক্সলীর 'লে সারমন্‌স্' গ্রন্থের 'অন দি ফিজিক্যাল বেসিস অব লাইফ' প্রবন্ধটি অনুসরণে লিখিত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের কোন কোন অংশের পাশাপাশি হাক্সলীর প্রবন্ধের কোন কোন অংশ এই প্রসংগে উদ্ধৃত করছি :

বঙ্কিমচন্দ্র :

> এক বিন্দু শোণিত লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা কর। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার বস্তু দেখিবে। অধিকাংশই রক্তবর্ণ এবং সেই চক্রাণুসমূহের বর্ণ হেতুই শোণিতের বর্ণ রক্ত, তাহাও দেখিবে। তন্মধ্যে মধ্যে মধ্যে, আর কতকগুলি দেখিবে, তাহা রক্তবর্ণ নহে,—বর্ণহীন,

রক্ত-চক্রাণু হইতে কিঞ্চিৎ বড। প্রকৃত চক্রাকার নহে—আকারের কোন নিয়ম নাই। শরীরাভ্যন্তরে যে তাপ, পরীক্ষ্যমান রক্ত বিন্দু যদি সেইরূপ তাপসংযুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই বর্ণহীন চক্রাণু সকল সজীব পদার্থের ন্যায় আচরণ করিবে। আপনারা যথেচ্ছ চলিয়া বেড়াইবে আকার পরিবর্ত্তন করিবে, কখন কোন অঙ্গ বাড়াইয়া দিবে, কখন কোন ভাগ সঙ্কীর্ণ করিয়া লইবে। এইগুলি যে পদার্থের সমষ্টি, তাহাকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটোপ্লাস্ম্ বা বিওপ্লাস্ম্ বলেন।

(বিজ্ঞান রহস্য, জৈবনিক)

Huxley :

[If a drop of blood be drawn by pricking one's finger, and viewed with proper precautions, and under a sufficiently high microscopic power, there will be seen, among the innumerable multitude of little, circular, discoidal bodies, or corpuscles, which float in its colour, a comparatively small number of colourless corpuscles, of somewhat larger size and very irregular shape. If the drop of blood be kept at the temperature of the body, these colourless corpuscles will be seen to exhibit a marvellous activity, changing their forms with great rapidity, drawing in and thursting out prolongations of their substance, and creeping about as if they were independent organisms.

The substance which is thus active is a mass of protoplasm, and its activity differs in detail, rather than in principle, from that of the protoplasm of the settle.]

(Huxley, Thomas, Lay Sermons, Address and Reviews, On the Physical basis of Life, Ch. VI1).[৫]

৫. ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর তারিখে রেভারেণ্ড জেমস ক্র্যানব্রুক (Rev. James Cranbrooke)-এর অনুরোধে এডিনবরায় হাক্সলী 'On the Physical Basis of Life'-শীর্ষক বক্তৃতাটি দেন। এরপর 'Fortnightly Review' পত্রিকায় এই বক্তৃতাটি মুদ্রিত হয়, পরে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হাক্সলীর 'Lay Sermons' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে স্থান পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞান রহস্য' ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সুতরাং বঙ্কিম পাশ্চাত্যের সমসাময়িক চিন্তা জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবেই যুক্ত ছিলেন বোঝা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র :

উদ্ভিদ্ জীব, ভূমি এবং বায়ু হইতে অম্লজানাদি গ্রহণ করিয়া আপন শরীর মধ্যে তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সংযোগ সম্পাদন করিয়া জৈবনিক প্রস্তুত করে; সেই জৈবনিকে আপন শরীর নির্ম্মাণ করে। কিন্তু নির্জীব পদার্থ হইতে জৈবনিক পদার্থ প্রস্তুত করার যে শক্তি, তাহা উদ্ভিদেরই আছে। সচেতন জীবের এই শক্তি নাই; ইহারা স্বয়ং জৈবনিক সৃষ্টি করিতে পারে না, উদ্ভিদ্‌কে ভোজন করিয়া প্রস্তুত জৈবনিক সংগ্রহ পূর্ব্বক শরীর পোষণ করে।

(বঙ্কিমচন্দ্র, বিজ্ঞান রহস্য, জৈবনিক)

...Plants can manufacture fresh protoplasm out of mineral compounds, whereas animals are obliged to produce it readymade, and hence, in the long run, depend upon plants.

(Huxley. On the Physical Basis of Life, Ch VII)

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ দু'টি লক্ষ্য করলে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বঙ্কিমচন্দ্র হাক্সলীর প্রবন্ধের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। হাক্সলীর ভাব অনুসরণে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের বক্তব্য মূলতঃ হাক্সলীর অনুসরণ করলেও প্রবন্ধটির সূচনা, সমাপ্তি এবং পরিবেশনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র মৌলিকত্ব রক্ষা করেছেন। অক্ষয়কুমার দত্তের কাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাল পর্যন্ত অনেকেই ইংরেজির জ্ঞান বিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ এবং গ্রন্থের অনুসরণে গ্রন্থ-প্রবন্ধাদি বাংলায় রচনা করেন। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাঁরা আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করেন নি, বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের ও প্রবন্ধের তাঁরা ভাবানুবাদ করতে অগ্রসর হয়েছেন এবং প্রয়োজনমতো আমাদের দেশীয় পরিবেশের সংগে সংগতি রক্ষা করে বিভিন্ন অংশের পরিমার্জনা করে নব কলেবর দানে অগ্রসর হয়েছেন। এই ধারার সার্থক সূত্রপাত করেছিলেন সমন্বয় যুগের প্রথম সাহিত্য-সারথী অক্ষয়কুমার। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ এই বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণিত করে। অক্ষয়কুমারের, এ প্রসংগে, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা পেয়েছি।

তিন

বিষয়বস্তু/অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শন (মৌলিক) :

ইংরেজি তথা প্রতীচ্যের সাহিত্য প্রভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে আর একটি ধারার প্রবর্তন লক্ষণীয়। এদিক থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির প্রসংগ অনেকটা পরিমাণে প্রতীচ্যের অনুসারি। এ ধারার সূচনায় রয়েছেন রামমোহন এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তথা অক্ষয়কুমার এবং পরিপূর্ণতা দান করেছেন সমন্বয় যুগের ত্রয়ী প্রতিভা, বঙ্কিমচন্দ্র-ভূদেব-রমেশচন্দ্র এবং 'বঙ্গদর্শন' সাময়িক পত্র। উনিশ শতকের বাঙালীর চৈতন্যের প্রত্যুষে টম পেইন-এর 'এজ অব্ রিজিন', বেকন-এর রচনাবলী এবং ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণা সবিশেষ সক্রিয় ছিল। ক্রমশঃ পাশ্চাত্যের দর্শন ব্যাপ্ত ও বিস্তৃতরূপে মধ্যবিত্ত বাঙালীর মানসপট আচ্ছন্ন করে ফেলে। এদিক থেকে পরবর্তীকালে উপযোগবাদী ইংরেজ দার্শনিক গোষ্ঠী, ধ্রুববাদী ফরাসী দার্শনিক গোষ্ঠী এবং জর্মনীর আদর্শ-বাদী দার্শনিক গোষ্ঠী, সংশয়বাদী স্পিনোজা এবং হিউম, প্রাবন্ধিক তথা দার্শনিক এমারসন ও কার্লাইল, সামাজিক চুক্তি মতবাদের ত্রয়ী প্রবক্তা (হবস্-লক-রুশো), হার্বার্ট স্পেনসার-এর জৈব মতবাদ ও 'দি ডেটা অব এথিক্স্', অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো এবং ম্যালথাস্-এর অর্থনীতি সম্পর্কিত তত্ত্ব বাঙালীর চিন্তাজগৎ বিশেষভাবে আন্দোলিত করেছিল। সুতরাং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা গদ্য সাহিত্যে যে বিশেষ ধারার কথা উল্লিখিত হয়েছে সে ধারার বিষয়বস্তু এ সমস্ত দার্শনিকদের চিন্তা ও রচনার দ্বারা ছিল বিশেষভাবে প্রভাবিত। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র তথা সমন্বয় যুগের বৈশিষ্ট্য এখানেই যে কোন প্রবন্ধ বা আলোচনাই শেষ পর্যন্ত নিছক অনুকরণে পর্যবসিত হয়নি। সমস্ত দর্শনই বাঙালী প্রাবন্ধিকেরা স্বাধীন চিন্তার আলোকে গ্রহণ বা বর্জন করেছেন এবং প্রবন্ধগুলো তাই অনুকরণমূলক না হয়ে আলোচনামূলক হয়ে উঠেছে। এ প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একজন প্রখ্যাত সমালোচকের বক্তব্য স্মরণীয় :

> বঙ্কিম ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার ধারা শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিয়া-ছিলেন। এই প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহার যাবতীয় রচনা ও সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও তিনি তাহা যতটুকু সত্য বলিয়া মানিয়াছিলেন ঠিক ততটুকুই

হিন্দুর সাধনা ও সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাই বঙ্কিম প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, এইজন্যই য়ুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা অন্তরায় না হইয়া তাঁহার মধ্য দিয়া এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার দ্বারাই, স্বসমাজ ও স্বজাতির কল্যাণপ্রসূ হইয়াছিল।৬

শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, সমন্বয় যুগের সকল প্রবন্ধশিল্পী সম্পর্কেই একথা সত্য।

যাই হোক, এ ধরণের প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর পাশ্চাত্যের সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশেষ চিন্তার পশ্চাদ্‌ভূমি হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল রুশো, প্রুধোঁ, রবার্ট ওয়েন ও লুই ব্ল্যাঁ-এর দর্শন এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রথম কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিক'-এর বক্তব্য। কয়েকটি প্রবন্ধের নাম এ প্রসংগে স্মরণীয়: 'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'বাহুবল ও বাক্যবল' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর'—এর অন্তর্গত 'বিড়াল' প্রবন্ধটি।

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে মূলতঃ চারটি উপাদান—জমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বুর্জোয়া অর্থনীতি এই উপাদান চতুষ্টয়ের মধ্যে মূলধন-এর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এই ক্ষেত্রে শ্রমিকের শ্রম-কে যোগ্য মূল্য দেওয়া হয় না। সমাজবাদী অর্থনীতি কিন্তু শ্রমের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে শ্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ধরণের আলোচনা বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথম স্থান লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন:

…বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এই পর্য্যন্ত তিন চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই বেশী টাকাটা কার ঘরে যায়? কে লইতেছে?

এ ধন কৃষিজাত—কৃষকেরই প্রাপ্য—পাঠকেরা মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না।……

এই……কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক পায়েন, মহাজন পায়েন,—কৃষী কি পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে সে কি পায়?

৬, মোহিতলাল মজুমদার, বঙ্কিম বরণ, ২য় সংস্করণ, পৃ ২-৩

আমরা এমত বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দুবিসর্গমাত্র পাইয়া থাকে। যাহা পায়, তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। অদ্যাপি ভূমির উৎপন্নে তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষক সম্প্রদায় পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে। যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাথার কাল ঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।

(বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গদেশের কৃষক' শীর্ষক নিবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদ—'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' অংশ দ্রষ্টব্য।)

ধনবন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান দাবি করে থাকেন সমাজতন্ত্রবাদীরা। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধনবৈষম্যের৭ দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন 'বঙ্গদেশের কৃষক' এবং 'বিড়াল' প্রবন্ধে। এই বৈষম্যের রূপ তিনি তুলে ধরেছেন 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে, কিন্তু বৈষম্যের অবসানের জন্য তিনি অবশ্য বলপ্রয়োগ বা বিপ্লবের কথা বলেননি :

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা ; তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ 'বেতন', পঞ্চাশ লক্ষ 'মুনাফা'। মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা 'বেতন' পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই মুদ্রা পড়িবে। মনে কর, হঠাৎ ঐ পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আরও পঁচিশ লক্ষ লোক কোথা হইতে হঠাৎই আসিয়া পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল। সেই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাই ঐ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে।……সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগ দুই মুদ্রার পরিবর্তে এক মুদ্রা হইবে।

(বিবিধ প্রবন্ধ, 'বঙ্গদেশের কৃষক', ৩য় পরিচ্ছেদ, প্রাকৃতিক নিয়ম)

এই ধন-বৈষম্যের ফল শ্রমোপজীবিদের দুর্দ্দশা। এ দুর্দ্দশা থেকে পরিত্রাণের যে উপায় তিনি নির্দেশ করেছেন সে উপায় অবশ্য সাম্যবাদী চিন্তার বিরোধী। তিনি এখানে ম্যালথাস-এর তত্ত্ব মেনে নিয়ে জনসংখ্যা হ্রাসে নিরোধমূলক ব্যবস্থা

৭. ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে 'First International' স্থাপিত হয়। এই ঘটনার দশ বছরের মধ্যে তিনি তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধে এই প্রসংগ উল্লেখ করেছিলেন।

অবলম্বনের ইঙ্গিত দিয়াছেন।৮

অবশ্য 'বিড়াল' নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই ধন-বৈষম্য অবসানের জন্য শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনে বল প্রয়োগের ইঙ্গিতও দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে সাম্যবাদী চিন্তাধারার সংগে বঙ্কিমের নৈকট্য নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করা যায়:

> পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।
>
> আমি আর সহ্য করিতে না পারিযা বলিলাম, 'থাম! থাম মার্জ্জার পণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিযালিষ্টিক্! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধন সঞ্চয় করিতে না পায অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায, তবে কেহ আর ধন সঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।'
>
> মার্জ্জার বলিল, 'না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?
>
> (কমলাকান্তের দপ্তর, ত্রয়োদশ সংখ্যা, 'বিড়াল')

অবশ্য, ধন বৈষম্যের ফল যে শ্রমোপজীবিদের চূড়ান্ত দুর্দশা সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছেন 'সাম্য' প্রবন্ধে। তিনি এই ধন-বৈষম্যের ফল ত্রিবিধ বলে উল্লেখ করেছেন:

> প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দারিদ্র্য। ইহা বৈষম্য বর্দ্ধক।
>
> দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয়, কেননা যাহা কমিল তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে

৮. এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর ম্যালথাসের প্রভাব লক্ষিতব্য। এই প্রসংগে 'বঙ্গদর্শন' (আষাঢ়. ১২৮২) পত্রিকায় প্রকাশিত 'বংশরক্ষা' নিবন্ধটি স্মরণীয়। এই অধ্যায়ে এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসংগে স্মরণীয় যে, Calcutta Review (LV, 1872) পত্রিকায় "Of the Indian Population" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা। ইহাও বৈষম্য বর্দ্ধক।

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্যপজীবিদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব। ইহা বৈষম্যের পরাকাষ্ঠা।

(তদেব, ৫ম পরিচ্ছেদ)

ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সাম্য-প্রতিষ্ঠা। লেখক মন্তব্য করেছেন যে এ উদ্দেশ্য বিপ্লবের ফলে অনেকটা সিদ্ধ হয়েছে। এবং এই বিপ্লবের বীজমন্ত্রের অন্যতম উদগাতা রুশোকে তিনি এ যুগের প্রথম সাম্যবাদী বলে চিহ্নিত করছেন:

ফরাসী বিপ্লব শমিত হইল। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু 'ভূমি সাধারণের' এই কথা বলিয়া রুশো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। কম্যুনিজম্ সেই বৃক্ষের ফল। 'ইণ্টারন্যাশনাল' সেই বৃক্ষের ফল।

(তদেব, ২য় পরিচ্ছেদ)

লেখক এই তত্ত্বের অগ্রগতি ও বিভিন্ন ধরণের বক্তব্যের উল্লেখ করতে গিয়ে মূলতঃ রবার্ট ওযেন, লুই ব্ল্যাঁ এবং কাবে-র কথা উল্লেখ করেছেন:

প্রথম মত এই যে, ভূমি এবং মূলধন, যাহার দ্বারা অন্য ধনের উৎপত্তি হইবে, তাহা সামাজিক সর্ব্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি হউক। যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা সর্ব্বলোকে সমভাবে বণ্টন করিয়া লউক। ইহাতে বড়লোক ছোটলোক কোন প্রভেদ রহিল না। সকলেই সমানভাবে পরিশ্রম করিবে। ......ইহাই কম্যুনিজম্। ......কিন্তু সাধারণ কম্যুনিস্ট, বহুশ্রমী এবং অল্পশ্রমী, কর্ম্মিষ্ঠ এবং অকর্ম্মিষ্ঠ, সকলেই যেরূপ ধনের সমানভাগী করিতে চাহেন লুই ব্ল্যাং সে মতাবলম্বী নহেন। তিনি মনে করেন শ্রমানুসারে ধনের ভাগ হওয়া উচিত।

(তদেব)

বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'সাম্য' প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সমাপ্তি পর্বে সাম্যতত্ত্বের সারকথা পর্যালোচনা প্রসংগে বলেছেন যে, এই বৈষম্যের সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ:

তাই বলিয়া কেহ না মনে করেন যে, আমি জন্মগুণে বড়লোক হইয়াছি; অন্যে জন্মগুণে ছোটলোক হইয়াছে। তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে

তোমার কোন গুণ নহে, অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষ নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না, মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা। ....যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।

(তদেব)

এই প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আইনের চোখে সকলে সমান, একথা ধনতন্ত্রবাদীরা সগৌরবে ঘোষণা করে থাকেন। কিন্তু আইন যে শেষ পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে ধনী ব্যক্তিরই পোষণের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং পরিণত হয় নিদারুণ প্রহসনে সাম্যবাদীদের এ ধারণার সংগে পরিচিত বঙ্কিম সে কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। ব্রিটিশ আইনের ধারক ও বাহক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র আইনের ব্যর্থতার দিকটি সম্পর্কে ছিলেন বিশেষভাবে অবহিত। আইন তথা বিচার-ব্যবস্থার ব্যর্থতার কথা তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসংগে 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' নিবন্ধে এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে সাক্ষীদ্বয়ের দুইবার সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্যদানের প্রসংগ স্মরণ করা যেতে পারে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আইন ও বিচার ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সাম্যবাদীরা সরব। সাম্যবাদীদের এই দৃষ্টিভংগী বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' নিবন্ধে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে:

অগত্যা প্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন করিল—ফৌজদারিতে গিয়া নালিশ করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীদিগকে সাজা দিলেন। আসামীরা আপিল করিল, জজ সাহেব বলিলেন, 'প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে বটে, কিন্তু আইন অনুসারে আমি আসামীদিগকে খালাস দিলাম।' সুবিচার হইল। কে না জানে, বিচারের উদ্দেশ্য আসামী খালাস?

(বঙ্গদেশের কৃষক, ২য় পরিচ্ছেদ, জমিদার)

তাই এ সম্পর্কে লেখকের জিজ্ঞাসা এবং উত্তর:

আইন আছে—সে আইনে অপরাধী জমিদার দণ্ডনীয় হন না কেন?

আদালতে দোষী জমিদার চিরজয়ী কেন?...যে আইনে কেবল দুর্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না—সে আইন কিসে? যে আদালতের বল কেবল দুর্বলের উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত কিসে?

(তদেব, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, আইন)

মোকদ্দমা অতিশয় ব্যযসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।......যাহা ব্যয়সাধ্য, তাহা দরিদ্র কৃষকদিগের আযত্ত নহে। সুতরাং তাহারা সচরাচর উপকৃত হয না, বরং তদ্বিপরীতই ঘটিযা থাকে। জমিদার ধনী, আদালতের খেলা খেলিতে পারেন। দোষে হউক, বিনা দোষেই হউক, তিনি ইচ্ছা করিলেই কৃষককে আদালতে উপস্থিত করিতে পারেন। তথায় ধনবানেরই জয়, সুতরাং কৃষকের দুর্দ্দশা ঘটে, অতএব আইন আদালত, কৃষককে পীড়িত করিবার, ধনবানের হস্তে আর একটি উপায়মাত্র।

(তদেব)

বাংলা সাহিত্যে সমাজবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনার প্রথম সূত্রপাত করেন আমাদের দেশে। সাম্যবাদ সম্বন্ধে ভূদেবের আলোচনা, বিবেকানন্দের সাম্যবাদী চিন্তাপ্রসূত কতিপয় মন্তব্য এবং রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদ সম্পর্কিত প্রবন্ধ 'ক্যাথলিক সোসালিজম্'[৯] ছাড়া আমাদের দেশে প্রবন্ধ সাহিত্যে উনিশ শতকের পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই অতি আধুনিক ধারাটি ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। এমন কি, বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকেও সাম্যবাদী চিন্তাধারা-সম্পর্কিত কোন বাংলা প্রবন্ধ দেখা যায়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে সাম্যবাদ সম্পর্কে বাংলায় কোন প্রবন্ধ রচিত না হলেও শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাজগতে সাম্যবাদী দর্শন বঙ্কিমের রচনার পূর্বেই স্থান পেয়েছিল। এ সম্পর্কে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার পরিবেশিত তথ্য অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Political Economy' বিষয়ের অনার্স পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সাম্যবাদ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন ছিল[১০]:

কয়েকজন সাম্যবাদী দার্শনিকের চিন্তাধারা অনুসরণ করে তিনি এই

৯. সাধনা, মাঘ ১২৯৮, পৃ ২৪৯-৫০।

১০. Mazumdar, Bimanbehari, History of Political Thought from Rammohun to Dayananda, first edition, P. 450.

মতবাদের মূল বক্তব্য সাধারণভাবে বিবৃত করতে সচেষ্ট হয়েছেন; তবে 'কমিউনিস্ট ফার্স্ট ইণ্টারন্যাশনল' সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক সাম্যবাদের সংগে যথার্থ পরিচিত হননি। মার্ক্‌স্‌-এর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল না বলে তিনি জমিদার শ্রেণীর সংগে কৃষক শ্রেণীর স্বার্থের পার্থক্য প্রদর্শন করলেও কোন কোন জমিদারের মধ্যে তিনি উদারতা দেখবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য যে দেশে, যে যুগে এবং যে পরিবেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগপরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্যবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা নিঃসন্দেহে আমাদের মতো অনগ্রসর দেশে ছিল যুগান্তকারী।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'বঙ্গদেশের কৃষক' নিবন্ধটির এক জায়গায় আমরা ম্যালথাস-এর প্রভাব লক্ষ্য করেছি। এছাড়া 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'বংশরক্ষা'[১১] নিবন্ধটি এ প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বিবিধ প্রবন্ধে' 'রামধন পোদ' শিরোনামায় এ নিবন্ধটি স্থান লাভ করে পরবর্তীকালে। এই নিবন্ধের প্রসংগ নিঃসন্দেহে ম্যালথাস। লেখক এখানে কাল্পনিক রামধন পোদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে ম্যালথাস-এর জনসংখ্যা বিষয়ক তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লেখক উল্লিখিত নিবন্ধে বলেছেন যে, তাঁর কথা শুনে অনেকে হয়তো বলবেন:

'এ রকম কঠিন হৃদয় মালথসি বুলি রাখিয়া দাও।'

লেখক কিন্তু ম্যালথাস-এর বুলি উপেক্ষা করতে সক্ষম হননি, বরং ম্যলথাসকেই আদর্শ জ্ঞান করে কল্পিত রামধন পোদের সংগে তর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন:

আমি রামধনকে বলিলাম, 'চারিটি ছেলে—তিনটি মেয়ে। আবার তার উপর দুইটি পুত্রবধূ বাড়িয়াছ?' রামধন পোদ হাত জোড় করিয়া বলিল, 'আজ্ঞা হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে দুইটি পুত্রবধূ হইয়াছে।'
আমি বলিলাম 'তাহাদের সন্তান সন্ততিও হইয়াছে?' রামধন বলিল, 'আজ্ঞা, একটির দুইটি মেয়ে, একটির একটি ছেলে।'
আমি বলিলাম, 'রামধন! শত্রুর মুখে ছাই দিয়া অনেকগুলি পরিবার বলিয়া তোমার তখনই কষ্ট ছিল, এখন আরও কষ্ট হইয়াছে বোধহয়।'
রামধন বলিল, 'এখন বড় কষ্ট হইয়াছে।'[১২]

১১. বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮৮।
১২. টমাস রবার্ট ম্যালথাস (Thomas Robert Malthus)—১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে 'Essay on Population'—প্রবন্ধে জনসংখ্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন।

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রামধন! কেন এত পরিবার বাড়াইলে?

রামধন কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, 'সে কি মহাশয়! আমি কি পরিবার বাড়াইলাম! বিধাতা বাড়াইয়াছে।'

আমি বলিলাম, 'গরিব বিধাতাকে অনর্থক দোষ দিও না। ছেলের বিয়ে তুমি দিয়াছ বলিয়াই তিনটি নাতি-নাতনী বাড়াইয়াছ।'

রামধন কাতর হইয়া বলিল, মহাশয়, আমাকে অমন করিয়া খুঁড়িবেন না।'

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'তারপর ছোট ছেলেটির বিয়ে দিবে?'

রামধন বলিল, 'টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই দিই।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই যেগুলি জুটিয়েছ, তাই খেতে দিতে পার না—আবার বাড়াবে কেন? বিয়ে দিলেই তো আপাততঃ বৌমা আসবেন—তাঁর আহার চাই। তারপর তাঁর পেটে দুটি চারটি হবে—তাদেরও আহার চাই। এখনই কুলায় না—আবার বিয়ে?

উদ্ধৃত অংশ অনুসরণ করলে আমরা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করতে পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্র এ নিবন্ধটিতে ম্যালথাস-এর জনসংখ্যা সম্পর্কিত তত্ত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সভ্যতার স্বার্থে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে বক্তব্য উপস্থিত করে ম্যালথাস জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য যে সমস্ত নিরোধ-মূলক ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন তারই নির্গলিতার্থ অত্যন্ত সহজভাবে, তত্ত্বের কচকচির বাইরে থেকে, বঙ্কিম প্রকাশ করেছেন 'রামধন পোদ' নিবন্ধে। প্লেটো (Plato)-র প্রশ্নোত্তর জাতীয় রচনার ধারা তিনি এখানে অনুসরণ করেছেন। ম্যালথাস-এর জটিল অর্থনীতিক তত্ত্বের এই সহজতম উপস্থাপনা প্রশংসনীয়।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের আলোচনায় আরো কয়েকজন পাশ্চাত্য দার্শনিক বিশেষ স্থান পেয়েছিলেন। উনিশ শতকের বাঙালীকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল প্রথমে বেন্থাম এবং পরে তাঁর শিষ্য জনস্টুয়ার্ট মিল এবং তাঁদের প্রচারিত উপযোগবাদ (Utilitarianism)। সমগ্র উনিশ শতকের বাংলা চিন্তামূলক প্রবন্ধের রাজ্যে এই সমস্ত মতবাদ কখনো স্পষ্টাক্ষরে, কখনো আবার অস্পষ্টভাবে আপন আধিপত্য ঘোষণা করেছে বহুক্ষেত্রে। বেন্থাম-এর দর্শনের প্রতি রামমোহন আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র বেন্থাম তথা মিল-এর বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর বহু প্রবন্ধ এ সত্য বহন করে। উনিশ [illegible]

চিন্তাশীল বাঙালী প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুই দার্শনিকের দ্বারা কোন না কোনভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। শুধু উনিশ শতক কেন, বিংশ শতকে রচিত কবিগুরুর উপন্যাস 'চতুরঙ্গ'-র জ্যাঠামশাই চরিত্র আচার-আচরণে খাঁটি বেন্থাম-পন্থী। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন'।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী অন্বেষণ করলে মিল-বেন্থাম-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যায়ে জেরিমি বেন্থাম তাঁর হিতবাদী দর্শন প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর 'Principles of Morals and Legislation' প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'Introduction to the Principles of Morals and Legislation' প্রকাশিত হয় ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। অল্পকালের মধ্যে ইংলণ্ডে এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে তাঁর দর্শন বিশেষ সমাদর লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর ধনতান্ত্রিক উদারনৈতিকতার তরংগ বাঙালীচিত্ত পরিপ্লাবিত করে। উনিশ শতকের প্রথম অংশে বেন্থাম এবং দ্বিতীয় অংশে মিল-বেন্থাম-এর উদারনৈতিক হিতবাদের খোলা হাওয়া পালে লাগিয়ে ধনতান্ত্রিক উদারনৈতিকতার ঘাট লক্ষ্য করে চিন্তাশীল বাঙালী পাড়ি জমিয়েছিলেন। এদিক থেকে বঙ্কিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেন্থাম-এর দর্শন প্রকাশিত হবার প্রায় এক শতাব্দী পরে জন স্টুয়ার্ট মিল-এর 'Utilitarianism' প্রকাশিত হয়। মিল-এর রচনায় বেন্থাম-এর হিতবাদী দর্শন লাভ করেছিল আরো ব্যাপ্তি ও পরিচ্ছন্নতা। মিল-এর সংগে বঙ্কিম তথা 'বঙ্গদর্শন'-এর আত্মীয়তা অনস্বীকার্য। এই প্রসংগে মিলের মৃত্যুর পর বঙ্গদর্শন-এর পাতায় মিলের স্মৃতিচারণা লক্ষিতব্য:

> ২৭ শে বৈশাখ তারিখের টেলিগ্রাম ২৮ তারিখে প্রকাশ হয় যে মিল সঙ্কটাপন্নরূপে পীড়িত। পরদিন প্রাতে মিলের কুশল জানিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহচিত্তে সম্বাদপত্র খুলিলাম, দেখিলাম যে, চিকিৎসকেরা মিলের জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই দিবস অপরাহ্নে সম্বাদ আইসে যে মিল নাই।
>
> ছয় হাজার মাইল দূরে থাকিয়া আমরা এই শোক পাইয়াছি, না জানি ইংলণ্ডবাসীরা কতই দুঃখ করিতেছেন।......'মিল নাই' এই কথা মনে করিলে চিত্ত স্বভাবতঃই ব্যথিত হয়।
>
> (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮০)

এই প্রবন্ধে জন স্টুয়ার্ট মিল-এর প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থের তালিকা এবং প্রকাশ-

কাল উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মিলের গ্রন্থরাজির সংগে বাঙালীর পরিচিতি এবং মিলের ভাবধারার প্রতি বাঙালীর আকর্ষণ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মিল-বেন্থাম তথা উনিশ শতকের হিতবাদী দর্শনের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত হয়েছিলেন। উনিশশতকের হিতবাদীরা ব্যাষ্টির সুখ অপেক্ষা সমষ্টির সুখ অধিক প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন এবং ব্যক্তিগত সুখ ও সমসাময়িক মংগলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। সুখের তারতম্য প্রদর্শনের প্রচেষ্টায় হিতবাদীরা সুখের শ্রেণীবিভাগ করেছেন : **Pleasures of Sense, Pleasures of Riches, Pleasures of Address, Pleasures of Friendship, Pleasures of Good Reputation, Pleasures of Power, Pleasures of Pity, Pleasures of Benevolence, Pleasures Founded upon Pains** ১৩

কিন্তু এই বিভিন্ন সুখশ্রেণীর মধ্যে যে সুখ চরম সামাজিক মংগল আহ্বান করে সেই সুখই পরম বরণীয় জ্ঞান করেছেন হিতবাদীরা। সুতরাং রাজ্য শাসন প্রণালীতে ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই পরম সামাজিক মংগলের দিকটা লক্ষ্য রাখতে পরামর্শ দিয়েছে হিতবাদী দর্শন :

> The public good ought to be the objeet of the legislator. General utility ought to be the foundation of the reasoning, To know the true good of the Community is what constitutes the science of legislation ; the art consists in, finding the means to realise that good.১৪

'ইউটিলিটির'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বেন্থাম বলেছিলেন :

> Utility is an abstract term. It expresses the property or tendency of a thing to prevent some evil or to procure some good. Evil is pain, or the cause of pain. Good is pleasure or the cause of pleasure. That which is conformable to utility or the interest of the individual, is what tends to augment the total sum of happiness ১৫

১৩, Bentham Jeremy : The Theory of Legislation, Chapter I, p. 1-2. [Edited with an introduction and notes by C, K. Ogden.]

১৪. Ibid. ১৫, Ibid.

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত রচনাতেই ব্যক্তির সুখ অপেক্ষা সামাজিক সুখ তথা মংগলের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হিতবাদীদের সংগে তিনি বহুদূর পর্যন্ত হাত মিলিয়ে চলেছিলেন। এই প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের অন্তর্গত 'আত্মপ্রীতি' (২২শ অধ্যায়) এবং শারীরিকী বৃত্তি (৮ম অধ্যায়) প্রবন্ধদ্বয় লক্ষিতব্য। ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে গুরুর মুখে হিতবাদী দর্শনের সারবত্তা প্রমাণে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রসর হয়েছেন :

হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। হিতবাদীদিগের ভ্রম এই যে তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, সমস্ত ধর্মতত্ত্বটা এই হিতবাদ মতের ভিতরই আছে। তাহা না হইয়া ইহা ধর্মতত্ত্বের সামান্য অংশ মাত্র।

(ধর্মতত্ত্ব, ১২শ অধ্যায়, আত্মপ্রীতি)

স্থূল কথা, অনুশীলন ধর্মে 'Greatest good of the greatest number' গণিততত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি ভূতমাত্রের হিত সাধন ধর্ম হয়, তবে একজনের হিত সাধন ধর্ম, আবার এক জনের হিতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্ম। যদি একদিকে একজনের হিতসাধন ও আর একদিকে দশ জনের তুল্য হিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম হয় তবে একজনের তুল্য হিতসাধন করা অধর্ম। এখানে good of the greatest number.'

(তদেব)

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য সর্বক্ষেত্রে হিতবাদী দার্শনিকদের সংগে সুর মেলাতে পারেননি। এই প্রসংগে একজন আধুনিক সমালোচক বলেছেন :

এই তর্কে একটা মৌলিক ত্রুটি রহিয়া গেল। সুখ ব্যক্তিগত মনের অবস্থা। যাহাতে পরের মঙ্গল হয় তাহা যে আমার ভালো লাগিবেই এই কথা মনে করিবার কি কারণ আছে? যাহা একান্তভাবে নিজের অন্তরের জিনিষ তাহাকে বাহিরের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে চলিবে কেন?……

বঙ্কিমচন্দ্র হিতবাদের সঙ্কীর্ণতা উপলব্ধি করিয়া অন্যভাবে এই সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে মানুষের সুখ মনুষ্যত্বের বিকাশে। ………সামঞ্জস্যই সুখ।. মনুষ্যত্বের স্ফূর্তি ছাড়া যে

সুখ তাহা ভ্রান্তিমান। সুতরাং তিনি সুখের মাপকাঠি মনের মধ্যেই খুঁজিয়াছেন।[১৬]

মনুষ্যত্বের যথার্থ স্ফূর্তির প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিম উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি মনুষ্য হৃদয় থেকে 'আত্মাদর' দূরীকরণের কথা চিন্তা করেছিলেন। মানুষে মানুষে প্রীতির মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পথ তিনি অন্বেষণ করেছেন। এই প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার দু'একটি পঙ্‌ক্তি স্মরণ করছি :

> প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার সঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য হৃদযতন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্যসুখ চাহি না।

(বঙ্কিমচন্দ্র, কমলাকান্তের দপ্তর, ১ম সংখ্যা এবং ধর্মতত্ত্ব, প্রীতি, ২১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

অথবা,

> গর্ত্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী ; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটা বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকলই বেকল হইয়া যাইবে।
>
> আমি কেবল গর্ত্ত বুঁজাইযা আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এইজন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই ; ....

(কমলাকান্তের দপ্তর, ৫ম সংখ্যা, আমার মন)

সুতরাং 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম হিতসাধন' ব্রতে বঙ্কিমচন্দ্র মিল-বেন্থাম-এর সংগে কণ্ঠ মিলালেও লক্ষ্যে পৌছবার পন্থা হিসাবে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করেছেন এবং সেইজন্যই যে বাহ্য সম্পদ বৃদ্ধির পূজায় 'তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত, এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিলতন্ত্র হইতে পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়' সে পূজায় তিনি শেষ অবধি উৎসাহিত হতে পারেননি।

নীতিগতভাবে বঙ্কিম হিতবাদী দর্শন মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে তিনি বাহ্য সম্পদ বৃদ্ধির সাধনায় প্রকৃত সুখের সন্ধান পাননি। লেখক মনে করেছেন যে হিতবাদ দর্শন অনুসারে উদরপূর্তি বা

১৬. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের 'পাশ্চাত্ত্য হিতবাদী দর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক অংশটি দ্রষ্টব্য।

পুরুষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য। তিনি হিতবাদী দর্শনের মধ্যে উদর দর্শনের উপস্থিতি লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়েছিলেন। তাঁই মিল-বেন্থামের বক্তব্যের মধ্যে পার্থিব বিষয়ের প্রতি অতি গুরুত্ব দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

> বেন্থাম্ হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।
>
> আমি এই হিতবাদ মতে অমত করিনা, বরং আমি ইহার অনুমোদক ·········আমি এই হিতবাদ দর্শন অবলম্বন করিযা, কিছু ভাঙ্গিয়া, কিছু গড়িয়া, একটা নূতন দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি।
>
> (কমলাকান্তের দপ্তর, ৩য় সংখ্যা, উদর দর্শন বা ইউটিলিটি)

'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের 'প্রীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে (একবিংশতিতম অধ্যায়) প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন প্রসংগে লেখক হিতবাদী ও ধ্রুববাদী দর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে ?' শীর্ষক প্রবন্ধে জন স্টুয়ার্ট মিল-এর 'অন নেচার' এবং ডারউইন-এর 'থিয়োরি অব্ ইভোলিউশন' ও 'অরিজিন অব্ স্পিসিজ' গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু প্রবন্ধের প্রসংগে ধ্রুববাদ (Positivism) স্থান পেয়েছে। একথা স্মরণ করা প্রয়োজন যে কোঁৎ-এর ধ্রুববাদী দর্শন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে। বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিল-এর সংগে সংগে কোঁৎও শিক্ষিত বাঙালী মানসে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। কোঁৎ-এর ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মানবতার আদর্শ বাংলা প্রবন্ধে নানাভাবে নানা প্রসংগে উত্থাপিত হয়েছে। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র সর্বপ্রথম আমাদের দেশে ধ্রুববাদী চিন্তার প্রসারে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি কোঁৎ-এর মূল রচনা ফরাসী ভাষায় পাঠ করবার স্পৃহায় ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং কোঁৎ-এর 'অ্যানালিটিকাল জিওমেট্রি' গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। তিনি রিচার্ড কনগ্রিভ[১৭] এবং অন্যান্য ধ্রুববাদী দার্শনিকদের সংগে নিয়মিত সংযোগ

১৭. Richard Congreve (1818-99) একজন ইংরেজ পজিটিভিস্ট ; তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'The Catechism of Positive Religion (1858)। এই গ্রন্থটি বাঙলার ধ্রুববাদীদের বিশেষ পরিচিত ছিল।

এই প্রসংগে 'Calcutta Review' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনার দিকেও আমরা লক্ষ্য করতে পারি :

'India, or Certain Moral and Social questions connected with our Indian Empire ; An Address by Richard Congreve'—R. D. Osborne.

(Calcutta Review, 1872, Vol LVXXIV)

রক্ষা করতেন পত্র মারফৎ। এই প্রসংগে একজন গ্রন্থকারের বক্তব্য স্মরণ করছি :

> The impact of comtist ideologies of secularism, atheism, social service and religion of humanity on Bengali thought and imagination was powerful in the nineteenth century. Justice Dwarakanath Mitra (1833-1874), one of the greatest legal luminaries that India has ever been, was one of the earliest torchbearers of Comte's ideology in Bengali. Prompted by the ardent desire to read Comte's works in the French original............he acquired in course of a year sufficient French to read Comte in the original. He not only translated into English the "Analytical Geometry" of Comte, but also kept up independent correspondence with Richard Congreve and other positivists.[১৮]

শুধু দ্বারকানাথ মিত্র নয়, উনিশ শতকের বাঙালী চিন্তানায়কদের মধ্যে ধ্রুববাদী হিসাবে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রমেশচন্দ্র মিত্র এবং যোগেশচন্দ্র ঘোষের নাম স্মরণীয়। এঁদেরই সহযোগিতায় স্থাপিত হয়েছিল 'পজিটিভিস্ট ক্লাব'।

যাই হোক, ধ্রুববাদের এই তরংগ সাহিত্য সম্রাটকেও স্পর্শ করেছিল। তিনি ধ্রুববাদের বিজ্ঞানসম্মত মানবসেবা ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ব্যক্তি মানুষ অপেক্ষা মনুষ্যজাতি এবং ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টির গৌরবের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাঁর অনেক লেখাতে। এই প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চিত্তশুদ্ধি'[১৯] শীর্ষক প্রবন্ধের এবং 'ধর্মতত্ত্ব', 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের কথা স্মরণীয়। চিত্তশুদ্ধির প্রতি হিন্দুধর্ম সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে বলে বঙ্কিম মনে করেছেন এবং কোঁৎ-এর ধ্রুববাদের সারকথা যে চিত্তশুদ্ধি বঙ্কিম সেটা লক্ষ্য করেছেন :

> চিত্তশুদ্ধি থাকিলে সব মতই শুদ্ধ। চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই তাহার কোন ধর্ম নাই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্মেরই

১৮. Mukherji Haridas and Mukherji Uma; The Origins of the National Council of Education, First edition, pp, 181-183.

১৯. সাবয়িক পত্রিকায় 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় (প্রচার, ফাল্গুন, ১২৯২)।

সার এমত নহে, ইহা সকল ধর্ম্মের সার। ইহা হিন্দুধর্ম্মের সার, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সার, বৌদ্ধধর্ম্মের সার, 'নিরীশ্বর কোমৎ' ধর্ম্মের সার।

(চিত্তশুদ্ধি, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড)

বঙ্কিমচন্দ্র 'ভক্তি চিত্তশুদ্ধির মূল এবং ধর্ম্মের মূল' বলে গ্রহণ করেছেন। এই চিত্তশুদ্ধি তথা ধর্ম্মবোধের প্রতিষ্ঠাকে মানব জাতির উন্নতির পথ বলে তিনি মনে করেছেন। এদিক থেকে Comte-এর একটি উক্তি বঙ্কিমের ধারণার সদৃশ। বঙ্কিম দেবী চৌধুরাণীতে কোঁৎ (Comte)-এর এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছিলেন :

"The general law of Man's progress whatever the point of view chosen consists in this that Man becomes more and more religious."

'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,·· কার্যকারিণী ও শারীরিক বৃত্তিসমূহ ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে।'

(চতুর্দশ অধ্যায়. 'ভক্তি')

চিত্তশুদ্ধির স্থূল লক্ষণ প্রদর্শন করতে গিযে তিনি বলেছেন : 'চিত্তশুদ্ধির স্থূল লক্ষণ ঈশ্বরে ভক্তি মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদযে শান্তি।' যেখানে মনুষ্যপ্রীতির কথা বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন সেখানে একাধারে তিনি হিতবাদ ও ধ্রুববাদের পরোক্ষ সমর্থন করেছেন। জ্ঞান ও কর্মের যে মণিকাঞ্চন যোগের কথা বঙ্কিম উপলব্ধি করেছিলেন 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে, তারই প্রযোগ করবার প্রচেষ্টা করেছিলেন 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে। এদিক থেকে বঙ্কিম তাঁর জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধীয় ধারণাকে কোঁৎ-এর 'thought, feeling এবং action'-এর সংগে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করেছেন। লেখক তাঁর 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের এক জাযগায স্পষ্ট করে বলেছেন :

কোম্‌ত প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিনভাগে চিত্ত পরিণতিকে বিভক্ত করে—Thought, Feeling, Action, ইহা ন্যায্য। কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিম্বা Action প্রাপ্ত হয। এইজন্য পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই দ্বিবিধ বলাও ন্যায্য।

('ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের ক্রোড়পত্র—ঘ দ্রষ্টব্য)

'ধর্মতত্ত্ব, গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ কবি ও সমালোচক ম্যাথ্যু আর্নল্ড এর বক্তব্য আলোচনাক্রমে উপস্থিত করেছেন। বঙ্কিম এখানে মূলতঃ ম্যাথ্যু আর্নল্ড-এর

'লাস্ট এসেজ অন চার্চ এ্যাণ্ড রিলিজিয়ান' এবং 'কালচার্ এ্যাণ্ড এ্যানার্কি' প্রভৃতি গ্রন্থে আর্নল্ড-এর বক্তব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন।

'ধর্ম্মতত্ব' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ('দুঃখ কি ?' নিবন্ধে) গুরু বলেছেন :

> Culture-বিলাতী জিনিষ নহে। ....ইহা হিন্দুধর্ম্মের সার। এমন যে তোমার Matthew Arnold-প্রভৃতি বিলাতী অনুশীলনবাদীদিগের বুঝাইবার সাধ্য আছে কি না সন্দেহ।

লেখক অবশ্য ম্যাথু আর্নল্ড এর বিরোধিতায় বহু জায়গা সচেষ্ট হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আর্নল্ড-এর বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। গুরুর জবানীতে বঙ্কিম বলেছেন :

> যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্বাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হয় সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি। ... .মানব বৃত্তির উৎকর্ষণই ধর্ম্ম।
>
> (ধর্ম্মতত্ব, ৪র্থ অধ্যায়, মনুষ্যত্ব কি ?)

ম্যাথু আর্নল্ড-এর বক্তব্য, এই প্রসংগে স্মরণ করতে পারি :

> Religion says : The kingdom of God is within you ; and culture, in like manner, places human perfection in an internal condition, in the growth and predominance of our humanity proper, as distinguished from our animality . ... To reach this ideal, culture is an indispensable aid, and that is the true value of culture. Not a havlng and a resting, but a growing and a becoming, is the character of perfection as culture conceives it ; and here, too, it coincides with religion, ২০

মানুষের সর্বাঙ্গীন পরিণতি বলতে লেখক মানুষের দু'টি অংগ শরীর ও মনের অনুশীলনের মাধ্যমে বিহিত পরিণতির কথা বলেছেন। এই প্রসংগে ধর্মতত্বের অন্তর্গত 'শারীরিকী বৃত্তি' (অষ্টম অধ্যায়) এবং 'চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি' (সপ্তবিংশতি-তম অধ্যায় স্মরণীয়। ম্যাথু আর্নল্ড কিন্তু 'sweetness' এবং 'light' এই

২০. Matthew Arnold, Culture and Anarchy, Sweetness and Light' (Macmillan Edition, p 11.)

মানসিক বৃত্তি স্ফুরণের প্রয়োজনীয়তার সংগে সংগে শারীরিকী বৃত্তি স্ফুরণের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন :

> Culture does not set itself against the games and sports ; it congratulates the future, and hopes it will make a good use of its improved physical basis…[২১]

এই প্রসংগে বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের 'শারীরিকী বৃত্তি' প্রবন্ধটি স্মরণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের ধর্মকে বলেছেন মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যবৃত্তির উৎকর্ষণই ধর্মের চরিতার্থতা বলে জ্ঞান করেছেন। এদিক থেকে সীলির 'the substance of religion is culture'[২২] কথাটির সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বঙ্কিম অনেক সময় জনস্টুয়ার্ট মিল এবং কোঁৎ-এর বক্তব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। অনেক সময় তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে এই দুই পাশ্চাত্য দার্শনিকের রচনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন :

তাঁহার (জন স্টুয়ার্ট মিলের) ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্মসকল সম্বন্ধে বেশ খাটে।

তিনি বলেন,

> The essence of Religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object · and is rightfully paramount over all selfish objects of desire.
>
> (ধর্ম্মতত্ত্ব, ক্রোড়পত্র—খ)

বঙ্কিম আবার বলেছেন :

> পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত না হইয়া কোমতের ধর্ম ব্যাখ্যা শুনাইয়া নিরস্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন·· তিনি বলেন, 'Religion, in itself expresses the state, of perfect unity which is the distinctive mark of man's existence both as an individual

---

২১. Ibid, pp 29-30

২২. সীলি (Seely)-র এই বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় (মনুষ্যত্ব কি ?) এর 'ক্রোড় পত্র 'খ'-তে উল্লেখ করেছেন। 'ক্রোড় পত্র-'খ'-তে তিনি সীলির-র 'Ecce Homo' এবং 'Natural Religion' গ্রন্থদ্বয়ের সংগে বাঙালীর সাম্প্রতিক পরিচিতির কথা উল্লেখ করেছেন।

and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose. (ধর্মতত্ত্ব', ক্রোড়পত্র—খ)

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' গ্রন্থে লেখক কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকদের প্রসংগ উত্থাপিত করেছেন এবং স্বীয় যুক্তির সপক্ষে অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতামত উদ্ধৃত করেছেন। এই গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক একটি কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে ছিলেন :

> এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাহাদিগেরই সচরাচর শিক্ষিত বলা হইয়া থাকে · এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না······ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্ত্য চিন্তা প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তা প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে, ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় শৈশব হইতে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা প্রণালীর অনুবর্ত্তী···কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাবসকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না······পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম্ম তাঁহাদিগকে বুঝান, আমার এই টিকার উদ্দেশ্য।
>
> (শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ভূমিকা, বঙ্কিমচন্দ্র)

এক্ষেত্রে লেখক গীতার পাশ্চাত্য টীকাকারদের হাস্যকর প্রমাদ যেমন প্রদর্শন করেছেন তেমনি আবার পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে গীতার মর্ম উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন। গীতার প্রথম অধ্যায়ে 'ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র' সম্পর্কে অনুবাদক যে হাস্যকর তথ্য উপস্থিত করেছেন লেখক সেদিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। ধর্মযুদ্ধের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বঙ্কিম পৃথিবীর ইতিহাস থেকে বিভিন্ন যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন এবং আমেরিকায় ওয়াশিংটন, য়ুরোপে উইলিয়ম দি সাইলেন্ট, এবং ভারতবর্ষে প্রতাপচন্দ্র যে যুদ্ধ করেছিলেন লেখক সে সমস্ত যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ বলে মনে করেছেন। জ্ঞান ও কর্মের প্রসংগ যেখানে উত্থাপিত হয়েছে লেখক সেখানে কোঁৎ-এর 'thought, feeling এবং action'-এর কথা স্মরণ করেছেন। 'মন' কথাটিতে তিনি পাশ্চাত্ত্যের 'mind'-এর সমার্থক বলে গ্রহণ করেছেন। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণার ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্য

বিজ্ঞানীর বিরুদ্ধাচরণের দিকটি উদঘাটিত করেছেন। অবশ্য পাশ্চাত্যের 'spiritualism' সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে তিনি ক্রুকস্ ওয়ালেস্ প্রভৃতির বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।২৩ পাশ্চাত্য দর্শন আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না, প্রত্যক্ষ প্রমানকেই প্রতীচ্য দর্শন মূল্য দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে লেখক কাণ্ট-এর অতীন্দ্রিয় দর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

> …কাণ্ট এবং তাহার পরবর্ত্তী কতকগুলি লব্ধ প্রতিষ্ঠ দার্শনিকদের মত এই যে, প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কারণ আছে।… কাণ্ট ইহাও বলেন যে, যাহাকে আমরা বুদ্ধি বলি অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষাদি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান লইয়া বিচার করি, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর আমাদের আর এক শক্তি আছে। যাহা বিচারে অপ্রাপ্য, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা তাহা জানিতে পারি। ঈশ্বর, আত্মা এবং জগতের একত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা সেই মহতী শক্তি হইতে পাই।
>
> (শ্রীমদ্ভগবদগীতা, দ্বিতীয়োহধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র—গীতার ১২ সংখ্যক শ্লোকের আলোচনা প্রসংগে এই বক্তব্য রেখেছেন)

আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং জন্মান্তরবাদের আলোচনা প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের সমর্থন অন্বেষণ করেছেন এবং হার্ডার এবং লেসিং-এর মতের উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১২ সংখ্যক শ্লোকটির ব্যাখ্যায় তিনি comte-র action-এর প্রসংগ উপস্থিত করেছেন এবং বৈদিক যজ্ঞাদি তিনি কর্ম হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। এছাড়া, তিনি প্রযোজন বোধে গীতার বিভিন্ন শ্লোকের ব্যাখ্যা দান করতে গিয়ে ডঃ হগ্‌-এর 'দি অরিজিন অব ব্রাহ্মনিজম্' এবং কাণ্ট-এর 'মেটাফিজিক্যাল এথিক্স্' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।২৪

যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বহু প্রবন্ধের প্রসংগে কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরোক্ষভাবে প্রতীচ্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সমন্বয় যুগের সার্থক শিল্পী বঙ্কিম প্রাচ্যের সমস্ত দর্শনই প্রতীচ্যের আলোকে নতুন করে উপলব্ধি করতে অগ্রসর হয়েছেন। নবজাগৃতির বিশিষ্ট

---

২৩. Comte, Crookes, Wallace—প্রভৃতির প্রসংগ উত্থাপিত করেছেন গীতার প্রথম অধ্যায়-এর ১১ এবং ১২ সংখ্যক শ্লোকের আলোচনায়।

২৪. গীতার চতুর্থ অধ্যায়-এর ১৩ সংখ্যক শ্লোকের আলোচনা প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্র একথা বলেছেন।

রূপ বঙ্কিমের রচনায় ধরা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রসংগে বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছিলেন :

> অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীয় চিন্তা এবং সাধনার ইতিহাসে Encyclopaedists-দের যে স্থান, আধুনিক বাংলার সাধনা ও চিন্তার ইতিহাসে বঙ্গদর্শন কতকটা সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল।২৫

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বহু রচনার মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সূত্র আবিষ্কারের যত্ন নিয়েছেন। 'জ্ঞান' শীর্ষক নিবন্ধে বঙ্কিমের এই দৃষ্টিভংগীই মূর্ত হয়ে উঠেছে :

> ...আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষবাদ, মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদে সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কাণ্টের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়।
>
> (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, জ্ঞান)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থটি পাশ্চাত্যের রাজনীতি এবং দর্শনের আলোকে উদভাসিত। এই গ্রন্থের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ; কিন্তু, আমাদের প্রাচীন ধ্যান-ধারণা অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণের দেব-মহিমা কীর্ত্তনে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রসর হননি। ধর্মের নির্মোক থেকে মুক্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে একজন স্থিতপ্রজ্ঞ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উচ্চাংগের রাজনীতিবিদ্ হিসাবে চিত্রিত করেছেন। 'প্রদীপ্ত মানবপন্থী দৃষ্টি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়ন করেছিলেন'।২৬ শুধু ধ্রুববাদ নয়, ডেভিড স্ট্রস্২৭ (strauss) এবং আর্নেষ্ট রেনাঁ-র২৮ (Renan) যিশুখ্রীষ্ট

২৫. বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, ১ম সংস্করণ,
(বিপিনচন্দ্র পাল ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধ সঙ্কলন, ১ম সংস্করণ, পৃ ১৬০)

২৬. দেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা চরিত সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, পৃ ৩৭।

২৭. Strauss, David Friedrich (1808-74): In 1835 appeared his rationalist 'Life of Jesus', in which he treated...Christ as a sort of Jewish Socrates. —Ed, Bozman, E. E.. Everyman's Encyclopaedia, fifth edition, Vol 11, pp 457-458,

২৮. Renan, Joseph Ernest (1823-92): Vie de Jesus (1863)—In which caused an immense uproar in orthodox circle. R. accepted Jesus simply as an inspired but human philosophic teacher.—Ibid, Vol 10, pp 406-407.

সম্পর্কিত গ্রন্থের দ্বারাও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। এঁরা বিশুখ্রীষ্টের মানবত্ব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছিলেন উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে। এঁদের রচনার সংগে যে শিক্ষিত বাঙালীসমাজের পরিচয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের বক্তব্য [২৯] থেকে।

চার

বিষয়বস্তু / সাহিত্য ধর্মী বিভিন্ন রচনা :

ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্যের অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়, মৌলিক এবং সাহিত্য ধর্মী বিভিন্ন রচনায়। বঙ্কিমযুগে এবং বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের নিরলস সাধনায় বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিভিন্ন ধরণের সাহিত্যধর্মী রচনার সূত্রপাত হযেছিল, ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম রম্যরচনা (পাশ্চাত্য সাহিত্যে যাকে বলা হয় Belles Lettres)-র সূত্রপাত করেন। এই বিশেষ আংগিকের গদ্যরচনা গদ্যকারের সৃজনী প্রতিভার পরিচয় বহন করে। ইংরেজি গদ্যকার সুইফ্‌ট্ সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যে এ শব্দটির আমদানি করেন ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে।[৩০] রম্যরচনা ব্যক্তিগত হতে পারে। আর নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনারও অভাব নেই। লঘু কল্পনার পক্ষ নির্ভর করে গদ্য সাহিত্যের রাজ্যে এর আনাগোনা। অনেক গুরুগম্ভীর বিষয়কেও অনেক সময় লঘুতা ও স্মিতহাস্যের আলোকে অনবদ্য ভাবে রসসিক্ত করে তোলা হয় রম্যরচনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধরণের রচনার মধ্যে 'কমলকান্তের দপ্তর'-এর অন্তর্গত কতিপয় রচনা (কে গায় ওই ?/মনুষ্যফল/পতঙ্গ/চন্দ্রালোক/স্ত্রীলোকের রূপ/ঢেঁকি) বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ ছাড়া, বিচ্ছিন্ন কযেকটি রচনার কথাও এ প্রসংগে স্মরণীয় : মেঘ/বৃষ্টি/খদ্যোত/ভিক্ষা।[৩১]

---

২৯ বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, বিদ্যাভারতী, ২য় সংস্করণ, পৃ ১০৩।

৩০. Shorter Oxford English Dictionary, Vol I, p 166.
[১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে এই শব্দটি সর্বপ্রথম ইংরেজিতে ব্যবহার করা হয় বলে এই 'Dictionary'—নির্দেশ করেছে]

৩১. 'মেঘ', 'বৃষ্টি', 'খদ্যোত' এবং 'ভিক্ষা' :
—প্রথম তিনটি রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'গদ্য বা কবিতা পুস্তক' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।
'ভিক্ষা' শীর্ষক রচনাটি সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের 'বঙ্কিম জীবনী' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড)-তে এই রচনাগুলি সংগ্রহ করে মুদ্রিত করেছেন।

সামাজিক-ব্যঙ্গ বাংলা সাহিত্যে ইংরেজি সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুইফ্‌ট্‌, এ্যাডিসন এবং বায়রন-এর ধারা অনুসরণ করে এই জাতীয় রচনার বাংলা সাহিত্যে আগমন। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে এ্যাডিসন-এর রচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্র জীবনেই পরিচয় হয়েছে ৩২ এবং বায়রন-এর ব্যঙ্গ রচনা ম্যানফ্রেড-এর সংগেও বঙ্কিমচন্দ্রের যে পরিচয় ছিল তা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ থেকে জানা যায়।৩৩ বাংলা সাহিত্যে সামাজিক ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রথমনাথ শর্মার (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) 'নববাবু বিলাস' এবং টেকচাঁদের (প্যারীচাঁদ মিত্র) 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'সমাচার দর্পন' পত্রিকায় প্রকাশিত নব্যবাবু সম্পর্কিত কয়েকটি রচনা স্মরণ করতে পারি। বিদ্যাসাগরও প্রয়োজনের তাগিদে, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন প্রসংগে, বেনামে কিছু ব্যঙ্গ রচনা লিখেছিলেন! বিদ্যাসাগরের এ ধরণের রচনার আর যে মূল্যই থাক ব্যঙ্গ রচনা হিসাবে এগুলো আদর্শস্থানীয় নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সামাজিক ব্যঙ্গ রচনায় অনেকাংশে কৃতকার্য হয়েছিলেন। বঙ্কিমের ধাতে সুইফ্‌ট্‌-এর 'উইট' সহ্য না হলেও এডিসন-এর 'হিউমার' তিনি অনেকাংশে রপ্ত করেছিলেন। এই প্রসংগে 'ব্যাঘ্রাচার্য্য ও বৃহল্লাঙ্গুল', 'বাবু', 'ইংরেজ স্তোত্র', 'কোন "স্পেশিয়ালের" পত্র' 'Bransonism'—'হনূমদ্বাবুসংবাদ', 'বাংলা সাহিত্যের আদর', 'গ্রাম্যকথা', 'New year's day' প্রভৃতি রচনা এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' শীর্ষক গ্রন্থটির নাম উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে 'নির্মল শুভ্র সংযত হাস্যরসের' সর্বপ্রথম সঞ্চার করেন। 'হিউমার' সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর এ্যাডিসন এবং ডিকেন্স-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'র সঙ্গে ডিকেন্স-এর 'দি পিক্‌উইক্‌ পেপারস্‌'-এর সাম্‌ ওয়েলার-এর জোবানবন্দীর সাদৃশ্য লক্ষিতব্য।

৩২. ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'Minutes of the Syndicate' অনুসরণ করলে দেখা যায় Addsion-এর 'Essays' বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় স্থান পেয়েছিল। এই বছরই বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন।

৩৩. বায়রন (Byron)-এর 'Manfred' গ্রন্থটির কথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'গীতিকাব্য' (বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড) প্রবন্ধে এবং নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্য গ্রন্থের সমালোচনায় (বঙ্গদর্শন, ২য় খণ্ড, বৈশাখ, ১২৮০) উল্লেখ করেছেন।

কমলাকান্ত যেভাবে উকিলকে পর্যুদস্ত করেছেন এবং বিচারালয়ের কৃত্রিম ভাব-গাম্ভীর্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন, Sam Weller-ও ঠিক সেই ধরণের তাচ্ছিল্যের মনোভাব নিয়ে বিচারশালায় উপস্থিত হয়েছেন। এই প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্র এবং চার্লস ডিকেন্স-এর রচনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটরায় পুরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

'...Samuel Weller stepped briskly into the box...placing his hat on the floor, and his arms on the rail, took a bird's eye view of the Bar, and a comprehensive survey of the Bench, with a remarkably cheerful and lively aspect.'[৩৪]

উকীল, তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, তোমার নাম কি?

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি?

কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি? ..'

'What's your name sir ?' inquired the judge.

'Sam Weller, my Lord,' replied that gentleman.

'Do you spell it with a "v" or a "w" ?
inquired the judge.

'That depends upon the taste and fancy of the speller, my Lord', replied Sam ; 'I never had occasion to spell it more than once or twice in my life, but I spells it with a "v"[৩৫]

উকীল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বলিলেন, "আমি এ সাক্ষী চাহি না। আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।"

উকীল হতাশ হইয়া বলিলেন, "Hopeless"! উকীল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন—আর জেরা করিবেন না।

You are quite right, said Sergeant Buzfuz aloud, with affected composure, Its' perfectly useless, my Lord,

৩৪. Dickens, Charles, *The Pickwick Papers* (The Memorable trial of Bardell against Pickwick) ch. 34.

৩৫. Ibid.

attempting to get at any evidence through the impenetrable stupidity of this witness, I will not trouble the court by asking him any more question. Stand down Sir.[৩৬]

অবশ্য এই প্রসংগে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি। 'কমলকান্তের জোবানবন্দী' রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র Sam Weller-এর জোবানবন্দীর দ্বারা প্রভাবিত হলেও মৌলিকত্ব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেননি। বরং 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' অনেকটা বিস্তৃতএবং সূক্ষ্ম হাস্যরস ও ব্যঙ্গে পরিপূর্ণ। এই প্রসংগে আর একটি কথা স্মর্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থটি ডিকোয়েন্সীর 'কনফেশন্‌স্ অব এ্যান ইংলিশ ওপিয়াম ইটার' গ্রন্থটির অনুকরণ বলে অনেকে মনে করেছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থটির পরিকল্পনায় ডিক্যোয়েন্সীর প্রভাব থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনা নিঃসন্দেহে মৌলিকত্বে ভাস্বর করে তুলেছেন। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্র তথা সমন্বয় যুগের অন্যান্য প্রাবন্ধিকদের কৃতিত্ব। ইংরেজি সাহিত্যের দ্বারা তাঁরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, কিন্তু, এই প্রভাব তাঁদের স্বাতন্ত্র্য এবং মৌলিকত্ব নষ্ট করতে পারেনি।

শুধু ডিকোয়েন্সী কেন, 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের ওপর এ্যাডিসন এবং স্কট-এর প্রভাবও লক্ষিতব্য। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, কমলকান্তের দপ্তরের টীকাকার ভীষ্মদেব খোসনবিশ স্কট-এর 'টেল্‌স্ অব্ মাই লর্ড' উপন্যাসের Jedediachleishbothum-এর সমগোত্রীয় এবং স্বয়ং কমলকান্ত চক্রবর্তী এ্যাডিসন এর Roger de Coverley-কে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩৭]

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রথম সার্থক সমালোচক। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে নন্দনতত্ত্ব ছিল সবিশেষ উন্নত। সংস্কৃত আলংকারিকেরা সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেছেন। কিন্তু, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সৃষ্টি বিশেষের সমালোচনায় প্রাচীন সংস্কৃত আলংকারিকেরা অগ্রসর হননি। তাঁরা গ্রন্থবিশেষের যে টীকা-ভাষ্য রচনা করেছেন সেগুলো আধুনিক মানদণ্ডে ঠিক সমালোচনা বলা চলে না। ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারার সার্থক প্রবর্তন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাক্ বঙ্কিম পর্বে বাঙালী লেখকেরা অবশ্য ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সমালোচনা শুরু

৩৬. Ibid.

৩৭. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বাঙলা সাহিত্যের একদিক, পৃ ৯১।

করেছিলেন। সেগুলোর অধিকাংশই ইংরেজি ভাষায় লিখিত হয়ে বিভিন্ন ইংরেজি পত্রিকায় স্থান পেয়েছিল।৩৮ বাংলা সমালোচনার মানদণ্ড সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ সমস্ত সমালোচনাও আদর্শ হিসাবে কাজ করেছে।

তাছাড়া, গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু এবং কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীর কাছে মধুসূদন ইংরেজিতে যে সমস্ত পত্র লিখেছিলেন সে সমস্ত পত্রে সাহিত্য-সম্পর্কিত বক্তব্য উচ্চাংগের সমালোচনা হিসাবে গ্রহণযোগ্য। মধুসূদন যদি এই পত্রনিচয় বাংলা ভাষায় রচনা করতেন তবে সেগুলো বাংলা সাহিত্যের সমালোচনার ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকত।

সাহিত্য সমালোচনার আদর্শের ক্ষেত্রে মধুসূদন সংস্কৃত আলংকারিকদের অনুসরণে সচেষ্ট হননি, বরং বিরূপ মনোভাবই পোষণ করেছেন। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন :

If I have to write other dramas you may rest assured I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Visvanath of the Sahitya Darpan.[৩৯]

কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী-কে তিনি বলেছিলেন :

The Namby Pamby Wallahs—the imitators of Bharat Chandra...may frown or laugh at us, but I say—Be hang to them.[৪০]

বঙ্কিমচন্দ্রও মূলতঃ পাশ্চাত্য তথা ইংরেজি সমালোচনার মানদণ্ডে বাংলা সাহিত্যের বিচারে অগ্রসর হয়েছেন। প্রাক্-বঙ্কিমযুগে বাংলা ভাষার সমালোচনার আদর্শ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকাটি এদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এর ছিল পূর্বসূরী। ভাবতে বিস্ময় লাগে, আমাদের সমালোচনা সাহিত্য কতটা দ্রুততার সংগে সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়েছিল।

৩৮. বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরেজি ভাষায় কিছু সমালোচনা লিখেছিলেন। এই সমস্ত সমালোচনার কোন কোনটির বাংলা অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন মন্মথনাথ ঘোষ।
(বঙ্কিমচন্দ্র, বাঙ্গালা সাহিত্য—অনুবাদক মন্মথনাথ ঘোষ দ্রষ্টব্য)

৩৯. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, মধুসূদন রচনাবলী ১ম সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

৪০. Ibid

এই প্রসংগে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বক্তব্য স্মরণ করছি :

> বাংলা সাহিত্য যেমন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের জীবনী রসের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে সেইরূপ ইহার সমালোচনাও বৈদেশিক বিচার-পদ্ধতির মূল সূত্রগুলিকে আত্মসাৎ করিতে ও ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করিতে যে সাধনা করিয়াছে তাহা বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয়। বাঙালী সাহিত্যিক যেমন একদিকে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে সেইরূপ বাঙালী সমালোচকও এই নবজাত সাহিত্যের রসাস্বাদন ও মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত বৈদেশিক প্রভাবে অনুপ্রাণিত নূতন মানদণ্ড উদ্ভাবন করিয়াছে।[৪১]

সাহিত্য সমালোচনার 'নূতন মানদণ্ড' উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের মতো পাশ্চাত্যপন্থী হলেও সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের আদর্শ একেবারে উপেক্ষা করেননি। বরং সংস্কৃত ও ইংরেজি এই দুই আদর্শের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি 'উত্তরচরিত'-এর আলোচনায় সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের 'স্থায়ীভাব' এবং ইংরেজি অলংকার শাস্ত্রের 'passion' এর মধ্যে সাদৃশ্য অনুসন্ধান করেছেন। অবশ্য পাশ্চাত্য সমালোচনা রীতির আদর্শই যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সবিশেষ কার্যকরী ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সাহিত্য কাকে বলে, সাহিত্যে বাস্তবতা (realism) এবং কল্পনা (imagination) এর স্থান নির্দেশে সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রসর হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম সংস্কৃত আলংকারিকদের অনুসরণ না করে শেলী, সিড্‌নী, কোলরিজ প্রভৃতির আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার নবীন লেখকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন :

> যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।

এই দৃষ্টিভংগীর ক্ষেত্রে হোরেস-এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ হিসাবে Horace-এই বক্তব্যই উপস্থিত করেছিলেন :

> **Poets aim at giving either profit or delight or at combining the giving of pleasure with some useful precepts of life…**

৪১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'সমালোচনা সাহিত্য পরিচয়' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

The man who has managed to blend profit with delight wins everyone's approbation, for he gives his reader pleasure at the same time as he instructs him.[৪২]

সৌন্দর্যসৃষ্টি প্রসংগেও হোরেস সৌন্দর্য এবং আকর্ষণ সৃষ্টির কথা বলেছেন :

It is not enough that poems should have beauty ; if they are to carry the audience with them, they must have charm as well,[৪৩]

সাহিত্যসৃষ্টির পশ্চাতে সামাজিক মঙ্গল সাধন বা হিতসাধনের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুত্বদানের অন্য একটি কারণও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার আদর্শের ক্ষেত্রেও বেন্থামের 'উপযোগবাদ' এবং কোঁৎ-এর ধ্রুববাদের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কোঁৎ-এর দর্শন সম্পর্কিত মতবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগিতা লক্ষ্য করে বলেছেন :

কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারে নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।

(বিবিধ প্রবন্ধ, বিদ্যাপতি ও জয়দেব)

যাই হোক, ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্যের ধারার সংগে সাহিত্যিক হিসাবে আপন অভিজ্ঞতা মিশ্রিত করে সাহিত্য বিচারের একটা নিজস্ব মানদণ্ড বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছিলেন। ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে 'দি ব্ল্যাক উড ম্যাগাজিন' এবং 'দি এডিনবরা রিভিউ' যে ভূমিকা পালন করেছিল বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে সেই ধরণের ভূমিকা পালন করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা।

নিজস্ব মানদণ্ড সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে পাশ্চাত্য অলঙ্কারশাস্ত্রের বক্তব্য অনেকটা পরিমাণে, কোন কোন ক্ষেত্রে, পরিবর্দ্ধিত করেছিলেন সে কথা ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সযত্নে পরিস্ফুট করেছেন। ডঃ সেনগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' এবং 'গীতিকাব্য' শীর্ষক রচনা দুইটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে

৪২ **Horace : On the Art of Poetry [Dorsch, T. S : Classical Literary Criticism, a Penguin Book P 90-91]**

৪৩. **Ibid. p 82**

বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র এ্যারিস্টটল-এর বক্তব্য থেকে অনেকটা দূর অগ্রসর হযেছেন :

> বঙ্কিমচন্দ্র অ্যারিস্টটল-প্রদর্শিত রীতি অনুসরণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি নাটক, মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের মধ্যে যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন সেইখানে তিনি অ্যারিস্টটলকেও অতিক্রম করিয়াছেন।...বঙ্কিমচন্দ্র এই তিন প্রকরণের যে বিশ্লেষণ করিযাছেন তাহা অ্যারিস্টটল-এর আলোচনা হইতে অনেক সূক্ষ্ম ও সুদূর প্রসারী।[৪৪]

ডঃ সেনগুপ্ত এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল-এর সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের তুলনা করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'গীতিকাব্য' (বিবিধ প্রবন্ধ) শীর্ষক প্রবন্ধের আর একটি দিক লক্ষিতব্য। বঙ্কিমচন্দ্র এই আলোচনায় শুধু পাশ্চাত্য নয়, ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন :

> ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বোধ হয।

আর শুধু ভারতীয় আলংকারিক কিংবা পাশ্চাত্যের অ্যারিস্টটলের বক্তব্যই নয়—বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে পাশ্চাত্যের গ্যেটে প্রভৃতির বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। কিন্তু সব কিছুর পরও বলা যায় তিনি অপরের বক্তব্য উল্লেখ করে নিজস্ব ধারণার আলোকে শেষ পর্যন্ত বিষয়টি পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন।

এই প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি 'কোমাস', 'ম্যানফ্রেড' এবং 'ফাউষ্ট' প্রভৃতি গ্রন্থে নাটকের মতো কথোপকথন থাকলেও এগুলো নাটক বলেননি, কাব্যের অন্তর্গত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করছি। প্রাচীন ও অর্বাচীন এই উভয় ধরণের সাহিত্যের মূল্যায়নে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'উত্তরচরিত' এবং 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা' প্রবন্ধের নাম উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। কবি বা সাহিত্যিকদের সামগ্রীক আলোচনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন এবং দীনবন্ধু মিত্রের আলোচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন গ্রন্থ-সমালোচনা প্রসংগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ

৪৪. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বাংলা সমালোচনা পরিচয়, ১ম সংস্করণ, পৃ ৮৪-৮৫।

জলযোগ,' রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা,' নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশ-রঞ্জিনী' ও 'পলাশীর যুদ্ধ', ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু,' হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার', গঙ্গাচরণ সরকারের 'ঋতুবর্ণন' এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মানস বিকাশ' গ্রন্থের সমালোচনা 'বঙ্গদর্শন'-এর পাতায় প্রকাশিত হয়।

ঈশ্বরগুপ্ত এবং দীনবন্ধুর সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিম বস্তুতন্ত্র (realism) এবং ভাবতন্ত্র (idealism) সম্পর্কিত ধারণার নিরিখে সাহিত্য বিচারে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি ভারতচন্দ্রের প্রতি অশ্রদ্ধাবান না হলেও সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

যদি চিত্তরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেন্‌থামের তর্কে দোষ কি? কাব্যেও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। এবং অনেকেরই ঐবান্‌হো অপেক্ষা একবাজি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়।[৪৫]

('উত্তরচরিতে'র আলোচনা প্রসংগে, পৃ ১৮২)

আমরা দেখেছি, কোঁৎ-এর ধ্রুববাদ-এর দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত হয়েছেন। সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর বস্তুতন্ত্রের প্রতি আসক্তির মূলে ধ্রুববাদ সক্রিয় ছিল। ইউরোপের অনেক লেখকই যে সাহিত্যের সংগে সমাজের নিগূঢ় সম্পর্ক প্রদর্শন করতে অক্ষম হয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র তার জন্য আক্ষেপ করেছেন:

কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সংগে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বক্‌ল্ ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদমতপ্রিয় বক্‌লের সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প।

(বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাপতি ও জয়দেব)

কোঁৎ (Comte) সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে নিছক ভাবতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন রোমান্টিক যুগের কবি সাহিত্যিকেরা। অতি ভাবতন্ত্রতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভিক্টোরিয় যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে বস্তুতন্ত্রের প্রতি প্রবণতা দৃষ্ট হয়। বঙ্কিম ছিলেন এই বস্তুতন্ত্রের ভক্ত। তিনি গুপ্ত কবি প্রসংগে বলেছিলেন: ঈশ্বরগুপ্ত 'realist'।

৪৫. বঙ্কিমচন্দ্রের এই যুক্তি ভ্রান্ত। যাঁহারা কাব্যচর্চার আনন্দের কথা বলেন তাঁহারা ইহাও বলেন যে ইহা লৌকিক হর্ষ হইতে পৃথক।

—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বাংলা সমালোচনা পরিচয়, ১ম সংস্করণ, পৃ ৮০।

এই বস্তুতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাঁরা সরব তাঁদের সম্মুখে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন :

যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাংক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য নাই? আছে বৈ কি। ঈশ্বরগুপ্ত সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে ঈশ্বরগুপ্ত তাহার কবি।

(ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, ভূমিকা, কবিত্ব, ৩য় পরিচ্ছেদ)

এই বস্তুতন্ত্রের প্রাধান্য দীনবন্ধু মিত্রের রচনায়ও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। বঙ্কিম মনে করেছেন যে দীনবন্ধুর সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান উপাদান ছিল প্রত্যক্ষদর্শিতা।

কি উপাদান লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই।

দীনবন্ধু অনেক সময়ই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি প্রণয়ন করিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাহার Realism, তাহার উপর Idealize-করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল।

(রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা, 'কবিত্ব' শীর্ষক অংশ থেকে উদ্ধৃত)

এই 'idealize'-করবার ক্ষমতা ছিল বলেই দীনবন্ধু 'গাছের বানরকে এইরূপ সাজাইতে সাজাইতে সে একটা হনুমান বা জাম্বুবানে পরিণত হইত'। এখানেই কবি সাহিত্যিকের সৃষ্টিকৌশল। ব্রাউনিং-এর ভাষায়: 'Out of three sound, he frame, not a fourth sound, but a star'[১৬]-শিল্পীর এই কৌশল দীনবন্ধুর ছিল, ঈশ্বরগুপ্তের ছিল না।

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার যেমন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন তেমনি সেই বাস্তবের আদর্শ রূপদানের গুরুত্ব তিনি সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপলব্ধি করেছিলেন। ঠিক এই কারণেই লেখক দীনবন্ধু সম্বন্ধে আলোচনার শেষ অংশে মন্তব্য করেছেন যে সমাজ সংশোধন যদি কাব্য

১৬. Browning Robert Abt Vogler, Stanza VII

সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে সাহিত্য হিসাবে তা' নিকৃষ্ট, কারণ, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি। এদিক থেকে ম্যাথ্যু আর্নল্ড-এর চিন্তার সংগে তাঁর বক্তব্যের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়:

> Poetry is at bottom a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty.

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য:

> বাঙ্গালা ভাষায় এমন কতকগুলি নাটক নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায় সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি।

প্রতীচ্যের ধারা অনুসরণ করে কাব্যে তন্ময়তা এবং মন্ময়তা সম্পর্কে ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে এনেছিলেন। চুঁচূড়া সাধারণী যন্ত্রে প্রকাশিত গঙ্গাচরণ সরকারের 'ঋতুবর্ণন' কাব্যের আলোচনা প্রসংগে তিনি দুই শ্রেণীর কবির উল্লেখ করেছিলেন।

> ···· ·সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে ঠিক তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।
>
> আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে······ ·· তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন, যাহা সুন্দর তাহাই বাছিয়া লইয়া যাহা অসুন্দর তাহা বহিষ্কার করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও কম সৌন্দর্য্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ কেহ কখনও ইন্দ্রিয়গোচর করেন নাই·········সেই আত্মচিত্ত প্রসূত উজ্জ্বল হেম কিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরো সুন্দর করেন—সৌন্দর্য্যের অতি প্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন।
>
> (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৮২)

সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতীচ্যের সমালোচনার বিভিন্ন ধারা অনুসরণে প্রযত্ন করেছিলেন। তিনি মূলতঃ তুলনামূলক সমালোচনা পদ্ধতি, ঐতিহাসিক সমালোচনা পদ্ধতি, বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে সাহিত্য সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। কাব্য ও কবিতা সম্পর্কিত আলোচনায়

তিনি মূলতঃ শেলী-র 'ডিফেন্স অব্ পোয়েট্রি' এবং সিড্নী ও ম্যাথ্যু আর্নল্ড-এর যুক্তি ধারা অনুসরণ করেছিলেন। ম্যাথ্যু আর্নল্ড সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এই পদ্ধতির তিনি অনুসরণ করেছিলেন 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধে আর 'পলাশীর যুদ্ধ', 'অবকাশরঞ্জিনী', 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতির আলোচনায় এবং দীনবন্ধু ও গুপ্ত কবির সাহিত্য-সমলোচনা প্রসংগে।

'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থটির সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমতঃ 'বৃত্রসংহার'-এর সংগে 'পলাশীর যুদ্ধে'র পার্থক্য প্রদর্শনের মাধ্যমে 'পলাশীর যুদ্ধে'র বিশিষ্টতা স্পষ্ট করে তুলেছেন এবং পরে নবীনচন্দ্রের সংগে বায়রণ (Byron)-এর কাব্যের তুলনা করে নবীনচন্দ্রের কাব্যের ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন :

> …তাঁহার লিপি প্রণালীর সঙ্গে বাইরণের লিপি প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা দেখা যায়। চরিত্রের আশ্লেষণে দুইজনের একজনও শক্তি প্রকাশ করেন না।—বিশ্লেষণে দুইজনেরই কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদযে হৃদযে ঘাত-প্রতিঘাত—দুইজনের একজনের কাব্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অন্যদিকে দুইজনেই শক্তিশালী। ইংরেজিতে বাইরণের কবিতা তীব্র তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। ·· হৃদয়-নিরুদ্ধ ভাবসকল, আগ্নেয়-গিরি—নিরুদ্ধ, অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য।
>
> বাইরণের ন্যায় নবীনবাবুর বর্ণনাও অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, বাইরণের ন্যায় তাঁহারও শক্তি আছে যে, দুই চারিটি কথায়, তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতারণ করিতে পারেন। ক্লাইবের নৌকারোহণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল।
>
> (বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক সংখ্যা, ১২৮২)

> হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' আলোচনা প্রসংগে বলেছেন : 'পর্বতের চূড়া যেন, সহসা প্রকাশ'—ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি—মিলটনের-যোগ্য।
>
> (বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১২৮১)

'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা' (বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড) শীর্ষক আলোচনায় তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে শকুন্তলা চরিত্রের রূপ নতুন করে সৃষ্টি করতে অগ্রসর হয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্ত এবং দীনবন্ধু মিত্রের সমালোচনায় লেখক অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এই উভয় সাহিত্যিকের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে উভয়ের বিশিষ্টতা আমাদের

সামনে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর 'মানস বিকাশ' শীর্ষক কাব্য গ্রন্থটির আলোচনায় ৪৭ সমালোচক ঐতিহাসিক বিচার-পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া, 'লুপ্তরত্ব উদ্ধার'-এর ভূমিকায় প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনা-রীতি সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি ঐতিহাসিক বিচার-পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক রচিত) গ্রন্থের সমালোচনার ক্ষেত্রে তত্ত্বমূলক পদ্ধতি এবং 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' শীর্ষক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য সম্পর্কে সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে সিড্‌নীর বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সিড্‌নী বলেছিলেন 'one may be a poet without versing and a versifier without poetry.

বঙ্কিমচন্দ্র 'গীতিকাব্য' শীর্ষক (বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড) আলোচনায় বলেছেন :

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলি গ্রন্থ যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য।

এদিক থেকে লেখক পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'ম্যানফ্রেড', 'ফাউষ্ট' এমন কি স্কট-এর 'ব্রাইড অব্ লামারমুর্'-কে কাব্য আখ্যায় ভূষিত করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের আলোচনা প্রসংগে তিনি বলেছেন :

কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের তুলনায় দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল।

পাশ্চাত্য সমালোচনার ধারা অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম ব্যঙ্গ (satire)-এর আলোচনা প্রসংগে Wit এবং Humour (ব্যঙ্গ এবং হাস্যরস) এর পার্থক্য বাংলা সাহিত্যের সম্মুখে মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-এর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

নিষ্ফল ক্রিয়ার প্রতি অবস্থা বিশেষে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। ক্রিয়া যে নিষ্ফল হয়, তাহার সচরাচর কারণ এই যে উদ্দেশ্যের সহিত অনুষ্ঠানের সংযোগ থাকে না। যেখানে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য অসঙ্গত, সেইখানে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। বাঙ্গালির কথার অপ্রতুল হেতু ইহাকেও প্রমাদ বলিতে হয়, কিন্তু ….. ভ্রান্তির সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ আছে। ইংরেজি ভাষায় এই দুইটির অন্য পৃথক নাম

৪৭. বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৭৯

আছে। একটিকে Error বলে আর একটিকে Mistake বলে। Error-ব্যঙ্গের যোগ্য নহে, Mistake ব্যঙ্গের যোগ্য।

(বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৭৯)

বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্ত-কবির হাস্যরসে সহানুভূতির অভাব লক্ষ্য করেছেন। দীনবন্ধুর হাস্যরস, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, 'হিউমার' জাতীয়। তাঁর রচনায় বিদ্রূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহানুভূতির অভাব হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যে সমস্ত সামাজিক ব্যঙ্গ রচনা করেছিলেন সেগুলোর ক্ষেত্রে 'উইট্' নয়, 'হিউমার'-এর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর জাতীয় মেজাজের সঙ্গে 'উইট্' সংগতিবিহীন। ঠিক এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের আসরে 'উইট্'-এর অপ্রতুলতা এবং 'হিউমার'-এর প্রাচুর্য দেখা হয়। 'উইট্' সৃষ্টির ক্ষেত্রে উনিশ শতকে একমাত্র ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিংশ শতকে 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী অনেকটা সার্থকতা অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট প্রতিভা সাহিত্যের বহু-বিচিত্র পথে অগ্রসর হলেও 'উইট্'-এর রাজ্যে পদার্পণ করেনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ নিচয়ের পাশ্চাত্যানুকরণের আর একটি দিকের প্রতি লক্ষ্য করছি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় সমস্ত সমালোচনামূলক ও তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং কবি-সাহিত্যিকদের কথা উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা সম্পর্কে আমাদের আলোচনায় এই সত্যটিও নিঃসন্দেহে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর সমালোচনায় সেক্সপীয়র, বায়রণ, স্কট, গ্যেটে, মিলটন, এমারসন, ভিক্টোর হিউগো প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সার্থক সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত করেছিলেন। পাশ্চাত্য এবং আমাদের দেশীয় দৃষ্টিভংগীর সমন্বয়ে তাঁর সমালোচনা সাহিত্য মৌলিক দৃষ্টিভংগীর পরিচয়বহ। বঙ্কিমের প্রদর্শিত পথে সে যুগে রমেশচন্দ্র দত্ত এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচনার ধারা বাংলা গদ্যে অম্লান রেখেছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে এসে বাঙালীর সাহিত্য সমালোচনা যে উনিশ শতকের শেষ দশকে এসে কতটা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ইংরেজিতে লেখা দু'টি প্রবন্ধ:

(১) The Neo-Romantic Movement in Literature.

(২) Keats' Mind and Art : A Study.

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং প্রথম প্রবন্ধটি 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় (১৮৯০) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের মূল্যবান প্রবন্ধদ্বয় ইংরেজিতে রচিত। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথই প্রথম বাঙালী সমালোচক যিনি হেগেলীয় দৃষ্টিভংগীতে সাহিত্য বিচারে অগ্রসর হয়েছেন। অবশ্য, এ ক্ষেত্রেও তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভংগী বিসর্জন দেননি। ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনায় সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতি। তিনি পাশ্চাত্যের বহু কবি সাহিত্যিকদের প্রসংগ উল্লেখ করেছেন।[৪৮]

জার্মান রোমান্টিক স্কুলের কবি-সাহিত্যিক : Goethe, Schiller, Katzebne, Burger, Ritcher, Heine এবং অন্যান্য।

ফরাসী রোমান্টিক স্কুলের কবি : Victor Hugo, Chateaubriand, Lamartine, Alfred the Musset, Augustine Thierry, Gautier, Morris de Guerineএবং অন্যান্য।

ইংরেজি রোমান্টিক স্কুলের : Wordsworth, Coleridge, Scott, Byron, Shelley, Keats, Tennyson, Browning, Swinburne এবং অন্যান্য।

অল্পখ্যাত কবি-সাহিত্যিকও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি : Wartons M. G. Lewis, Leyden, Lewis Morris এবং অন্যান্য।

পাশ্চাত্যের কবি-সাহিত্যিকদের সংগে এই ধরণের সর্বব্যাপী পরিচয় সে যুগের একজন ভারতীয়ের পক্ষে বিস্ময়কর।

পাঁচ

ভাষারীতি

শব্দচয়নের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উদার দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর একটি বক্তব্যের মধ্যে :

বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে, তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার

৪৮. Bose, Amalendu Brajendranath Seal as a Literary Critic, Calcutta Review, September, 1969,

শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।

(বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫—পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' ২য় খণ্ডে স্থান পায়)

ভাবের পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট প্রকাশের প্রয়োজনে বঙ্কিম তাই বিদেশী ভাষা থেকে শব্দ চয়নে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। বাংলা ভাষা যখন সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের উপযুক্ততা অর্জন করেনি, বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার যখন স্ফীতকায় হয়ে ওঠেনি তখন বংগভাষার উন্নতির প্রয়োজনে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের কলেবর বৃদ্ধি এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির দিকে বঙ্কিম দৃষ্টি দিয়েছেন অধিক। বঙ্কিমচন্দ্রের এই দৃষ্টিভংগীর সংগে ভূদেবের দৃষ্টিভংগীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে আমাদের শব্দ ভাণ্ডার এক সময় যে স্ফীতকায় করে তুলবে তিনি সেকথা বলেছিলেন। যে কোন দেশের ভাষায় এই প্রবণতা অল্লাধিক দৃষ্ট হয়। ইংরেজি ভাষাও প্রাচীন গ্রীক-লাটিন ভাষা থেকে শুরু করে আধুনিক য়ুরোপের নানা ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে আপন ভাষার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করেছিল। তার শব্দভাণ্ডার লাভ করেছিল অনুপম অতুল্য কলেবর।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সময়ের অগ্রগতির সংগে সংগে ইংরেজি শব্দের প্রতি ক্রমশঃ মোহবৃদ্ধি ঘটেছে। উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ ছিল স্বল্প। মিশনারিগণ ইংরেজি বাক্যরীতি অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় বাক্য গঠনে অগ্রসর হলেও তাঁরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহারে বিশেষ সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন।

আলোচ্য শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের পর আমরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহারে প্রবণতা কোন কোন লেখকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি। তবে, ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তখনকার লেখকগোষ্ঠী প্রায়শঃ ইংরেজি শব্দ একটু বিকৃত উচ্চারণে বাংলা রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

পরবর্তীকালে, বঙ্কিম-ভূদেবের যুগে, বিকৃত উচ্চারণ সহ ইংরেজি শব্দের বাংলা রূপদানের প্রবণতা একেবারে প্রশমিত না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই ক্রমশঃ শুদ্ধ উচ্চারণ অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করবার প্রচেষ্টা শুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময় আবার ইংরেজি অক্ষরেই ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন বাংলা ভাষায়। সময়ের অগ্রগতির সংগে সংগে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণ অনুমেয়।

প্রাথমিক অবস্থায় ইংরেজিয়ানা শুধুমাত্র এখানকার শাসকগোষ্ঠীকে কেন্দ্র

করে কতিপয় বাঙালীর মধ্যে সীমিত ছিল। একদিকে ইংরেজের শাসনযন্ত্র বিস্তারের সংগে সংগে এই গোষ্ঠী অনেকটা ব্যাপ্তি লাভ করলো এবং অপরদিকে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সংগে সংগে এই ইংরেজিয়ানা ক্রমশঃ আমাদের সমাজ জীবনে প্রবেশ করলো। সে যুগের নব প্রতিষ্ঠিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রকৃতপক্ষে উন্নতির শীর্ষে অধিষ্ঠিত হবার প্রশস্ত সোপান হিসাবে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তাই, ইংরেজি ভাষার সংগে উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের শব্দভাণ্ডারে ইংরেজি শব্দ সংযোজনের দিকটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। আমাদের লক্ষণীয়, বিকৃত উচ্চারণে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি শব্দ গ্রহণ, বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দের অবিকল ব্যবহার এবং ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা।[৪৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের ব্যবহারের কতিপয় উদাহরণ লক্ষিতব্য :

.........মুচিরামের কর্ম কাজ 'রেলগাড়ির' মতো গড় গড় করিয়া চলিল। (মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত, পৃ ১২০) চোখ বুজিয়া 'ডিক্রী' দিতেন (তদেব, পৃ ১২২) পাকা 'কোচম্যানের' মতো (তদেব, পৃ ১২৪) বানরামি 'নম্বর' এক (তদেব, পৃ ১২৪) একটি 'প্যারাগ্রাফ' শুধু মুচিরাম রায় সম্বন্ধে, (তদেব, পৃ ১২৭) মুচিরামকে 'ডেপুটি' 'কালেক্টর' করিবার জন্য 'গভর্ণমেণ্ট' 'রিপোর্ট' করিলেন (তদেব, পৃ ১২১)॥

তাঁহারা 'Annexationist' ছিলেন না (কৃষ্ণচরিত, পৃ ৫১৯) সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান 'ডিউটি' (তদেব, পৃ ৫০০) ঘি খাইয়া অগ্নির 'Dyspepsia' উপস্থিত (তদেব, পৃ ৫১২) আধুনিক Diplomacy বিদ্যার সৃষ্টি। (তদেব, পৃ ৫১২)

ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজি নাম 'Justice', বড় চোর হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম 'patriotism' (তদেব, পৃ ৫৩৪)

রঙ্গিল 'সার্সী' প্রেরিত স্নিগ্ধালোকে (সাম্য, পৃ ৩৮১) কথন ভরসা 'রিলিফ' (তদেব, পৃ ৩৯০) 'কনসালের' পদে বরণ করিলেন (তদেব, পৃ ৩৮৪)

প্রজারা জমিদারের 'ইন্‌কাম্‌টেকস' দেয় (বঙ্গদেশের কৃষক, পৃ ২৯৭)

৪৯. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে গৃহীত সমুদয় শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্যের পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশের ক্ষেত্রে যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, অনুসরণ করেছি।

সবডিভিসনের হাকিমেরা 'স্কুল' 'ডিস্পেন্সারী' করিতে বড় মজবুত, (তদেব, পৃ ২৯৭) ২৪ পরগণার 'অ্যাসিষ্ট্যান্ট' 'ম্যাজিষ্ট্রেট' (তদেব)। টাকায় এক আনা 'হাসপাতালি' আদায় হইতে লাগিল (তদেব) এই 'কনট্রাকটারেরাই' জমিদার (তদেব, পৃ ৩০৫) যখন আর 'স্ক্রু' ফিরে না (তদেব, পৃ ২৯১) 'ষ্ট্যাম্পের' মূল্য চাই, উকীলের 'ফিস' চাই (তদেব, পৃ ২৯৫) 'কোরক' (ক্রোক) কি চমৎকার ব্যাপার (তদেব, পৃ ৩০৬) ॥

'Huxley' সাহেবের 'Protoplasm' খেযে থাকব (কমলাকান্তের দপ্তর, পৃ ১০৮) বক্তৃতায় 'ফিলজফির' কড়িমধ্যম মিশাইয়া (তদেব, পৃ ৬৮)। 'মেকলে' 'রেটরিকের' পঞ্চম লাগাইযা (তদেব, পৃ ২৬৯) 'Public spirit' রূপ পূর্ণচন্দ্রের (তদেব, পৃ ৮৯) 'কোটেশন' ভালবাসেন, না 'ফুটনোটে' আপনার অনুরাগ (তদেব, পৃ ৯১) 'পলিটিক্স্ সাব্জেক্টরূপী' ঝামা ইট (তদেব, পৃ ৯৩) 'পলিটিকেল' 'এজিটেশুন' সফল হইল (তদেব) 'রিজলিউশুনেই' দ্বিতীয়তঃ (ইংরেজি second-এর অনুসরণ) করিতে প্রস্তুত নহি (তদেব পৃ ৯৫) 'পার্লিযামেন্টের' 'রিফর্ম' এবং 'আইরিশ' 'চার্চের' 'ডিসেষ্টাব্লিশমেন্ট' কোথা থাকিত ? (তদেব, পৃ ৯১) 'গুথের' প্রতি সাক্ষীর 'objection' আছে (তদেব, পৃ ১০২) 'Theological Lecture' টা ব্রাহ্ম সমাজের জন্য (তদেব) ॥

'আমেরিকান' 'কংগ্রেসের' বা 'ব্রিটিশ' 'পার্লিযামেন্টের' (ধর্ম্মতত্ত্ব, পৃ ৬১৬) যখন তোমরা 'morals' অর্থে নীতি শব্দ চালাইয়াছ, 'science' অর্থে বিজ্ঞান চালাইযাছ তখন 'faculty, অর্থে বৃত্তি শব্দ চালাইলে দোষ ধরিব না' (তদেব, পৃ ৫৮৮) 'ডাক্তারেরা ইহাকে 'Dipsomania' বলেন (তদেব, ৬০১) অর্থাৎ, তুমি 'Miracle' মান না (তদেব, পৃ ৬০৯) ॥

মেঘ 'ডিপার্টমেন্টের' 'এবলিশ' করা যাইতে পারে (লোকরহস্য, পৃ ৩০) টিষ্টমেন্টালি' 'ডিপার্টমেন্টের' (তদেব, পৃ ২৯) 'কনষ্টেবল' মহাশযেরা কতকটা ভগে সাহেব মহাশয়কে 'ডকস্থ' করিলেন (তদেব, পৃ ৩৩) 'প্রমোশুনের' 'রিপোর্ট' (তদেব, পৃ ৩৭) আমাকে 'Excuse' করুন (তদেব, পৃ ৩৮) 'অথরের' 'লাইফটা' জানতে হয় (তদেব, পৃ ৪৫) 'আমাদের হলো 'Polished Society' (তদেব, পৃ ৪৭) 'মাতৃভাষার ওপর 'পালিশ ষষ্ঠীর' এত রাগ কেন ?' (তদেব) 'বড় বড় 'appointment' hold, করিতেন' (তদেব, পৃ ৪৬) 'Demoralise' হয় (তদেব, পৃ ৪৫) 'পাবলিক' 'ডিনারের' সূচনা না দেখিয়া (তদেব, পৃ ১) ॥

ফটিকচাঁদ 'স্কোয়ার' পর্যন্ত (লোকশিক্ষা, পৃ ৩৭৬) 'থিয়েটারে' গিয়া কাওয়ালীর টপ্পা শুনিয়া (তদেব, পৃ ৩৭৭) ইহার ভিতর একটু 'Romance'-ও আছে, (ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, ভূমিকা, পৃ ৮৪০) 'সেই 'নোটগুলি' অবলম্বন করিয়া (তদেব, পৃ ৮৩৬) ঈশ্বরগুপ্তকে 'Bowdlerize' করিতে গিযা নিস্তেজ করিযা ফেলিয়াছি (তদেব, পৃ ৮৫২) দেশী 'Agitator'-দের কান ধরিয়া টানাটানি (তদেব, পৃ ৮৫১)॥

আন্দাজি 'Theory' খাড়া করিয়াছি, এমন নহে (দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী, পৃ ৮৩৫) পূর্ব বাঙ্গলা 'রেলওয়ের' কাঁচড়াপাড়া 'স্টেশনের' (তদেব, পৃ ৮২৩) 'Charity' যেমন সমস্ত দোষ ঢাকিয়া রাখে (তদেব, পৃ ৮২৭)॥

'Farce' না—'satire' (পুষ্পনাটক, পৃ ৯৪৩)। 'এডুকেশন' 'ফিল্টর্' 'ড্রৌন' করিবে (বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা, পৃ ২৮২) আমাদের এই 'Renaissance' কোথা হইতে (বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, পৃ ৩৩৯) 'প্রেসে' বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল (সঞ্জীবনী সুধা, ভূমিকা, পৃ ৮৬৬) 'লণ্ডন' 'ককনী' বা কৃষকের কথা' (বাঙ্গালা ভাষা, পৃ ৩৬৮) কোথাও সেই 'ইম্পিরেটর', কোথাও সেই 'সেনেট', কোথাও সেই 'প্লেবের' শ্রেণী, কোথাও 'ফোরম', কোথাও সেই 'মিউনিসিপিয়ম' (অনুকরণ, পৃ ২০২) 'কঠিন হৃদয় 'মালথসি বুলি' (রামধন পোদ, পৃ ৩৭৮) কিন্তু 'Mass 'Education' লইয়া তর্কবিতর্ক (কৃষ্ণচরিত্র, পৃ ৪২৯) 'Mistake' যেরূপ ব্যঙ্গের যোগ্য 'folly'-ও তদ্রুপ (প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, পৃ ৮৭৭) ইত্যাদি॥

বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহৃত এই সমস্ত ইংরেজি শব্দের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তিনি কখনো বাংলা হরফে আবার কখনো ইংরেজি হরফে ইংরেজি ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত বাংলা বাক্যে ইংরেজি শব্দের স্বাতন্ত্র্য যখন বজায় রাখতে চেয়েছেন, তখন ইংরেজি হরফে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেখানে বাংলা বাক্যে ইংরেজি শব্দকে আপন করে গ্রহণ করেছেন সেখানে বাংলা হরফ ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিকৃত এবং অবিকৃত এই উভয় ধরণের উচ্চারণ অনুসরণ করে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। পূর্ববর্তী যুগের লেখকদের মতোই বিভিন্ন ইংরেজি শব্দকে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে স্থায়ী আসন দান করবার উদ্দেশ্যে কখনো ইংরেজি-বাংলা যুগ্ম শব্দ, কখনো ইংরেজি-বাংলা শব্দ মিলে সমাসবদ্ধ পদ সৃষ্টি করেছেন, আবার কখনো ইংরেজি শব্দের সংগে বাংলা প্রত্যয় যুক্ত করে নূতন পদ সৃষ্টি করেছেন, আবার অনেক সময় বিভিন্ন ইংরেজি

শব্দের সংগে বাংলা শব্দ-বিভক্তি যুক্ত করেছেন।

তাছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বিভিন্ন ধরণের ইংরেজি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনা প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগে আমাদের দেশে অপ্রচলিত একটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন—**Bowdlerize**।৫০ এই ধরণের শব্দ ব্যবহার ইংরেজি সাহিত্যের সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের চিহ্ন বহন করে।

ইংরেজি শব্দ ব্যবহার একসময় বাংলা রচনায় নিছক প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সংগে সংগে ইংরেজি শব্দ আইন-আদালত, সরকারি অফিসের চৌহদ্দি অতিক্রম করে আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর সমাজ ও গৃহ স্পর্শ করল। তাই, ক্রমশঃ, বাংলা রচনায় প্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দের পাশাপাশি অনেক অপ্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে বাংলা শব্দ ভাণ্ডার ইংরেজি শব্দে আরো কিছুটা স্ফীতকায় হয়ে উঠল। বঙ্কিম-যুগের লেখকদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। এবং এই প্রবণতা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও প্রবল।

এই যুগে বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের সাধনা ছিল অনন্যসাধারণ।৫১
বঙ্কিমচন্দ্রও সাধারণভাবে কিছু পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ এই প্রসংগে উদ্ধৃত করছি :

Germ=পীড়াবীজ (পৃ ১৩৫)

Hydrogen=জলযান বায়ু (পৃ ১৩৬)

Potas=পোতাস (পৃ ১৫১)

Turpentine Oil=তারপিন তেল (তদেব)

Occulation=সমাবরণ (পৃ ১৫৮)

Spectroscope=বর্ণরেখ পরীক্ষক (তদেব)

৫০. In 1818 he (Thomas Bowdler) published the Family Shakespeare, 10 Vols. in which those words and expressions are omitted which cannot with propriety be read aloud in a family'.........His prudery was much ridiculed, and gave rise to the word 'bowdlerism'.

Ed. Bozman, E. F. Everyman's Encyclopaedia, Vol. II, p. 392.

৫১. বিদ্যাসাগর পূর্বেই এই পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন।

Free Trade=অনর্গল বাণিজ্য প্রণালী (পৃ ৩১১),
Materialism=প্রকৃতিবাদ (পৃ ১০২৭)
Law=ব্যবস্থাশাস্ত্র (পৃ ২০২)
Theology=ঈশ্বরতত্ত্ব (পৃ ১০২৭)।
Ventrilocution=শব্দানুকরণ বিদ্যা (তদেব)
Logic=ন্যায়শাস্ত্র (তদেব)।
Inductive Philosophy=অম্বেক্ষিকী দর্শন[৫২] (পৃ ১০২৭)

ভাষারীতি (Style)-এর ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বসূরীদের মতোই ইংরেজি ভাষারীতির দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত ছিলেন। ইংরেজি ধারা অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ববর্তী গদ্যকারদের মতোই বিভিন্ন যতিচিহ্নের সুষ্ঠু ব্যবহার করেছেন। অধীন বাক্য বা খণ্ড বাক্য (clause)-এর সজ্জার ক্ষেত্রেও তিনি পূর্ববর্তী গদ্যকারদের মতোই ইংরেজি রীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। প্রত্যক্ষ উক্তি (Direct Narration)-র ব্যবহারও ইংরেজির অনুসরণে তিনি করেছেন। বর্তমান কালে হওয়া ক্রিয়া (Copula)-র ব্যবহার বাংলা গদ্যের প্রাথমিক যুগে, ইংরেজি ভাষারীতির অনুসরণে, ছিল যথেষ্ট। পরবর্তীকালে এই ধরণের ব্যবহার বর্জিত হয়। তবে, দুই একটি ক্ষেত্রে এই ধরণের ব্যবহার যে বঙ্কিম যুগে দেখা যায় না এমন নয়।

'এবং' দিয়ে বাক্য আরম্ভ ভূদেব, বিদ্যাসাগর এবং প্রথম যুগে বাংলা গদ্যকারদের রচনায় প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইংরেজি রীতির এই প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় খুব কম দেখা গেলেও একেবারে নেই বলা চলে না, উদাহরণ স্বরূপ :

'...। এবং এ দেশী স্ত্রী পুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায়...।

বাংলা বাক্যগঠন রীতি অনুসারে বাক্যে ক্রিয়াপদ বসে কর্তা এবং কর্মের পর। ইংরেজি রীতি অনুসরণে ক্রিয়াপদ কর্তার পর এবং কর্মের পূর্বে বসে। এই রীতির অনুসরণ করেছিলেন প্রথম যুগের কোন কোন বাংলা গদ্যকার।

৫২. ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ধ্রুববাদী অগস্ত কোম্‌ত্‌' গ্রন্থে এই পরিভাষা ব্যবহারের প্রশংসা করেছেন ডঃ সুকুমার সেন (বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ ১২১)। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু তার দুই বছর আগেই ১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শন. ভাদ্র সংখ্যায় এই পরিভাষা ব্যবহার করেন। এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে রামকমল ভট্টাচার্য Mill-এর Inductive Logic-এর বাংলা অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন 'আন্বীক্ষিকী' শিরোনামায়। তাঁর অকাল মৃত্যুতে গ্রন্থটি অবশ্য অসমাপ্ত থেকে যায়।

পরবর্তীকালে, এই রীতি বর্জন করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা রীতি মূলতঃ অনুসরণ করলেও, ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা অবাধ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হন। বিংশ শতাব্দীতে ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই অবাধ স্বাধীনতা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে দু' একটি উদাহরণ উৎকলিত করছি :

Freedom বলে স্বাধীনতাকে (পৃ ৪০)

[ইংরেজি রীতি অনুসরণে এখানে ক্রিয়াপদ বাক্যের মাঝখানে আনা হয়েছে।]

দেখিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড় অনুরাগ (পৃ ১০৬)

আছে শুধু মুখের করতালি (পৃ ৮৭) ইত্যাদি।

ইংরেজি রীতি অনুসরণ করে 'Indefinite Article'-এর ব্যবহারও বঙ্কিমের রচনায় লক্ষ্য করা যায় :

…সেও একটা বড রাজা ফাঁপরে পড়িলে…। (পৃ ৯০)

আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি। (পৃ ২৯৯)

ইংরেজি প্রবচনেরও বাংলা অনেক সময় বঙ্কিম ব্যবহার করেছেন : একদিনে রোমনগরী নির্ম্মিত হয় নাই।

পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন গদ্যকারদের মতোই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ইংরেজি ভাষারীতির প্রভাব ছিল প্রচুর। ইংরেজি অলংকারের ব্যবহার বঙ্কিমের যুগে হয়েছে সর্বাধিক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতে ইংরেজি অলংকারের প্রভাব লক্ষিতব্য। কতিপয় উদাহরণ দিয়ে এই প্রসংগ পরিসমাপ্ত করছি :

১. সমাজ নহে, এসোসিয়েশন, লীগ সোসাইটি ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে—কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মাত্র (পৃ ৯৪-৯৫)

২. যিনি দারিদ্র্য, চিরকৌমার ব্রত, অহিফেন প্রভৃতির দ্বারাও কখনও পরাজিত হন নাই (পৃ ৯৫)

—Anti climax-এর প্রভাব।

৩. যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, যে লোভের তৃপ্তি নাই, যে বাসনার পূরণ নাই— (৩৮৬)।

(Climax-এর প্রভাব)

৪. কাহারও উদ্দেশ্যে রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি। (পৃ ৪০৬)

(Anti Climax-এর প্রভাব)

৫. কাব্য গড়ে, বিজ্ঞান ভাঙ্গে। (পৃ ১৫৮)
(Antithesis-এর প্রভাব)

৬. তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে (পৃ ৩৩৭)
(Climax)

৭. জ্ঞানলিপ্সা কদাচিৎক, ধনলিপ্সা সর্ব্বসাধারণ (পৃ ৩০২)
(Antithesis)

৮. পুরুষ বলবান, স্ত্রী অবলা ; পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু ; পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা (পৃ ৩১২)
(Antithesis)

৯. ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব, আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ Wordsworth (পৃ ১৯২)
(Antithesis)

১০. বিলাতী অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ, ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্য মুক্তি (পৃ ৫৮৬)
(Antithesis)

১১. অনুশীলন শক্তির অনুকূল, অভ্যাস শক্তির প্রতিকূল (পৃ ৫৮৭)
(Antithesis এবং Epigram)

১২. শিক্ষাহীন মূঢ়েরা যাহাতে হাসে, ভাবুকেরা তাহাতে কাঁদেন (পৃ ২৮৭)
(Antithesis এবং Epigram)

১৩. বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিতে বুঝে না (পৃ ৩৭৭)
(Epigram)

১৪. বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ, পাষাণময় ! (পৃ ১৫৮)
(Asyndeton) ।

১৫. জলশূন্য, সাগরশূন্য, নদীশূন্য, তড়াগশূন্য, বায়ুশূন্য; মেঘশূন্য, বৃষ্টিশূন্য—জলহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন, উত্তপ্ত, জলন্ত, নরককুণ্ড—তুল্য এই চন্দ্রালোক ! (পৃ ১৫৮)
— (Asyndeton)

১৬. নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম, রৌদ্র পরাজিত করিয়া (পৃ ৫৩৯)
(—Asyndeton)

১৭. যিনি এইরূপ পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্য্যে ও শিক্ষায়, কর্ম্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্ম্মে, দয়ায় ও ক্ষমায় তুল্যরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ (পৃ ৫২৩)

(Polysyndeton) ।

১৮. তখন পাতা এবং কিঞ্চিৎ অন্ন এবং মহাপ্রসাদ পাইয়া (পৃ ২৬৮)

— (Polysyndeton)

১৯. যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন; বিপর্য্যস্ত (পৃ ৮৩১)

(Asyndeton)

২০. রাজা ও সমাজ ও প্রণয়ী এই তিনজনে (পৃ ২১৪)

(Polysyndeton)

২১. গুণ্‌ গুণ্‌ মধু ঢালিয়া দিতেছে (পৃ ৯০) ।

(Transferred Epithet বা Hypallage) ।

দশম অধ্যায়

সিদ্ধান্ত

এক

ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের সুদীর্ঘ শতাব্দীকালের পথ পরিক্রমার অন্তে বিংশ শতকের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছি। এই পথ-পরিক্রমণে ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের শৈশব থেকে যৌবনে পরিণতির গতি-প্রকৃতি অত্যন্ত সতর্কতার সংগে লক্ষ্য করেছি। উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে বাংলা গদ্য সাহিত্য এক উষর মরুতীর হতে যাত্রা করে শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল সুধা শ্যামলিম পারে। যাই হোক, আমার বর্তমান আলোচনার শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য সাহিত্য কখন, কিভাবে, কোন ধারা বা প্রবণতাকে প্রাধান্য দান করে উন্নতি লাভ করেছিল, সে সম্বন্ধে কতিপয় সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট হব।

ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব-পুষ্ট হয়ে বাংলা গদ্য প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজনের পৃষ্ঠ-নির্ভর করে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হযেছিল। এই প্রয়োজন—ধর্ম প্রচারের প্রয়োজন , রাজকার্য পরিচালনার প্রয়োজন, ইংরেজি আদর্শে শিক্ষা-দানের প্রয়োজন, সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন এবং স্বদেশের উন্নতির জন্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি তথা প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন প্রচারের প্রয়োজন।

যে সমস্ত খ্রীষ্টান মিশনারি ধর্ম প্রচারের প্রেরণায় লেখনী ধারণ করেছিলেন, তাঁরা বাংলা গদ্যে খ্রীষ্টধর্ম এবং যিশুর মহিমা কীর্তনে সচেষ্ট হলেন। পরে অবশ্য এই ধর্মীয় প্রয়োজন পশ্চাতে রেখে বাংলা গদ্যের সর্বাংগীন উন্নতিকল্পে তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন। রাজকার্য পরিচালনে দক্ষতা সৃষ্টির জন্য ইংরেজ রাজ-পুরুষদের এই দেশের ভাষায় শিক্ষিত করে তুলতে চাইলেন, কোম্পানীর কর্ম-কর্তারা। স্থাপিত হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০ খ্রীঃ)।

আর, ভাষাশিক্ষার পক্ষে গদ্য গ্রন্থের প্রয়োজন অপরিসীম ; অথচ বাংলা গদ্যে গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা তখন পর্যন্ত অতি ক্ষীণ। তাই, ইংরেজ রাজপুরুষদের বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে বাংলা গদ্য গ্রন্থের অভাব মোচনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তৎপর হয়ে উঠল। এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই বেশ কয়েকটি বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচিত হল।

অপরদিকে, ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন প্রয়াসে যে সমস্ত ইংগ-বংগ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সে সমস্ত বিদ্যালযের জন্য যে সব পাঠ্য পুস্তক বাংলা গদ্যে বিরচিত হল সেগুলির অধিকাংশই, জ্ঞানের বিষয় নিয়ে, বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণে লিখিত।

আর, সাধারণভাবে জাতীয় উন্নতির প্রেরণায়, ইংরেজি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস বাংলা গদ্যে দেশবাসীর সম্মুখে উদ্ভাসিত করে তুলতে যাঁরা সচেষ্ট হলেন তাঁরাও আমাদের গদ্যসাহিত্যে ইংরেজি প্রভাবিত বিষয়বস্তুরই পরিবর্ধন করেছেন। ক্রমশঃ বাংলা গদ্য যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য পরিবেশনের পাশাপাশি বিশুদ্ধ সাহিত্য রস পরিবেশনে অগ্রসর হয়েছে, সূত্রপাত হয়েছে ভাবের সাহিত্যের, তখনও ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব বাংলা গদ্য সাহিত্যে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। উনিশ শতকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন ধারায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের গতি-প্রকৃতি, প্রবণতা ও পরিমাণের মধ্যে তারতম্য ছিল।

প্রথম পর্যাযে (১৮০০-১৮৪৩) বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ইংরেজির প্রত্যক্ষ প্রভাব (Direct Influence) অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয। ইংরেজি থেকে অনূদিত গ্রন্থগুলি এই প্রসংগে স্মরণীয়। তাছাড়া, বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুসরণেও, এই পর্যায়ে বহু বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কিন্তু, মৌলিক গ্রন্থ রচনার প্রবণতা এই সময় বিশেষ দেখা যায় না।

দ্বিতীয পর্যায়ে (১৮৪৩-১৮৭২) বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ / অনুসরণের পথ ধরে বিবিধ গ্রন্থ বাংলা গদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হয়েছিল। কিন্তু, অনুবাদ / অনুসরণের পাশাপাশি মৌলিক রচনার ধারাটিও এই সময় বাংলা গদ্যে বেশী না হলেও, কিছু পরিমাণে পরিপুষ্ট হয়েছিল। মৌলিকগ্রন্থের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাব (Indirect Influence) কার্যকরী ছিল।

তৃতীয় পর্যায়ে (১৮৭২-১৯০০) বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু প্রয়োজনের বন্ধন পেরিয়ে কল্পনার মুক্ত আকাশে ডানা বিস্তার করেছিল। ধর্মপ্রচার, পাঠ্য পুস্তক রচনা এবং ইংরেজি বা প্রতীচ্য জ্ঞানের প্রচার বাংলা গদ্যের মূল লক্ষ্য রইল না। তাই, এই পর্যায়ে অনুবাদ / অনুসরণের তুলনায় মৌলিক রচনার প্রতি অধিক প্রবণতা দেখা গেল।

কতিপয় ছকের সাহায্যে, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন ধারায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের পরিমাণ এবং গতি-প্রকৃতির চিত্র পরিস্ফুট করা যায়ঃ

ছক 'ক'

[ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের তুলনামূলক পরিমাণ]

বিভিন্ন পর্যায়	(১) জ্ঞানের সাহিত্য	(২) ভাবের সাহিত্য	(৩) অনুবাদ/ অনুসরণ	(৪) মৌলিক রচনা	(৫) প্রত্যক্ষ প্রভাব	(৬) পরোক্ষ প্রভাব
প্রথম পর্যায় (১৮০০-১৮৪৩)	বেশী	কম	বেশী	কম	বেশী	কম
দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৪৩-১৮৭২)	বেশী	কম	বেশী	কম	বেশী	কম
তৃতীয় পর্যায় (১৮৭২-১৯০০)	কম	বেশী	কম	বেশী	কম	বেশী

ছক 'ক' লক্ষ্য করলে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তুর ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের পরিমাণের 'কম-বেশী' বা তারতম্যের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। ছকে প্রদর্শিত সংখ্যা চিহ্নিত ছয়টি সারির মধ্যে '১' সংখ্যক সারির সঙ্গে '৩' ও '৫' সংখ্যক সারির ; '২' সংখ্যক সারির সঙ্গে '৪' ও '৬' সংখ্যক সারির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে, এই ছক অনুসরণ করলে দেখা যায় যে '১' সংখ্যক সারির সঙ্গে '২' সংখ্যক সারির, '৩' সংখ্যক সারির সঙ্গে '৪' সংখ্যক সারির এবং '৫' সংখ্যক সারির সঙ্গে '৬' সংখ্যক সারির বৈপরীত্য রয়েছে।

উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে উপরি উল্লিখিত ছন্দ অনুসরণ করে কতিপয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি :

[১] (১, ৩, ৫ সংখ্যক সারির সাদৃশ্য প্রসংগে)—

বাংলা গদ্যে জ্ঞানের সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব যখন বেশী তখন ইংরেজি থেকে অনুবাদ / অনুসরণ যেমন বেশী তেমনি বেশী প্রত্যক্ষ প্রভাব।

[২] (২, ৪, ৬ সংখ্যক সারির সাদৃশ্য প্রসংগে)—

বাংলা গদ্যে ভাবের সাহিত্যের ধারায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব যখন

বেশী তখন মৌলিক রচনার পরিমাণ যেমন বেশী তেমনি পরোক্ষ প্রভাব বেশী।

[৩] (১ ও ২ সংখ্যক সারির বৈসাদৃশ্য প্রসংগে)—

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব যখন

জ্ঞানের সাহিত্যে বেশী তখন ভাবের সাহিত্য কম

ভাবের সাহিত্যে „ „ জ্ঞানের সাহিত্যে „

[৪] (৩ ও ৪ সংখ্যক সারির বৈসাদৃশ্য প্রসংগে)—

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের ক্ষেত্রে যখন

অনুবাদ / অনুসরণ বেশী তখন মৌলিক রচনা কম

মৌলিক রচনা „ „ অনুবাদ/অনুসরণ „

[৫] (৫ ও ৬ সংখ্যক সারির বৈসাদৃশ্য প্রসংগে)—

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের

প্রত্যক্ষ প্রভাব যখন বেশী পরোক্ষ প্রভাব তখন কম

পরোক্ষ প্রভাব „ „ প্রত্যক্ষ প্রভাব „ „

বাংলা গদ্য সাহিত্যে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের বিভিন্ন প্রবণতার কারণ বিশ্লেষণ করলে সেগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম দু'টি পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় যে জ্ঞানের সাহিত্যের ধারাটি ইংরেজির প্রত্যক্ষ প্রভাবে পরিচালিত হয়ে অনুবাদ / অনুসরণের মাধ্যমে বিশেষ পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। তখন বাংলা গদ্যকারদের সম্মুখে জ্ঞানের বিষয় নিয়ে পুস্তক রচনার তাগিদ প্রবল হয়ে উঠেছিল, বিভিন্ন প্রয়োজনের[১] তাড়নায়। নব প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ইংরেজি বিদ্যায়তনের জন্য দ্রুত পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজনে সে যুগের বাংলা গদ্যকারেরা জ্ঞানের বিষয় নিয়ে লেখা বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ / অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টান মিশনারিগণ ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনে খ্রীষ্টিয় গ্রন্থাদির বাংলা অনুবাদে যেমন অগ্রসর হয়েছিলেন, তেমনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রস্তুতি (Evengelico Preparaetio) হিসাবে বাঙালীকে প্রতীচ্যের জ্ঞানে শিক্ষিত করে তুলতে জ্ঞানের বিষয় নিয়ে লেখা বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ / অনুসরণে অগ্রসর হয়েছিলেন। এইভাবে, বাংলা গদ্যে জ্ঞানের সাহিত্যের ধারাটি অনুবাদ / অনুসরণের মাধ্যমে ইংরেজির প্রত্যক্ষ প্রভাবে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

---

১. বর্তমান অধ্যায় দ্রষ্টব্য, পৃ ২১৪।

প্রথম দুই পর্যায়ে জ্ঞানের সাহিত্যের আধিপত্য বেশী এবং ভাবের সাহিত্যের আধিপত্য কম।২ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের আলোচনার সূত্র ধরেই বলা যায় যে প্রয়োজনের তাগিদেই জ্ঞানের বিষয়কে অনুবাদ / অনুসরণের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের বিষয়বস্তুতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই পর্যায়ে বাংলা গদ্যের লিখিত রূপ ক্রমশঃ গড়ে উঠেছিল। সুতরাং দুর্বল বাংলা গদ্য কল্পনার রাজ্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণের উপযুক্ততা অর্জন করতে পারেনি বলেই ভাবের সাহিত্য সৃষ্টিতে কার্যকরী ভূমিকা পালনে অক্ষম হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে জ্ঞানের সাহিত্যের তুলনায় ভাবের সাহিত্যের আধিপত্য দেখা যায়৩। বাংলা গদ্য দীর্ঘ বাহাত্তর বছরের (১৮০০-১৮৪৩/১৮৪৩-১৮৭২) পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে স্ব-পদনির্ভর হয়ে উঠেছিল। সুতরাং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ/অনুসরণের ওপর নির্ভরশীল না থেকে স্বাধীন কল্পনার আশ্রয়ে বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ রচনার প্রতি, এই পর্যায়ের গদ্য শিল্পীরা মনোনিবেশ করেছিলেন। এই প্রবণতা যে কোন সাহিত্যেরই জীবন-লক্ষণ। যাই হোক, কল্পনার স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ বিহারের পথ অনুসরণ করে মৌলিক রচনার ধারাটি ভাবের সাহিত্যের পরিপুষ্টি দানে অগ্রসর হয়েছিল বলে এইসব মৌলিক রচনার বিষয়বস্তুতে ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন সৃজনীশীল ধারার পরোক্ষ অনুপ্রেরণা যে এই পর্যায়ে মৌলিক গ্রন্থাদি রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ক্রিয়াশীল ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সমালোচনা সাহিত্যের অথবা রম্যরচনা বা আত্মভাবনামূলক রচনার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব স্বল্প হলেও এই সমস্ত ধারার পশ্চাতে ইংরেজি সাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাব বিশেষ সক্রিয় ছিল। সুতরাং, এই পর্যায়ে ভাবের সাহিত্যের ধারাটি মৌলিক রচনার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাবে পরিপুষ্ট হয়েছিল।

এই আলোচনা অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুবাদ / অনুসরণের মাধ্যমে বাংলা গদ্যে জ্ঞানের সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল, মূলতঃ প্রথম দুই পর্যায়ে ; এবং ইংরেজি সাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাবে মৌলিক রচনা অবলম্বনে বাংলা গদ্যে

২. বর্তমান গ্রন্থের ৩য় এবং ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩. বর্তমান গ্রন্থের ৫ম, ৭ম এবং ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ভাবের সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল মূলতঃ তৃতীয় পর্যায়ে।

ইংরেজির প্রত্যক্ষ প্রভাব যখন হ্রাস পেযেছে, অনুবাদ-নির্ভরতা যখন কমে এসেছে, বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষযবস্তু যখন আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে তখন সৃষ্টি হয়েছে ভাবের সাহিত্যের। ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে অর্ধ শতাব্দী কালের ওপর পরিচালিত হওযার পর বাংলা গদ্য সাহিত্য যখন সমুন্নত হযে উঠল তখন বিষযবস্তুর ক্ষেত্রে আত্মনিভরশীলতা বৃদ্ধি পেল। এই আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনার আদর্শ এবং হিন্দু পুনরভ্যুত্থান (Hindu Revivalism) কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। সমন্বযের আদর্শে অনুপ্রাণিত লেখকগোষ্ঠী ইংরেজির অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয সাধনের আদর্শে পরিচালিত হযে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষযবস্তু রচনায অনেকটা স্বাধীন হযে উঠেছিলেন। অন্যদিকে, হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের ফলে উগ্র স্বাজাত্যবোধের দ্বারা যে সমস্ত গদ্যশিল্পী পরিচালিত হযেছিলেন তাঁরা সরাসরি ইংরেজি প্রভাবের বিরুদ্ধ মনোভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হযে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বিষয়বস্তু ইংরেজি প্রভাব থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হযেছিলেন। এই দুই শক্তি পরস্পর বিরোধী হলেও পরিণামে ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত করে বাংলা গদ্য সাহিত্যকে ক্রমশঃ আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে সমর্থ হযেছিল। সমন্বযের আদর্শে বিশ্বাসী লেখকগোষ্ঠীর[৪] কার্যকলাপের সংগে ভিক্টোরীয় যুগের 'অক্সফোর্ড মুভমেণ্ট' (Oxford Movement)-এর সাদৃশ্য কেউ কেউ লক্ষ্য করে থাকেন।[৫]

বিভিন্ন পর্যাযে ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণগত তারতম্য পরিলক্ষিত হলেও প্রভাবের মোট পরিমাণের ক্রমিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষযবস্তু যেমন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব অনুসরণে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি এই সমস্ত বিষয়বস্তু ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব অনুসরণে যে বিভিন্ন ধারায় পরিবেশিত হয়েছিল সে সমস্ত ধারারও ক্রমিক বৃদ্ধি ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্রথম পর্যায়ে বিজ্ঞান-ইতিহাস ও ব্যঙ্গমূলক রচনা দিয়ে ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের যে সূত্রপাত ঘটেছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই সমস্ত ধারার সংগে সাহিত্য

৪. বর্তমান গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়, দ্রষ্টব্য।

৫. ভবতোষ দত্ত, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১ম সংস্করণ, পৃ ৬৫।

সমালোচনা যুক্ত হল। আবার তৃতীয় পর্যায়ে উপস্থিত হয়ে এই সমস্ত ধারার সংগে রম্য রচনা ও আত্মভাবনামূলক রচনা প্রভৃতির সংযুক্তি ঘটল। নিম্নে উপস্থাপিত সরণীতে বিভিন্ন পর্যায়ে ইংরেজি প্রভাবিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়ঃ

ছক—খ

পর্যায়	জ্ঞানের সাহিত্য : বিভিন্ন ধারা	ভাবের সাহিত্য : বিভিন্ন ধারা	পরিমাণ
১ম	বিজ্ঞান/ইতিহাস/ধর্ম সমাজ সংস্কারমূলক রচনা	রূপকধর্মী ও কাহিনী জাতীয় রচনা/ব্যঙ্গ রচনা	সামগ্রিক পরিমাণের ক্ষেত্রে জ্ঞানের সাহিত্য বেশী, ভাবের সাহিত্য কম
২য়	১ম পর্যায়ের বিভিন্ন ধারার পরিপূর্ণতা	১ম পর্যায়ের বিভিন্ন ধারা+সাহিত্য সমালোচনা/কাহিনী জাতীয় উপন্যাসমূলক রচনা/রূপকথা/উপকথা +চরিত সাহিত্য	সামগ্রিক পরিমাণের ক্ষেত্রে জ্ঞানের সাহিত্য বেশী ভাবের সাহিত্য কম
৩য়	১ম+২য় পর্যায়ের ধারাসমূহ+রাজনীতি/অর্থনীতি/সমাজতত্ত্ব	১ম+২য় পর্যায়ের বিভিন্ন ধারা+রম্য ও আত্মভাবনামূলক রচনা/পত্র সাহিত্য	সামগ্রিক পরিমাণের ক্ষেত্রে ভাবের সাহিত্য বেশী জ্ঞানের সাহিত্য কম

উপরের ছকটি অনুসরণ করলে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তু এবং বিষয়বস্তু পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে জ্ঞানের সাহিত্যের প্রসার প্রথম দুই পর্যায়ে বেশী ঘটেছে; এবং তৃতীয় পর্যায়ে বেশী প্রসার ঘটেছে ভাবের সাহিত্যের। এই তিন পর্যায়ের গদ্যশিল্পীর রচনা ও প্রবণতার দিকে লক্ষ্য

করলেও এই দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে : প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত প্রখ্যাত গদ্যকারেরা (যেমন প্রথম পর্যায়ে রামমোহন ও মিশনারিগণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি) ইংরেজি প্রভাব অনুসরণ করে বাংলা গদ্যে জ্ঞানের বিষয় উপস্থিত করেছিলেন[৬] এবং তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত গদ্যকারেরা (যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, অক্ষয়চন্দ্র ও বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি) ইংরেজি প্রভাব অনুসরণে উপস্থিত করেছিলেন ভাবের বিষয়।[৭]

তিন

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভাষারীতির ক্ষেত্রেও ইংরেজি সাহিত্যের ভাষারীতির প্রভাবের ক্রমিক প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, উনবিংশ শতাব্দীতে। প্রথম পর্যায়ে, বাংলা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে ইংরেজি বাক্যগঠন রীতির প্রভাব দেখা যায়। পরবর্তী পর্যায়গুলিতে ক্রমশঃ তার সংগে যুক্ত হয়েছিল ইংরেজি অলংকারের প্রভাব। ইংরেজি শব্দচয়ন এবং বিভিন্ন ইংরেজি 'টার্ম' অনুসরণে বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টাও পর্যায়ক্রমে ব্যাপক হয়ে উঠেছিল।

প্রথম পর্যায়ে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ ছিল। তখন মূলতঃ আইন-আদালত, সরকারি কার্য প্রভৃতির সংগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হত। কিন্তু, ক্রমশঃ ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সংগে সংগে ইংরেজিয়ানা বিস্তৃত হতে হতে অফিস-আদালতের চৌহদ্দি পেরিয়ে প্রবেশ করেছে আমাদের সমাজজীবনে এবং ক্রমশঃ বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দ গ্রহণের সাথে সাথে অনেক অনতিপ্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দও গৃহীত হয়েছে, বিশেষতঃ তৃতীয় পর্যায়ে (যথা, টেকনিক, কমপ্লিমেণ্ট,[৮] বৌদ্লেয়ারাইজ,[৯] প্রভৃতি)।

রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত ইংরেজি শব্দ চয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে রামমোহন ইংরেজি শব্দ খুব কমই ব্যবহার করেছেন। অক্ষয়কুমার

৬. বর্তমান গ্রন্থের ৩য় এবং ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৭. বর্তমান গ্রন্থের ৭ম এবং ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৮. বর্তমান গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়, পৃ ১৫৫।
৯. বর্তমান গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়, পৃ ২০৯।

দত্ত প্রয়োজনের বাইরে ইংরেজি শব্দ গ্রহণ করেননি। অথচ, তৃতীয় পর্যায়ের গদ্যকারদের রচনায়, বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়, প্রয়োজনীয় ও অনতি-প্রয়োজনীয় এই উভয় ধরণের শব্দ গ্রহণের ফলে বাংলা শব্দ ভাণ্ডার ইংরেজি শব্দে স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে।

আর বাংলা গদ্যে বিভিন্ন ইংরেজি শব্দকে অতিথির স্বতন্ত্র মর্যাদায় আসন দান করা হয়নি—নানাভাবে বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের বংগীয় রূপদানের মাধ্যমে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে স্থায়ী আসন দেওয়া হয়েছে।

পরিভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ইংরেজি দর্শন ও সাহিত্যের, বিশেষতঃ বিজ্ঞানের, বিভিন্ন 'টার্ম'-এর বংগানুবাদের মাধ্যমে বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা প্রথম পর্যায়েই শুরু হয়, ফিলিক্স্ কেরি র হাতে। এই প্রচেষ্টা দ্বিতীয় পর্যায়ে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে আরও ব্যাপকতা লাভ করে এবং তৃতীয় পর্যাযে রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে চূড়ান্ত রূপ পায়।

এই প্রবণতাগুলি কয়েকটি ছকের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যায়।

[বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যাযে বিভিন্ন ধারায প্রভাবিত ভাষারীতির অস্তিত্ব এবং পরিমাণ]

বিভিন্ন পর্যায়	ইংরেজি বাক্যগঠন রীতির প্রভাব		ইংরেজি অলংকার বা 'রেটরিকে'র		ইংরেজি শব্দের ব্যবহার		পরিভাষা	
	অস্তিত্ব	পরিমাণ	অস্তিত্ব	পরিমাণ	অস্তিত্ব	পরিমাণ	অস্তিত্ব	পরিমাণ
প্রথম পর্যায় (১৮০০-১৮৩৩)	আছে	বেশী	—	—	আছে	কম	আছে	কম
দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৪৩-১৮৭২)	আছে	বেশী	আছে	কম	আছে	বেশী	আছে	বেশী
তৃতীয় পর্যায় (১৮৭২-১৯০০)	আছে	বেশী	আছে	বেশী	আছে	বেশী	আছে	বেশী

ছক 'ঘ'

[ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন গদ্য শিল্পীর এবং সাময়িক পত্রের গদ্য রচনায় ওপর ইংরেজি ভাষারীতির প্রভাবের তারতম্য]

বিভিন্ন গদ্যশিল্পী এবং সাময়িক পত্র	ইংরেজি বাক্য গঠন রীতির প্রভাব	ইংরেজি অলংকার -এর প্রভাব	ইংরেজি শব্দের ব্যবহার	পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা	ইংরেজি যতি চিহ্নাদির ব্যবহার
রামমোহন	বেশী	—	কম	কম	কম
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	বেশী	—	—	—	কম
মিশনারিগণ	বেশী	—	কম	কম	বেশী
দিগদর্শন/ সমাচার দর্পন	বেশী	—	কম	কম	বেশী
সমাচার চন্দ্রিকা/বঙ্গদূত	কম	—	কম	কম	কম
অক্ষয়কুমার দত্ত	কম	—	কম	বেশী	বেশী
বিদ্যাসাগর	বেশী	কম	বেশী	বেশী	বেশী
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	বেশী	বেশী	কম	বেশী	বেশী
কালীপ্রসন্ন ঘোষ	বেশী	বেশী	কম	কম	বেশী
বলেন্দ্রনাথঠাকুর	বেশী	বেশী	বেশী	কম	বেশী
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	বেশী	বেশী	কম	বেশী	বেশী
বঙ্কিমচন্দ্র	বেশী	বেশী	বেশী	বেশী	বেশী

ছক 'ঙ'

[বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ও অনতিপ্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের তারতম্য]

প্রথম পর্যায় (১৮০০-১৮৪৩)	প্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার > অনতিপ্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার
দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৪৩-১৮৭২)	প্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার > অনতিপ্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার
তৃতীয় পর্যায় (১৮৭২-১৯০০)	প্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার = অনতিপ্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার

ছক 'চ'

[বিভিন্ন ধারায় বাংলা গদ্য সাহিত্যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের তারতম্য।]

বিভিন্ন ধারা	ইংরেজি শব্দের ব্যবহার
জ্ঞানের সাহিত্য	বেশী
ভাবের সাহিত্য	কম
অনুবাদ/অনুসরণ	বেশী
মৌলিক	কম

ছক 'ছ'

জ্ঞানের সাহিত্য		ভাবের সাহিত্য	
অনুবাদ/ অনুসরণ	মৌলিক রচনা	অনুবাদ / অনুসরণ	মৌলিক রচনা
বেশী	কম	বেশী	কম

উপরের পাঁচটি ছক (গ, ঘ, ঙ, চ, ছ,) অনুসরণ করলে ভাষারীতির উপর প্রভাবের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রবণতাসমূহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

[১] বিভিন্ন পর্যায়ে ভাষারীতির উপর প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম দুইটি পর্যায়ের তুলনায় তৃতীয় পর্যায়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রভাবের অস্তিত্ব এবং পরিমাণের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

[২] বিভিন্ন গদ্যশিল্পীর ওপর ইংরেজি ভাষারীতির প্রভাবের তারতম্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে প্রথম পর্যায়ের গদ্যকারদের তুলনায় দ্বিতীয় পর্যায় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের তুলনায় তৃতীয় পর্যায়ের গদ্যকারদের ওপর ইংরেজি প্রভাব সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

[৩] প্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দের চয়ন দিয়ে শুরু করে ক্রমশঃ প্রয়োজনীয় শব্দের পাশাপাশি অনতিপ্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দ চয়নের প্রবণতা বাংলা গদ্যে পর্যায় ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে।

[৪] জ্ঞানের সাহিত্যের তুলনায় ভাবের সাহিত্যে এবং অনুবাদ/ অনুসরণের তুলনায় মৌলিক রচনায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার কম।

[৫] জ্ঞানের সাহিত্যে মৌলিক রচনার তুলনায় অনুবাদ/অনুসরণে এবং ভাবের সাহিত্যেও মৌলিক রচনার তুলনায় অনুবাদ/অনুসরণে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা বেশী।

বিভিন্ন ছকে নির্দেশিত এই সমস্ত প্রবণতা কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে যাচাই করা যায়।

সাধারণতঃ জ্ঞানের সাহিত্যের তুলনায় ভাবের সাহিত্যে ইংরেজি শব্দ কম ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরের জ্ঞানের সাহিত্যের ধারার অন্তর্গত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয় ভাগ) এবং ভাবের সাহিত্যের অন্তর্গত 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর দিকে দৃষ্টিপাত করছি। প্রথমোক্ত গ্রন্থটির ইংরেজি শব্দগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে সেগুলো প্রয়োজনের তাড়নায় এসেছে।[১০] গ্রন্থটিতে ইংরেজি শব্দের ব্যবহারের গড় হার ৫%। কিন্তু ভাবের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বিদ্যাসাগরই ইংরেজি শব্দ সম্পূর্ণ পরিহার করেছেন। তাই তাঁর 'ভ্রান্তি-বিলাস' গ্রন্থটি ব্যক্তির নাম এবং স্থানের নাম পর্যন্ত ইংরেজি বা বিদেশী শব্দের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেছে। এই গ্রন্থে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের হার ০%।

অপরদিকে তৃতীয় পর্যায়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রয়োজনীয় এবং অনতি প্রয়োজনীয়, এই উভয় ধরণের ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসংগে বলেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি গদ্যশিল্পীর ইংরেজি শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য করতে পারি।[১১]

আবার, জ্ঞানের সাহিত্যের তুলনায় ভাবের সাহিত্যে এবং অনুবাদ/অনুসরণের তুলনায় মৌলিক রচনায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহারে যেমন তারতম্য দেখা যায় তেমনি পর্যায়গত দিক থেকে জ্ঞানের সাহিত্যের মধ্যেই ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের তারতম্য দেখা যায়। ভাবের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই তারতম্য লক্ষিতব্য। তাই, দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাবের সাহিত্যের অন্তর্গত গ্রন্থ 'ভ্রান্তিবিলাস' অনুবাদ হওয়া সত্ত্বেও, ইংরেজি শব্দ বিবর্জিত, অথচ অনুবাদ না হয়েও, তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত 'কমলাকান্তের দপ্তর' অথবা 'লোকরহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থে ইংরেজি শব্দ বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রসংগে স্মরণীয় যে, ছক 'ঘ' অনুসরণ

১০. বর্তমান গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ ১০৯।

১১. বর্তমান গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়, পৃ ১৫৪-১৫৬।

করলে দেখা যায় তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত গদ্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর ইংরেজি ভাষারীতির প্রভাব সর্বক্ষেত্রেই বেশী।

বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন ধারার গ্রন্থে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে তারতম্যই পরিলক্ষিত হোক, একটি চিত্রই এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভাষারীতির ওপর ইংরেজি প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

চার

আলোচনা পরিসমাপ্ত করার পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন বাংলা গদ্য গ্রন্থের এবং বিভিন্ন ধারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সমস্ত ইংরেজ এবং প্রতীচ্যের লেখকদের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং চিন্তাধারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সক্রিয় ছিল সে সমস্ত লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম স্মরণ করছি।

জ্ঞানের সাহিত্যের ধারায়, বাংলা গদ্য সাহিত্যে, যাঁদের প্রভাব সক্রিয় ছিল তাঁদের মধ্যে দর্শন-রাজনীতি-সমাজনীতিমূলক রচনার ক্ষেত্রে ফ্রান্সিস বেকন, টম পেইন, জেরেমি বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, রুশো, কোঁৎ, ইমানুয়েল কাণ্ট, আর্নেস্ট রেনাঁ, ষ্ট্রস্, লেকি, মার্ক্স্, ভ্যাটেল, চার্লস ডারউইন, রোমানিজ, লেকঁৎ, গুলিক প্রভৃতি এবং বিজ্ঞানমূলক রচনার ক্ষেত্রে স্যার জন হার্শেল, রবার্ট প্রক্টর, লাকিয়র, বাক, টিণ্ডাল, রবার্ট বল, হাক্স্লী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ভাবের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে, বাংলা গদ্য সাহিত্যে উনবিংশ শতকে, যে সমস্ত ইংরেজ বা প্রতীচ্যের কবি-সাহিত্যিকদের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে তাঁদের মধ্যে ষ্টীল, এ্যাডিসন, জন বানিয়ন, স্যামুয়েল জনসন, স্যার ওয়াল্টার স্কট, চার্লস ডিকেন্স, ডিকুয়েন্সী, ম্যাথ্যু আর্নল্ড, রাস্কিন, ষ্টীভেনসন্, সেণ্ট দ্য বার্নাডিন পিয়ারে, বোক্কাসিও, ক্রীলফ, হান্স এণ্ডারসন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত ইংরেজ বা প্রতীচ্য লেখকের প্রভাবে কোন কোন বাংলা গ্রন্থ বিরচিত হয়েছিল অথবা বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু কোন ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কতিপয় উদাহরণ নিম্নলিখিত দুটি ছকে সজ্জিত করতে পারি:

ছক 'জ'

জ্ঞানের সাহিত্য

ইংরেজ/ প্রতীচ্য লেখক	বাংলা গন্থকার	বাংলাগ্রন্থ	ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বিভিন্ন ধারা
গোল্ডস্মিথ/গিবন/ টমাস আর্নল্ড/লিও-নাড স্মিট্জ, প্রভৃতি	ফিলিক্স্ কেরি/ হেমাঙ্গচন্দ্র বসু প্রভৃতি।	'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় / মুসলমান-দিগের অত্যুদয়ের সংক্ষেপ বিবরণ	ইতিহাসমূলক রচনা
চেম্বার্স	বিদ্যাসাগর	চরিতাবলী/জীবন-চরিত	আধুনিক আদর্শে জীবন চরিত-মূলক রচনা
হোরেস হেম্যান উইলসন / ম্যাক্স্-মূলার	বিদ্যাসাগর/ অক্ষয়কুমার	সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব/ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথমভাগ)	ভাষাতত্ত্বমূলক আলোচনা
হার্শেল / প্রকটর/ লায়ল / টিণ্ডাল/ হাক্সলী	অক্ষয়কুমার/ বঙ্কিমচন্দ্র/ কালীপ্রসন্ন/ রামেন্দ্রসুন্দর	বিজ্ঞান রহস্য/ নিশীথ চিন্তা/ প্রকৃতি	বিজ্ঞানমূলক আলোচনা
কান্ট/টেট/লাপ্লাস ক্লিফোর্ড	রামেন্দ্রসুন্দর	প্রকৃতি এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী	বিজ্ঞানমূলক আলোচনা
ডারউইন/লে কঁৎ/ রোমানিজ,/ গুলিক	বলেন্দ্রনাথ/ কালীপ্রসন্ন/ রামেন্দ্রসুন্দর	পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ/প্রকৃতি, নিভৃতচিন্তা প্রভৃতি গ্রন্থ	বিজ্ঞানমূলক আলোচনা

ইংরেজ / প্রতীচ্য লেখক	বাংলা গদ্যকার	বাংলা গ্রন্থ	ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বিভিন্ন ধারা
প্লেটো/মাইকেল রিষান/বাটলার	অক্ষয়কুমার	ধর্মনীতি	সমাজতত্ত্বমূলক আলোচনা
লেকি/ভ্যাটেল/ হিউম/স্পিনোজা/ রুশো	ভূদেব	সামাজিক প্রবন্ধ	সমাজতত্ত্বমূলক আলোচনা
সীলী/কাণ্ট ম্যাথু আর্নল্ড/ মিল/ কোঁৎ	বঙ্কিমচন্দ্র	ধর্মতত্ত্ব	দর্শনমূলক আলোচনা
জন ম্যালথাস	বঙ্কিমচন্দ্র	বঙ্গদেশের কৃষক গ্রন্থ, রামধন পোদ শীর্ষক প্রবন্ধ	অর্থনীতিমূলক আলোচনা
রুশো/কার্ল মার্কস/ সেণ্ট সাইমন/ প্রুধোঁ	বঙ্কিমচন্দ্র	বঙ্গদেশের কৃষক ও সাম্য	অর্থনীতি / রাজনীতিমূলক আলোচনা

ছক 'খ'

ভাবের সাহিত্য

ইংরেজ/প্রতীচ্য লেখক	বাংলা গদ্যকার	বাংলা গ্রন্থ	ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বিভিন্ন ধারা
এ্যাডিসন/ষ্টীল	বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক/ অক্ষয়কুমার/ বঙ্কিমচন্দ্র	বিভিন্ন সাময়িক পত্র, চারুপাঠ ৩য় ভাগের অন্তর্গত 'স্বপ্নদর্শন'/ লোকরহস্য	ব্যঙ্গমূলক রচনা
ডিকুয়েন্সী/ডিকেন্স এ্যাডিসন প্রভৃতি	বঙ্কিমচন্দ্র	কমলাকান্তের দপ্তর	ব্যঙ্গমূলক রচনা

ইংরেজ/প্রতীচ্য লেখক	বাংলা গদ্যকার	বাংলা গ্রন্থ	ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বিভিন্ন ধারা
হ্যাজলিট/রাসকিন/ স্টীভেনসন প্রভৃতি	বঙ্কিমচন্দ্র/বলেন্দ্র নাথ/অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি	সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা	রম্য ও আত্মভাবনা মূলক রচনা
হানা মুর/হান্স এণ্ডারসেন প্রভৃতি	মধুসূদন মুখো- পাধ্যায়	মেষপালক বালকের বিবরণ (লেখক অজ্ঞাত নামা) নানাবিধ (ছোট কৈলাস, বড় কৈলাস, হংসরূপী রাজপুত্র, মরমেত)	রূপকথা/ উপকথা মূলক রচনা
স্যামুয়েল জনসন/ স্কট/কণ্টর/বোকাসিও বার্ণার্ডিন ড্য সেণ্ট পিয়ারে সেক্সপীয়র	তারাশঙ্কর তর্করত্ন /কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য /ভূদেব/কেদার- নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় /বিদ্যাসাগর	রাসেলাস/সফল স্বপ্ন/অঙ্গুরীয় বিনিময়/ পৌলবর্জিনী/বহু পালিতোপাখ্যান ভ্রান্তিবিলাস	রোমান্স ও উপন্যাস জাতীয় রচনা কাহিনীমূলক উপন্যাসধর্মী রচনা
বস্‌ওয়েল	বিভিন্ন জীবনীকার	বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থ (কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাতচিন্তা' গ্রন্থের অন্তর্গত জীবনীচরিত প্রবন্ধে বস্‌ওয়েল প্রসংগ উত্থাপিত হয়েছে)	আধুনিক আদর্শের জীবনী সাহিত্য
আর্ণেষ্ট রেনঁা / ডেভিড ষ্ট্রস্ / রিজ ডেভিডস্/ স্পেনসার / মিল / বেন্থাম	বঙ্কিমচন্দ্র	কৃষ্ণচরিত্র	অতীন্দ্রিয়তা থেকে মুক্ত জীবনী- সাহিত্য

ইংরেজ/প্রতীচ্য লেখক	বাংলা গদ্যকার	বাংলা গ্রন্থ	ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বিভিন্ন ধারা
স্যামুয়েল জনসন/ ম্যাথু আর্নল্ড/সিডনী/ শেলী/কোলরিজ এবং ক্যালকাটা রিভিউ / দি ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনা	ঈশ্বরগুপ্ত/বঙ্কিমচন্দ্র বলেন্দ্রনাথ/ অক্ষয়চন্দ্র/ রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি	ঈশ্বরগুপ্তের কবিজীবনী এবং বঙ্কিমচন্দ্র/বলেন্দ্র নাথ / রামেন্দ্রসুন্দর / অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী	সাহিত্য সমালোচনা মূলক রচনা

পাঁচ

উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য বিষয়বস্তু (Content) এবং ভাষারীতি (style)-র ক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যের, কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষ, প্রভাবে অনুবাদ/অনুসরণ এবং মৌলিক রচনার মাধ্যমে জ্ঞানের বিষয় এবং ভাবের বিষয় ১২ নিয়ে যথাক্রমে জ্ঞানের সাহিত্য এবং ভাবের সাহিত্য প্রতিষ্ঠায় প্রযত্ন নিয়েছিল। প্রথম দুই পর্যায়ে বাংলা গদ্যে জ্ঞানের সাহিত্যের এবং তৃতীয় পর্যায়ে ভাবের সাহিত্যের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম দুই পর্যায়ে গদ্যকারদের রচনা কার্যে প্রেরণা অপেক্ষা প্রযোজন অধিক কার্যকরী ছিল। এই ধরণের রচনাকে হার্বার্ট রীড (Herbert Read)-এর সংজ্ঞা ১৩ অনুসারে প্রয়োজনজাত সাহিত্য (Contingent Literature) হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। তৃতীয় পর্যায়ের গদ্যকারদের রচনায় প্রয়োজন অপেক্ষা প্রেরণা অধিক ক্রিয়াশীল ছিল এবং এই পর্যায়ের গদ্য রচনাকে মূলতঃ প্রেরণাজাত সাহিত্য (Absolute Literature) হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দুর্বল

১২. ডিকুয়েন্সীর মতোই রবীন্দ্রনাথও জ্ঞানের বিষয় এবং ভাবের বিষয়ের পার্থক্য প্রদর্শন করেছিলেন তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্যের সামগ্রী' শীর্ষক প্রবন্ধে।

১৩. Jonathan Swift-এর রচনাবলীর আলোচনা প্রসংগে Herbert Read 'Contingent Literature' এবং 'Absolute Literature' সংজ্ঞা দুটি ব্যবহার করেছিলেন।

অবস্থায় প্রয়োজনজাত সাহিত্য নিয়ে রামমোহন, মিশনারিগণ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বাংলা গদ্যের যে ভিত্তিভূমি রচনা করেছিলেন সে ভিত্তিভূমির উপর নির্ভর করে উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য গদ্যশিল্পী প্রেরণাজাত সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই প্রসংগে আর একটি কথা স্মরণীয়। উনিশ শতকের প্রথম দুই পর্যায়ে বাংলা গদ্যে জ্ঞানের সাহিত্য/প্রয়োজনজাত সাহিত্যের যে প্রাধান্য লক্ষ্য করেছি সে সাহিত্য স্বভাবতই ছিল তথ্য ও তত্ত্বমূলক এবং যুক্তিনির্ভর। বাংলা গদ্যে সৃজনশীল তথা ভাবের সাহিত্য/প্রেরণাজাত সাহিত্যের আধিপত্য তৃতীয় পর্যায়ের পূর্বে ছিল না। অপরদিকে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় নাটক ও উপন্যাস রচিত হয় নি। এবং এই সময়ের প্রধান কাব্যকার ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা ছিল অনেকাংশে ভাবাবেগ বর্জিত, বস্তুনিষ্ঠ (objective) ও যুক্তিধর্মী এবং প্রস্তাবমূলক। সুতরাং, বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে, অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের সংগে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে—জ্ঞানধর্মিতা, যুক্তিনিষ্ঠা, তন্ময়তা (objectivity) এবং গদ্যের আধিপত্যের জন্য—গদ্য ও যুক্তির যুগ (Age of Prose and Reason) হিসাবে অভিহিত করা চলে।

নির্দেশিকা

গ্রন্থকার

গ্রন্থ

প্রবন্ধ / নিবন্ধ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান